ভূমিকা

স্নাতক পরীক্ষার অনার্সের উপযোগী করে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে এই পুস্তক রচনা করার চেষ্টা করেছি। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস জানাই যথেষ্ট নয় যে সব মৌলিক তত্ত্ব ও নীতির সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয় সেই সম্বন্ধেও পরিচয় থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে এই সমস্ত তত্ত্ব ও নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব ও ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আধুনিক কালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে অনেক নতুন 'থিওরী'র সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেই সব 'থিওরি' অনার্স ক্লাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত নয় বলে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে করা হয় নি।

পরীক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলিত হওয়ায় এই ধরণের পুস্তক রচনা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগলেই এই পুস্তক রচনা সার্থক হবে।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা

1. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু ও আলোচনা ক্ষেত্র।
2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের উদ্দেশ্য।

1. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু ও আলোচনা ক্ষেত্র

পৃথিবী অনেকগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত কিন্তু এইসব রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে নানা রকমের সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজের স্বার্থেই একটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে এই ধরণের নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। প্রাচীন যুগেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধরণের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত কিন্তু তা ছিল সাধারণতঃ একটি ভৌগোলিক খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি রাষ্ট্র সাধারণতঃ তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি এবং যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুব্যবস্থার ফলে দূরবর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেক সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় একটি রাষ্ট্রকে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। একটি রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমস্যা অনেক পরিমাণে অন্যান্য দেশের সাথে তার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নতির সহায়ক এবং শত্রুতা ও যুদ্ধের সম্পর্ক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে তার ভয়াবহ পরিণতি প্রায় অকল্পনীয়।

অতএব আমাদের জীবনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' নামে একটি বিষয় গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে উঠে, একটি রাষ্ট্র কি উদ্দেশ্যে এবং কি পদ্ধতিতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে সহায়ক অবস্থা কি ভাবে গড়ে তোলা যায়—এই সব সমস্যা নিয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি (International Politics) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত; রাজনৈতিক দিক ছাড়া যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আন্তর্জাতিক জীবনকে প্রভাবিত করে তাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে। সরকারের প্রচেষ্টায় এবং সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' তা নিয়েই আলোচনা করে। সরকারের মাধ্যম ছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি, শ্রমিক আন্দোলন, ক্রীড়া ইত্যাদির মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একটি বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত দিক আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই মুখ্যতঃ সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার ভেতরই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবী আমাদের কাছে অনেক ছোট মনে হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে আন্তর্জাতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলিই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। তাই আন্তর্জাতিক জীবন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের নীতি দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই রাষ্ট্রসমূহের নীতি আবার প্রধানতঃ জাতীয় স্বার্থ দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজস্ব দুর্বলতা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে। আইনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মূল্য সমান হ'লেও ক্ষমতার দিক দিয়ে তারা সমান নয়। প্রত্যেক যুগেই কয়েকটি রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হয় এবং তাদের নীতি দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই সব দেশের বৈদেশিক নীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস পাঠ ভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝা সম্ভব নয়। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও তার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা, বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, জাতীয় স্বার্থের অর্থ ও জাতীয় শক্তির উপাদান, জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির পথে বিভিন্ন বাধা, বৃহৎ শক্তি-গুলির বৈদেশিক নীতি এবং সমকালীন যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক আলোচনা—এই সব আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রধান বিষয়বস্তু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' গঠিত হয় তার ভিত্তিতে 1947 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে গ্রেসন্ কার্ক (Grayson Kirk) বলেন যে, সেখানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়—(1) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যক্রম, (2) জাতীয় শক্তির উপাদান, (3) বৃহৎ শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক ভূমিকা এবং তাদের বৈদেশিক নীতি, (4) আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের ইতিহাস এবং (5) আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। সাত বৎসর পর ভিন্সেণ্ট বেকার (Vincent Baker) এই বিষয়ে একটি রিপোর্টে বলেন যে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠের সময় সাধারণতঃ সাতটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেই বিষয়গুলি হল : (1) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং প্রধান প্রধান উপাদান, (2) আন্তর্জাতিক জগতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, (3) জাতীয় শক্তির উপাদান, (4) জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির বিভিন্ন পন্থা, (5) জাতীয় শক্তির উপর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ, (6) বৃহৎ শক্তিগুলির বৈদেশিক নীতি (বিশেষ কারণে কোন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশের বৈদেশিক নীতির উপরও জোর দেওয়া হয়) এবং (7) আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য কোন বিষয়ই একেবারে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, দর্শন এবং বিশেষ করে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ নির্ভর করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়টি গড়ে উঠেছে। তা হলেও এর একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি পৃথক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে ইহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে কি ভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তার গতি প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা করে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের অন্য কোন বিষয় আমরা পাঠ করি না।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করার সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যদিও ইতিহাসে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকে যার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন সম্বন্ধ নেই তবুও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বিবরণ আমরা ইতিহাসের মধ্যেই পেয়ে থাকি। তাই ইতিহাসের পটভূমিতে অনেক সময় 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের উপরই জোর দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই ইতিহাস থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সূত্র খুঁজে বের

করার চেষ্টা হয়। অনেক সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ না করে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তাতে বিভিন্ন তত্ত্ব, ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও আইনের মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' আলোচনার চেষ্টা হয়। এই ধরণের আলোচনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। আধুনিক যুগের 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' ইতিহাস এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান এই দুই বিষয় থেকেই উদ্ভব হয়েছে। তাই এই উভয় বিষয়ের পটভূমিতেই 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি এই উভয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' একটি সমাজ বিজ্ঞান। মানব সমাজের দুই ধরণের প্রতিষ্ঠান—আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র—এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত সুগঠিত ও ক্ষমতাশীল না হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সব অঞ্চল রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতে পারে নি, যারা অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আছে, তারাও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (যেমন জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেট প্রথা বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি প্রথা) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে স্থান পেয়েছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েই একটি আন্তর্জাতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সমাজকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক নীতিবোধ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে চলতে পারে না। তা ছাড়া নিজের জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে একটি দেশ অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে নানা রকমের বাধা পেয়ে থাকে। একটি দেশের বৈদেশিক নীতি যদি অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে সেই বাধা অনিবার্য। তদুপরি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান আছে। অপর রাষ্ট্র যাতে অধিকতর শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে না পারে সেই দিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। অতএব একটি রাষ্ট্রকে তার বৈদেশিক নীতি

অনুসরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং ফলে তার স্বাধীনতা সব সময়ই সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করে না। সেই সব আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা সীমাবদ্ধ। একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপরই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক নির্ভর করে। তাই একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি কি ভাবে গড়ে উঠে, বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি উপায় গ্রহণ করা সম্ভব, বৈদেশিক নীতি স্থিরীকরণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ইত্যাদির আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্গত। বৈদেশিক নীতি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে একটি দেশের সিদ্ধান্ত কি করে গৃহীত হয় তার উপর অনেকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের। রাজনৈতিক কাঠামো মোটামুটি এক রকমের হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' মানুষের সামাজিক সম্পর্কেরই একটি বিশেষ প্রকাশ। একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নেই—রাষ্ট্রের মানুষই বিভিন্ন প্রণালীতে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সব সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণ ভাবে মানবপ্রকৃতি ও তার আচরণের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞান (Sociology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), সমাজ-মনস্তত্ত্ব (Social psychology) ইত্যাদি মানুষের প্রকৃতি ও আচরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ ও বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী পরস্পরের সাথে কখন সহযোগিতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় এবং কি অবস্থায় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় সেই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' আলোচনা করা হয়। অন্যথায় সেই আলোচনা কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখা যায় যে, মানব প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল—পরস্পরবিরোধী মনোভাব একই সাথে তার মধ্যে বর্তমান থাকে। পরিবেশের উপর মানুষের আচরণ ও তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অর্থনৈতিক অবস্থা

মানুষের আচরণ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব মানুষের বিভিন্ন ধরণের প্রবৃত্তি (অনেক সময় তা পরস্পরবিরোধী) ও তার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করা এবং 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এই ব্যাপক পটভূমি সম্বন্ধে সচেতন না থাকায় অনেক সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা একদেশদর্শী এবং অতিসরলীকৃত হয়ে উঠে। মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের উপরই যারা বেশী জোর দেন তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বৈরীমূলক সম্পর্ককেই স্বাভাবিক বলে মনে করেন এবং তার ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব ও ধারণাগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। পরস্পরবিরোধী জাতীয় স্বার্থ এবং শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতিগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। এই ধরণের চিন্তাকে সাধারণতঃ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বা realist school of international politics বলা হয়। মানুষের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি এবং পরিবেশের প্রভাব এই ধরণের আলোচনায় বিশেষ স্থান পায় না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ সহযোগিতামূলক প্রবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন এক সহজ সরল ধারণার সৃষ্টি করেন যে, তার সাথে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক থাকে না। এই ধরণের আলোচনা শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক বা utopian হয়ে উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জাতিসংঘ স্থাপিত হওয়ার পর অনেকে এই ধরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখতে জাতিসংঘ যখন ব্যর্থ হ'ল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখন অনেকে তথাকথিত বাস্তববাদী আলোচনার উপরই জোর দিতে আরম্ভ করেন এবং সেখানে দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াইকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় তখন আবার অনেকের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সহযোগিতার সম্পর্ক রূপেই দেখা দিল। পরে ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হওয়ার পর আবার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এই সব একদেশদর্শী আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও বৈরীতা উভয়ই সত্য। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব সমপরিমাণ না হ'লেও তার ভূমিকা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। মতবিরোধ ও শক্তি প্রয়োগ যেমন সত্য, মতের ঐক্য ও আপোষ নিষ্পত্তিও তেমনি সত্য।

একটি বিশেষ উপাদানের উপর জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কোন বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ দিক অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা সাধারণতঃ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাদের পারস্পরিক প্রভাবে কি ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তা আলোচনা করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সমাজ বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি পৃথক বিষয় হিসেবে গড়ে উঠে নি। সেই মহাযুদ্ধের পর থেকে এই সম্পর্কে গবেষণামূলক বহু পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে অন্যান্য বিষয়ের মতই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

2. 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠের উদ্দেশ্য

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (যেমন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস) আমরা যে উদ্দেশ্যে পাঠ করে থাকি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'ও মোটামুটি সেই উদ্দেশ্যেই অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি এবং রীতিনীতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা। প্রাকৃতিক জগত যে রকম নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (এইকথা সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) সেই ধরণের কোন নিয়ম কানুন নেই। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, জনসাধারণের আবেগ ও সংস্কার, জাতীয় নেতৃবর্গের মতিগতি এবং উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলী ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের উপাদান দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত হয়। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা এখানে প্রবল। তাই প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে যে রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক ধরণের নিয়মের রাজত্ব বর্তমান। সেই নিয়ম মুখ্যতঃ বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ ও সামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি দেশের স্বার্থ অন্য দেশের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও হতে পারে আবার প্রতিকূলও হতে পারে। তা দ্বারা অন্য দেশের সাথে একটি দেশের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র জোট বাঁধার চেষ্টা করে এবং ফলে পৃথিবী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়। বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলি তাদের প্রভাব ও সামর্থ্যের জোরে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সমূহ প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে মেনে নিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার শক্তিশালী শত্রুকে ভয় করে এবং শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করে। তা ছাড়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব মনে করার কোন কারণ নেই।

রাষ্ট্রসমূহের আচরণ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল সূত্র স্থির করা সম্ভব হয়েছে এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপরেই সেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে একটি দেশের (বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের) উন্নতি অনেকাংশে আন্তর্জাতিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে। যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করতে হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হয় না। বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা তাও আন্তর্জাতিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক দেশের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করা উচিত।

একটি নতুন স্বাধীন দেশের পক্ষে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান যদি না থাকে তবে কোন দেশের পক্ষে সার্থক ভাবে বৈদেশিক নীতি স্থির করা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্বও কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয় যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারে তবে একমাত্র সরকারের পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। এই ধরণের বিশেষজ্ঞ তৈরী করা 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভিন্ন অঞ্চলের (যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা) অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে সেই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তৈরী করার চেষ্টা করে। এই ধরণের শিক্ষাকে area study বলা হয়।

'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠের একটি নৈতিক উদ্দেশ্যও আছে। এই কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করলে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। ডাক্তারী পাশ করতে পারলে রোগীকে পরীক্ষা করে রোগের কারণ নির্দেশ করা এবং তা দূর করার উপায় বলে দেওয়া সম্ভব। রোগী তা অনুসরণ করে রোগমুক্ত হতে পারে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করার পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার কারণ নির্দেশ করা হয়ত সম্ভব এবং তার প্রতিকারের জন্য মোটামুটি সমাধানও হয়ত বলা যেতে পারে, কিন্তু পৃথিবীকে সে অনুযায়ী সমস্যা মুক্ত করা সম্ভব নয়। যুদ্ধই হল আন্তর্জাতিক সমস্যার সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্বরাষ্ট্র বা অহিংসার মাধ্যমে অনেক দার্শনিক এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করলে বুঝা যায়

যে, এই সব সমাধানের বাস্তব মূল্য কত কম। রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার এবং জাতীয়তাবাদ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে তা সত্য, কিন্তু এই সবকে অস্বীকার করে যে সমাধান দেওয়া হয় বর্তমান যুগে তা কখনও কার্যকরী হতে পারে না। কার্যকরী সমাধান দিতে গিয়ে দেখা যায় যে কোন বৈপ্লবিক সমাধান দেওয়া বাতুলতা মাত্র। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তব জ্ঞানের আলোতে দেখা যাবে যে যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টাই যুদ্ধ সমস্যার একমাত্র সমাধান। অর্থনৈতিক উন্নতি বা শিক্ষা বিস্তারের ফলেই বিশ্ব সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয় 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান থাকলেই তা বুঝা যায়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা। বাস্তবমুখী সমাধান একমাত্র 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই দেওয়া সম্ভব। সেই সমাধান হয়ত সমাজ বিপ্লবীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না কিন্তু ইতিহাসে নিখুঁত সমাধানের চেয়ে বাস্তব সমাধানের মূল্য অনেক বেশী।

সম্পূর্ণভাবে (অথবা যতদূর সম্ভব) বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পাঠ করা প্রয়োজন। উগ্র দেশাত্মবোধ, সঙ্কীর্ণ মতবাদ, অন্ধ সংস্কার, আবেগ, উত্তেজনা পরিহার করে প্রত্যেক দেশের উদ্দেশ্য ও নীতি, সেই দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা ইত্যাদির পটভূমিতে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক কাঠামোর ভিত্তি

1. আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদ
2. বৈদেশিক নীতি, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1. আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আমরা বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের কথাই বুঝি। বর্তমান পৃথিবী বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে নানাধরণের সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রয়োজনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ভিত্তিতেও বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এই ধরণের নানা জাতীয় পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই আন্তর্জাতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বর্তমান কালে এই আন্তর্জাতিক সমাজের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু সার্বভৌম রাষ্ট্রই হল এই আন্তর্জাতিক সমাজের মূল ভিত্তি। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও উৎপত্তি

প্রায় তিন শতাব্দীরও পূর্বে রাষ্ট্র তার আধুনিক রূপ লাভ করে। রাষ্ট্র বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট লোকসংখ্যা, একটি সুগঠিত সরকার এবং সার্বভৌম অধিকার বুঝায়। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত রাষ্ট্রই সমান, কিন্তু শক্তি সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বিচার করলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। ভূখণ্ড, লোকসংখ্যা, জাতীয় সম্পদ, সামরিক ক্ষমতা ইত্যাদি যে কোন মাপকাঠি দিয়েই তুলনা করা যাক না কেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যাবে। সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, চিলি প্রমুখ অনেক রাষ্ট্র আছে যাদের লোকসংখ্যা নিউইয়র্ক শহরের লোকসংখ্যার থেকেও কম। নিউইয়র্ক শহরের বাৎসরিক বাজেট পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেটের চেয়ে বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশই অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল আর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক উন্নত। কোন কোন রাষ্ট্র কৃষিনির্ভর, অনেক রাষ্ট্র শিল্পনির্ভর আবার অনেক দেশ আছে যারা ব্যবসায় বাণিজ্যের উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংস্কৃতির মধ্যেও বিরাট পার্থক্য দেখা যায়—বর্তমান সৌদি আরব ও সুইডেন যে একই যুগে বাস করছে তা কল্পনা করাও কঠিন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের

সামাজিক কাঠামো ও সরকারের গঠনও আলাদা রকমের। কোন কোন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র, অনেক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং অনেক দেশে স্বৈরতন্ত্র শাসন প্রচলিত। কোন কোন দেশ কম্যুনিষ্ট আবার অনেক দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ প্রচলিত এবং সরকারের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সীমিত। সামরিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বিচার করে কোন কোন দেশকে বৃহৎ শক্তি (great power অথবা major power) আবার অনেক রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্রশক্তি (small power) বলা হয়। বেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে অনেক সময় বিশ্বশক্তি (world power) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বর্তমানে super power বলা হয়। অতএব আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত রাষ্ট্র সমান হলেও কার্যতঃ তারা সমান নয়।

ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের (Thirty Year's War) পর ইউরোপে 1648 খৃষ্টাব্দে যে ওয়েষ্টফালিয়া সন্ধি (Treaty of Westphalia) স্বাক্ষরিত হয় সেই সন্ধি থেকেই আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস আরম্ভ করা যেতে পারে। এই সন্ধি স্থাপনের পূর্বেও পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র ছিল কিন্তু আধুনিক যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তার সূচনা মোটামুটিভাবে ওয়েষ্টফালিয়া সন্ধি থেকেই শুরু হয়। এর পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র, বড় বড় সাম্রাজ্য (যেমন রোমান সাম্রাজ্য), বিভিন্ন বিখ্যাত রাজ বংশের রাজত্ব প্রচলিত ছিল; কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমবায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। ওয়েষ্টফালিয়া সন্ধির পূর্বেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং স্পেন জাতীয় রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করে এবং ইউরোপের আরও কোন কোন অঞ্চলে এই ধরণের পরিবর্তন শুরু হয়। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধ হিসেবে আরম্ভ হ'লেও শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পোপ ও হোলি রোমান সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেই সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও সুইডেন বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত Machiavelli, Bodin, Grotius, Luther, Calvin প্রমুখ লেখক ও চিন্তাবিদরা স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তত্ত্বগতভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ফ্রান্সের বুর্বন সম্রাট চতুর্দশ লুই সমস্ত ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটেন ও অষ্ট্রিয়া কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবেত প্রচেষ্টায় স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধে (War of Spanish

succession) চতুর্দশ লুই পরাজিত হন। সেই যুদ্ধের পর 1713 খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর যে সন্ধি হয় (Treaty of Utrecht) তাতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিসাম্য পুনরায় স্থাপিত হ'ল। চতুর্দশ লুই-এর পরেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তিসাম্য কোন কোন সময় ব্যাহত হয়েছে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। নেপোলিয়ন সমস্ত ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফরাসী বিপ্লবের "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"র আদর্শ শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী ফরাসী জাতীয়তাবাদে পরিণত হয় এবং ফরাসী আক্রমণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনাতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আটটি দেশকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়: গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, পর্তুগাল এবং স্পেন। পূর্বেকার ঐতিহ্য চিন্তা করেই সুইডেন, পর্তুগাল ও স্পেনকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির গৌরব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজনীতিতে এই তিনটি রাষ্ট্রের বিশেষ কোনই ভূমিকা ছিল না। ফ্রান্স পরাজিত রাষ্ট্র হলেও তাঁলেরা (Talleyrand)-এর অসাধারণ কূটনীতির ফলে ফ্রান্স শীঘ্রই ইউরোপের একটি প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

ভিয়েনা কংগ্রেসের পর ইংলণ্ডই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। ইউরোপে জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন নতুন অনেক রাষ্ট্র সৃষ্টি হ'ল। জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জার্মানী ও ইতালী ঐক্যবদ্ধ হয়, বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করে, বল্কানে অনেক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলি স্পেনের আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ধীরে ধীরে অনেক বৃদ্ধি পায় এবং 1898 খৃষ্টাব্দে স্পেনকে যুদ্ধে পরাজিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। জাপানও পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণ করে নিজেকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিণত করতে সমর্থ হয়। 1894-95 খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন পরাজিত হয় এবং 1904-5 খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার মত শক্তিশালী দেশকে জাপান যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তখন থেকে জাপানও একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আটটি প্রধান শক্তি বর্তমান ছিল: ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী, ইতালী, অষ্ট্রিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে অষ্ট্রিয়া ছাড়া

উপরি-উক্ত সমস্ত রাষ্ট্রগুলিই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিচিত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম শ্রেণীর শক্তি বা Super power রূপে পরিগণিত হয়। সেই সময় এশিয়া ও আফ্রিকাতে অনেক নতুন রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আর ইউরোপীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত রয়েছে।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে জাতীয়তাবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানকালে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই জাতীয় রাষ্ট্র বা nation-state বলা হয় এবং তার প্রধান দায়িত্ব হ'ল জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখা। প্রাচীনকালে সেই রকম কিছু ছিল না। সেই যুগে আমরা নগর-রাষ্ট্র দেখতে পাই এবং পরবর্তী কালে রাজা বা রাজবংশকে কেন্দ্র করে বড় বড় রাষ্ট্র গড়ে উঠে। আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা হয় এবং অনেকে জাতীয়তাবাদকে বর্তমান যুগের ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন।

জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) কথাটি খুব প্রচলিত হ'লেও জাতি ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন মনে করার কোন কারণ নেই। রাষ্ট্র বলতে আমরা একটি আইনসঙ্গত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (legal-political organization) বুঝি কিন্তু একটি জাতি প্রধানতঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের উপর গড়ে উঠে। ইংরাজী Nation কথাটি ল্যাটিন natio থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং nation-এর অর্থ হল জন্ম (birth)। অর্থাৎ বহু যুগ ধরে একত্র বসবাস করার ফলে একই ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ইত্যাদির প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠিকে আমরা জাতি বলতে পারি। একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ অন্য জাতির লোক থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে। নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন একই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা মনে করে যে মূলতঃ তাদের জন্মমৃত্যু অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ, উত্থান ও পতন একই সূত্রে গ্রথিত। একটি জাতির মধ্যে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা জাতীয়তাবাদ বা nationalism বলতে পারি। Hans Kohn মনে করেন যে "nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness."

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং এই বিষয়ে মূল্যবান এবং গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয় কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে জাতি ও জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। কেউ কেউ মনে করেন যে জাতীয়তাবাদের বিজ্ঞান-সম্মত কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবই নয়।[1] জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সকলকেই ঐক্যবোধ বা Hans Kohn-এর ভাষায় 'a state of mind'-এর উপরই শেষ পর্যন্ত জোর দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল যে এই ঐক্যবোধ কি ভাবে সৃষ্টি হয়? অনেক কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। একই ভূখণ্ডে বসবাস, কুলগত ঐক্য (Racial unity), ধর্মের ঐক্য, ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য, আচার ব্যবহারের ঐক্য, ইতিহাসের ঐক্য ইত্যাদি উপাদানের উপর সাধারণতঃ জোর দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু কোন উপাদানই অপরিহার্য নয়। ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ইহুদীদের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা বসবাস করত কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যবোধ বর্তমান ছিল। আধুনিক যুগের কোন জাতিই কুলগত ঐক্য (racial unity) দাবী করতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোকও একটি জাতি গঠন করতে পারে। লেবাননে মুসলমান ও খৃষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীর লোকই বসবাস করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জন্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়েছে। পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা না থাকলে অবশ্য জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি হওয়া কঠিন। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের সমস্যাই ছিল জাতিগঠনের পথে সবচেয়ে বড় সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হ'ল কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং আরও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মোটামুটি ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে মিলিত হতে পেরেছে। বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের লোকই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভাষার ঐক্য ভিন্নও জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হতে পারে—সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা প্রচলিত, বেলজিয়ামে দুটি ভাষা, কানাডাতেও দুটি ভাষা, ভারতবর্ষে বহু ভাষার প্রচলন। ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তারা আলাদা জাতি। আচার ব্যবহার এক না হলেও একাত্মবোধ গড়ে উঠতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার, পোষাক, আহার এক রকম নয়, কিন্তু তবু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। যাদের প্রাচীন ইতিহাস এক

1. H. L. Featherstone, *A Century of Nationalism.*

তারা সহজেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু জাতি গঠনের বেলায় তাও অপরিহার্য বলে মনে করার কোন কারণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন কিন্তু তার জন্য তাদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুন্ন হয় নি। পরাধীনতা ও বৈদেশিক আক্রমণ জাতিগঠনে অনেক সময় সাহায্য করে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়েছে। নেপোলিয়নের আক্রমণের ফলে জার্মানী, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়।

জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের সৃষ্টি। সকল দেশে একই ধরণের উপাদানে এবং একই ভাবে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। জোর করে কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন জাতিকে সৃষ্টি করা যায় না। মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দাবী করতেন যে ভারতের মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি। এ দাবী ইতিহাসসম্মত ছিল না। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সংখ্যালঘু অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা দ্বারা ভারতীয় মুসলমানরা একটি আলাদা জাতি বা nation তা প্রমাণ করা যায় না। জিন্নাহ্ পাকিস্তান সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন কিন্তু পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হ'ল না। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠবে কি না তা এখনও অনিশ্চিত।

মানব প্রকৃতির মধ্যেই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তার নিজস্ব পরিচিত পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং তাকে ভালবাসা মানুষের স্বভাব বা স্বাভাবিক ধর্ম। অপরিচিত পরিবেশের প্রতি তার ভয় এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত ঘৃণাও স্বাভাবিক। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে তার পরিবেশের পরিধিও বিস্তৃত হয়। প্রথমতঃ একটি পরিবারের মধ্যেই তার পরিবেশ সীমাবদ্ধ থাকে এবং ধীরে ধীরে গোষ্ঠী (clan), সম্প্রদায় (tribe) ইত্যাদি গঠিত হওয়ার সাথে সাথে তার পরিবেশের পরিধিও বিস্তৃততর হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে মানুষ [illegible] সমগ্র দেশকে তার নিজের পরিবেশ বলে মনে করতে পারে। নিজের দেশের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তাকে ভালবাসা তাই বর্তমান যুগের মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষ যখন সমস্ত বিশ্বকে তার নিজস্ব পরিবেশ বলে মনে করতে পারবে তখন জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতাবাদে
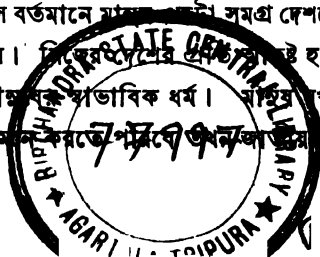
পরিণত হতে পারে। তাই অনেকে জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার পথে একটি পদক্ষেপ বলে মনে করেন।[1]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবার বা সেই ধরণের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ বা ভালবাসা থাকে তার সাথে জাতির প্রতি ভালবাসা বা জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে একেবারে অভিন্ন মনে করা ভুল হবে।[2] পরিবারের প্রত্যেকের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে কিন্তু জাতির বেলায় সেই কথা প্রযোজ্য নয়। শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইত্যাদির ফলে জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়।

এখানে nationality কথাটি নিয়ে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটি জাতির ভেতর সাধারণতঃ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ভারতবর্ষের ভেতর বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, মাদ্রাজী ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই এই রকম দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। Nation বলতে আমরা যা বুঝি তার অনেক বৈশিষ্ট্যই এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বর্তমান আছে। কিন্তু তবুও এগুলোকে আমরা nation বলি না কারণ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হওয়ার কোন আকাঙ্খা এই গোষ্ঠীগুলির নেই। রাজনৈতিক ভাবে স্বেচ্ছায় একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই গোষ্ঠীগুলি একত্রে বাস করতে চায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। এই সব গোষ্ঠীগুলিকে nation না বলে সাধারণতঃ nationality বলা হয়।[3]

---

1 "The truth is that nationalism is a stage in political development. The family is superseded by the tribe, the tribe by the nation. And we can expect that the nation will give place to the regional federation, and family, perhaps, to a world federal authority. Nationalism is a stage in development......" Sydney D. Bailey, *The Quarterly Review*, January 1950.

2 "Nationalism—our identification with the life and aspirations of uncounted millions whom we shall never know, with a territory which we shall never visit in its entirety—is qualitatively different from the love of family or of home surroundings." Hans Kohn, "The Nature of Nationalism,' *American Political Science Review* Vol. 33, 1939.

3 "In fact, even in a modern sense we may conceive of a state's being composed of several nations, although perhaps the term *nationalities* should be used in this connection." Palmer and Perkins, *International Relations*.

জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা। প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার থাকা উচিত— এই নীতি আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালীর জোসেফ মাৎসিনী (Mazzini) এই নীতি বিশেষভাবে প্রচার করেন এবং তিনি মনে করতেন যে এই নীতি স্বীকৃতি হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন এই নীতির উপর বিশেষ জোর দেন এবং তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফার মধ্যে এই নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি জাতি নিয়ে গঠিত হবে। একাধিক জাতি নিয়ে যে সব রাষ্ট্র গঠিত ছিল (যেমন অষ্ট্রিয়া বা তুরস্ক) সেগুলিকে ভেঙ্গে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' (One nation, one state) এই নীতির ভিত্তিতে নতুন করে গঠন করতে হবে। নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সরকার গঠন করার অধিকার প্রত্যেক জাতিকে দিতে হবে। এই নীতিকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (right of self-determination) বলে। এই নীতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। কয়েকটি জাতি নিয়ে যদি একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় তবে সেই রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ বিবাদ প্রায় অনিবার্য রূপেই দেখা দেয়। এই ধরণের রাষ্ট্রে সাধারণতঃ একটি জাতিই প্রভুত্ব করে এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা নিজেদের পরাধীন মনে করে। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি গৃহীত হলে প্রত্যেক জাতিই আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে বহু জাতি মিলে যে সব রাষ্ট্র গঠিত হয় সেখানে অনগ্রসর বা সংখ্যালঘু জাতিদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ঘটে। তবে এই নীতির বিরুদ্ধেও অনেকে বিভিন্ন কারণে মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমতঃ, জাতি বা Nation-এর কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তিব্বত একটি জাতি কিনা, ইউক্রাইন বা লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা এক একটি পৃথক জাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা তা কি করে বুঝা যাবে ? দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতি একই অঞ্চলে এমন ভাবে মিশে আছে যে তাদের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা প্রায় অসম্ভব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই নীতির ভিত্তিতে ইউরোপে চেকোস্লোভাকিয়া প্রমুখ অনেক রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই চেকোস্লোভাকিয়াতে বহু জার্মান বাস করত এবং পরবর্তী কালে তা নিয়ে বহু গোলযোগ সৃষ্টি হয়। চেকোস্লোভাকিয়ার

অন্তর্গত স্লোভাকরা (চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের পূর্বদিকে তারা বাস করত) শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটি পৃথক জাতি বলে দাবী করে এবং তাদের নেতা তুকা (Tuka)-র নেতৃত্বে তারা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র', এই নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন আরম্ভ করে। বর্তমান যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই নীতির ভিত্তিতে নানারকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হওয়া আশ্চর্য নয়। তৃতীয়তঃ, কেবলমাত্র অধিবাসীদের কথা চিন্তা করে একটি রাষ্ট্রের সীমারেখা স্থির করা অসম্ভব। এই ব্যাপারে ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা উপেক্ষা করা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত তার সীমা বিস্তার করতে চায়। জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষিত করার জন্যই ফ্রান্স এই দাবী করে কিন্তু তার ফলে বহু জার্মানকে ফ্রান্সের অধীনস্থ করা হয় বলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনুযায়ী এই দাবী মিত্রশক্তি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তা হ'লেও রাইনল্যাণ্ডকে বে-সামরিকীকরণের (demilitarization) জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেই সময় ইতালীও তার উত্তর দিকের সীমা আল্পসের ব্রেণার গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তারিত করার জন্য আবেদন জানায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাকিয়াকে সুদেতনল্যাণ্ড (Sudetanland) দেওয়া হয় যদিও সেই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল জার্মান। সুদেতনল্যাণ্ডের পাহাড়কে কেন্দ্র করে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হবে মনে করেই সেই অঞ্চল এই নতুন রাষ্ট্রকে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অগ্রাহ্য করেও দিতে হয়েছিল। অর্থাৎ এই কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে কেবলমাত্র জাতির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়। দুইটি রাষ্ট্রের সীমারেখা স্থির করা অত্যন্ত জটিল সমস্যা—ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোন একটি বিশেষ নীতি প্রয়োগ করে এই সমস্যার সরল সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, চতুর্থতঃ এই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপায় কি? জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ককে পরাজিত করে মিত্রশক্তি প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই নীতি প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিল। পরাজিত রাষ্ট্রকে এই নীতি অনুযায়ী বিভক্ত করা সম্ভব কিন্তু সর্বজনীন ভাবে এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার কোন উপায় নেই। বর্তমানে যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত ক্রোশিয়াতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। ক্রোশিয়ানরা একটি জাতি কি না তা স্থির করার প্রথমতঃ বিজ্ঞানসম্মত কোন উপায় নেই, এবং, দ্বিতীয়তঃ, একটি জাতি হিসেবে যদি তাদের স্বীকার করেও

নেওয়া যায় তবুও যুগোস্লাভিয়া [পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্র সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য] কি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বেচ্ছায় মেনে নেবে ? গণভোট বা Plebiscite-এর মাধ্যমে একটি অঞ্চলের জনসাধারণের অভিরুচি জানা যেতে পারে কিন্তু কোন রাষ্ট্রই তার কোন অঞ্চলে এই ধরণের গণভোটের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর কয়েকটি অঞ্চলে গণভোটের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রের বেলাতেই তা প্রয়োগ করা সম্ভব। তা ছাড়া, গণভোটের মাধ্যমে জনসাধারণের অভিরুচি জানা সম্ভব হলেও, পূর্বেই বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামরিক উপাদান ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কখনও রাষ্ট্রের সীমারেখা স্থির করা সম্ভব হতে পারে না। এই সব সমস্যার কথা চিন্তা করেই প্রেসিডেন্ট উইলসনের রাষ্ট্রসচিব রবার্ট লেনসিং (Robert Lansing) এই নীতির (Wilson-এর right of self-determination নীতির) বিরোধিতা করেছিলেন।[1]

জাতি বা জাতীয়তাবাদ যেমন ইতিহাসের সৃষ্টি, রাষ্ট্রও তেমনি ইতিহাসের নানা ঘাত প্রতিঘাতে গঠিত হয়। জাতির ভিত্তিতে যেমন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে (Nation-State) তেমনি রাষ্ট্রের ভিত্তিতেও অনেক সময় জাতির সৃষ্টি হয় (State-nation)। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জার্মানী ও ইতালী রাষ্ট্র গঠিত হয় কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসক কর্তৃক একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রথমে স্থাপিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে। মারাঠি, পাঞ্জাবী, রাজপুত, বাঙ্গালী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির মিলিত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বৃটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার পর তার পটভূমিতেই সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগুলি nationality নামে পরিচিত হ'ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রমুখ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অনেক রাষ্ট্রই বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বাস করে

---

1 তিনি বলেছিলেন: "It will raise hopes which can never be realized. It will, I fear, cost thousands of lives. In the end it is bound to be discredited, to be called the dream of an idealist who failed to realize the danger until too late to check those who attempt to put the principle in force. What a calamity that the phrase was ever uttered! What misery it will cause!"

তবুও সেখানে সোভিয়েট জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভিন্ন জাতির মিলন যদি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়, এক জাতি যদি অন্য জাতি দ্বারা অত্যাচারিত বা বঞ্চিত না হয়, তবে সেই রাষ্ট্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে জাতীয় রাষ্ট্র (nation state) না হ'লেও তাকে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের গ্রহণ করে নিতে হয়। বিভিন্ন জাতিকে (তাদের nationality বলা হলেও তারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থে জাতি) এইভাবে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একটি জাতিকে বলপ্রয়োগ করে যখন অন্য রাষ্ট্রের অধীনস্থ করা হয় তখন সেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতিগতভাবে মেনে নিতেই হবে।[1]

বিভিন্ন ধরণের জাতীয়তাবাদ

পরিবেশকে ভালবাসা এবং পরিবেশের সাথে একাত্ম হওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যেই যদিও জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি নিহিত আছে তবুও আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদ কয়েকশত বৎসর পূর্বে মাত্র সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপে ফিউডাল প্রথার বিরুদ্ধেই প্রথমতঃ এই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা যায়। বণিক ও শিল্পপতিরা ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্যই ফিউডাল প্রথা ধ্বংস করে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে। ফিউডাল যুগে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সামন্ত প্রভুদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের আইন ও মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জিনিষপত্র রপ্তানী করতে গেলে বিভিন্ন সামন্ত প্রভুদের কর (tax) দিতে হ'ত। সেই প্রথা ব্যবসায় বাণিজ্য উন্নতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। তা ছাড়া সামন্ত প্রভুরা তাদের প্রজাদের জমি ছেড়ে কলকারখানায় কাজ করার অধিকার দিতেও অস্বীকার করে। ফলে বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণী সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেদের দেশকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনার চেষ্টা করে। অনেক সময়ই তারা দেশের রাজার নেতৃত্বে (ফিউডাল প্রথায় রাজার বিশেষ

---

1 এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে Robert Lansing প্রেসিডেণ্ট উইলসনের জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা লাভের অধিকারকেও অস্বীকার করেন। তিনি লিখেছেন: "What effect will it have on the Irish, the Indians, the Egyptians, and the nationalists among the Boers? Will it not breed discontent, disorder and rebellion?"

কোন ক্ষমতা ছিল না) কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করার চেষ্টা করে। এই ধরণের জাতীয়তাবাদকেই Quincy Write তাঁর বিখ্যাত A Study of War গ্রন্থে monarchical nationalism বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে জনসাধারণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। এর পূর্বে কোন দেশের জনসাধারণই জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশেষ অনুপ্রাণিত হয় নি। দেশের সরকারকে জাতির প্রতিনিধি হিসেবে দেখার মত দৃষ্টিভঙ্গী তখন থেকেই সৃষ্টি হয়। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী ফরাসী জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরিণত হয় এবং ফরাসী সরকার সেই আদর্শ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বিভিন্ন দেশে প্রচার করতে আরম্ভ করে। Quincy Wright এই জাতীয়তাবাদকে revolutionary nationalism বলে বর্ণনা করেছেন এবং Hayes ফরাসী বিপ্লবের জেকোবিন পার্টির নামানুসারে এর নাম দিয়েছেন Jacobin nationalism. ফরাসী আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জার্মানী, ইতালী প্রমুখ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হ'ল। সেই জাতীয়তাবাদ তৎকালীন ফরাসী জাতীয়তাবাদের মত বৈপ্লবিক ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই সেই জাতীয়তাদের নেতৃত্ব দেয় এবং রক্ষণশীল মনোভাব দ্বারা তা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। Hayes-এর ভাষায় এই জাতীয়তাবাদকে traditional nationalism বলা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ইউরোপে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হ'ল এবং পোল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। তুরস্কের অটোম্যান (Ottoman) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং 1829 খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। ইওরোপের বাইরেও আমেরিকায় স্পেনীশ ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে অনেক দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উদারনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে। Hayes এবং Quincy Wright উভয়ই এই আন্দোলনকে liberal nationalism নামে অভিহিত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদের এক নতুন রূপ দেখা দেয়। Liberal nationalism

সর্বত্রই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইতালী, জার্মানী ও স্পেনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা ও স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করে। মুসোলিনী, হিটলার, জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ও উদারনৈতিক মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে ফ্যাসিষ্ট এবং নাৎসী মতবাদ প্রচার করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের বাইরেও এই ধরণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসারিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে জাপান জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আরম্ভ করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাপানী জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদের রূপ গ্রহণ করে। এই জঙ্গী ও স্বৈরতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদকে totalitarian nationalism (Quincy Wright) এবং integral nationalism (Hayes) নামে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রথম সূত্রপাত হলেও ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সব দেশই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়।

জাতীয়তাবাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কার্যসূচী নেই। জাতীয়তাবাদ আসলে একটি আকাঙ্খা মাত্র। নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য, তার সাথে একাত্মবোধ, তার উন্নতি কামনা—এটাই হ'ল জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের আসল কথা। তাই বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কোথাও জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশকে একত্র করে (যেমন জার্মানী, ইতালী) আবার কোথাও তা একটি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে উদ্যত হয় (যেমন উনবিংশ শতাব্দীর অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী)। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের সমর্থক আবার কখনও একনায়কতন্ত্রের। বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতেই জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভূমিকা বিচার করা উচিত। গণতন্ত্রের সাথে বা স্বৈরতন্ত্রের সাথে জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ এবং তত্ত্বগত ভাবে জড়িত নয়। দেশের প্রয়োজনে বা দেশের নামে নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খাকে যে কোন ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তাই একই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে অহিংস রূপ নিল এবং জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে তা হিংস্র রূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবাদী

আকাঙ্খা বিভিন্ন খাতেই প্রবাহিত হতে পারে। বর্তমান যুগে এই আকাঙ্খা এতই প্রবল যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে বা জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। তত্ত্বগত ভাবে সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজম জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে না। সমস্ত পৃথিবীর শোষিত জনসাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যই এই ভাবধারার সৃষ্টি হয়। কম্যুনিজম শোষক ও শোষিত একমাত্র এই জাতিকেই স্বীকার করে। কিন্তু এই ভাবধারার ভিত্তিতে যখন গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে তখন সেই আন্দোলন আর প্রচলিত জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নিজেদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা বজায় রাখতে সমর্থ হ'লেও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক দল (একমাত্র রাশিয়া ছাড়া) নিজ নিজ দেশের সরকারকেই সমর্থন জানায়। ফলে ধীরে ধীরে E. H. Carr-এর ভাষায় সমাজতন্ত্রের জাতীয়করণ (nationalization of socialism) সম্ভব হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (Third International) গঠিত হয় কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তা ভেঙে দেওয়া হ'ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের পিতৃভূমির (Soviet Fatherland) নামেই নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করার উৎসাহ পায়। 'জার' আমলে রুশবীরদের কাহিনী নতুন করে রুশ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। "The Internationale"-এর পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করে। Maurice Hindus তাঁর গ্রন্থ *Mother Russia*-তে মন্তব্য করেন: "The revival of Russian nationalism is one of the great phenomena of our time. In my judgement nationalism is certain to be cornerstone of future Russian policy." সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীর (nationalities) নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য সোভিয়েত সরকার প্রথম থেকেই বিশেষ তৎপর ছিল। চীন এবং ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্টরা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খা ও মনোভাবকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেই সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। মার্শাল টিটোর যুগোস্লাভিয়ায় এবং বল্কান অঞ্চলের অন্যান্য দেশে কম্যুনিষ্টরা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছে। তাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের খাতেই জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্খা প্রবাহিত হতে পারে।

জাতীয়তাবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি :

জাতীয়তাবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় দিকেই বিভিন্ন যুক্তি দেখানো যেতে পারে। নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যদি না থাকে তবে আধুনিক যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুবই কষ্টসাধ্য—প্রায় অসম্ভব। বৈদেশিক আক্রমণ বা দেশের অন্য কোন বিপদে নাগরিকেরা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে এবং নানারকম ত্যাগ স্বীকারে রাজী হয়। জাতীয়তাবাদ মানুষকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদই আবার বিশ্বে নানাবিধ সমস্যার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ। জাতীয়তাবোধ অনেক সময় একটি দেশের জনসাধারণকে এত বেশী অহঙ্কারী ও গর্বিত করে তোলে যে তারা অন্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করার অধিকারও দাবী করতে আরম্ভ করে। জাতীয়তাবাদ যখন race theory-তে রূপান্তরিত হয় তখন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং হিংস্ররূপ ধারণ করে। জার্মানীর নাৎসীবাদে আমরা জাতীয়তাবাদের এই অধঃপতন স্পষ্ট করে দেখতে পাই। Joseph de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain প্রমুখ কয়েকজনের লেখার উপর ভিত্তি করে নাৎসীরা তথাকথিত Nordic race-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে আরম্ভ করে। তারা মনে করে যে সমস্ত পৃথিবীর উপর এই nordic race-এর আধিপত্য স্থাপিত হওয়া উচিত। এই মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নাৎসীরা একদিকে পররাজ্য গ্রাসের নীতি গ্রহণ করে এবং অন্য দিকে ইহুদীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে আরম্ভ করে। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের এক জঘন্যতম প্রকাশ। ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ ছাড়াও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের উপরও জাতীয়তাবাদের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। Rudyard Kipling এর White Man's Burden-এর ধারণার সাথে আমরা সুপরিচিত। পাশ্চাত্য দেশে (নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ ছাড়াও) এই রকম ধারণা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল যে ভগবান পাশ্চাত্য দেশকেই উন্নত করে গড়ে তুলেছেন এবং তাদের উপরই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সভ্যতা বিস্তারের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটর Albert J. Beveridge পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষাভাষি এবং টিউটনিক (Teutonic) দেশগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন : "God has

made us the master organizers of the world to establish system where chaos reigns. He has given us the spirit of progress to overwhelm the forces of reaction throughout the earth. He has made us adepts in governments that we may administer among savage and senile peoples. Were it not for such a force as this the world would relapse into barbarism and night. And of all our race, He has marked the American people as His chosen nation finally to lead in the regeneration of the world." এ ধরণের জাতীয়তাবাদ যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা জোগায়। জাপান এই ধরণের জাতীয়তাবাদের প্রভাবে চীন আক্রমণ করে এবং এশিয়ার উন্নতির নাম দিয়ে জাপানী সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। সঙ্কীর্ণ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এমন একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী আছেন যাঁরা জাতীয় সার্বভৌমত্বের নামে জাতিসংঘের বিরোধিতা করেছেন এবং এখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরও বিরোধিতা করে চলেছেন। তাঁদের ধারণা হ'ল যে এই সব আন্তর্জাতিক সংঘ জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। তা ছাড়া, এই ধরণের জাতীয়তাবাদ অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে দেখা দেয়। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদির নামে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে নির্মূল করার চেষ্টা হয়। 'এক জাতি, এক পার্টি, এক নেতা'—এই রকম শ্লোগান দিয়ে জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের কাজে ব্যবহার করার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক দল নাগরিক নিজেদের "100 percent Americans" বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা মনে করেন যে সেই দেশে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার অধিকার কোন মার্কিন নাগরিকের থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের পক্ষে মত প্রকাশ করলে তাঁরা তাকে দেশদ্রোহিতার সামিল মনে করেন। তাঁরা স্কুলে কলেজে সেই সব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার এবং সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে লাইব্রেরীতে বই রাখার বিরোধী। ভারতবর্ষেও এমন ধরণের জাতীয়তাবাদী আছেন যারা ভারতীয় সংস্কৃতির নামে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

জাতীয়তাবাদের ত্রুটিগুলি আমাদের কাছে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের

অভিজ্ঞতার পর থেকে খুবই পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অনেকেই আজ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Nationalism* বইতে উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করেন। জাপানের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। মানবেন্দ্র নাথ রায়ও তাঁর *New Humanism* এবং অন্যান্য পুস্তকে জাতীয়তাবাদকে বিশ্বমানবতার পথে একটি প্রচণ্ড বাধা বলেই বর্ণনা করেছেন। Victor Gollancz একটি বইতে লিখেছেন: "Of all the evils I hate, I hate nationalism most." বারট্রেণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁর *New Hopes For a Changing World*-এ লিখেছেন যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের পথে জাতীয়তাবাদই আজ প্রধান অন্তরায়। তিনি মনে করেন যে এর প্রভাবে মানবজাতি নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে।[1]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জাতীয়তাবাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কার্যসূচী নেই। জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা প্রতিরক্ষার কাজে যেমন জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করা যায় তেমনি সাম্রাজ্য বিস্তারেও এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এই মনোভাবের মধ্যে আবেগের ভূমিকাই প্রধান। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় মর্যাদা মানুষের মনে যে আবেগের সৃষ্টি করে তাকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করা যায়। আধুনিক যুগের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের পক্ষে বা একটি বৃহৎ পার্টির পক্ষে জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে সহজেই একটি নির্দিষ্টপক্ষে প্রবাহিত করা সম্ভব। অতএব জাতীয়তাবাদ ভাল কি খারাপ সেটা বড় প্রশ্ন নয়—আসল প্রশ্ন হ'ল জাতীয়তাবাদকে কোন্ পথে পরিচালনা করা হবে। বিশ্বরাষ্ট্র বা বিশ্বমানবতার কথা আমরা যতই চিন্তা করি না কেন একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রত্যেক দেশেই খুব প্রবল। কেবলমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই নয় ইউরোপ ও আমেরিকাতেও জাতীয়তাবাদ আজও বিশেষভাবে সক্রিয়। এই মনোভাবকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

1. "Nationalism is in our day the chief obstacle to the extension of social cohesion beyond national boundaries. It is, therefore, the chief force making for the extermination of the human force."

স্থাপনের চেষ্টা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নয়। জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব নয় কি? জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রত্যেক দেশই জাতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু আইনগতভাবে সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেও কার্যতঃ সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সমস্যাই হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্কট

আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক সমাজ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের সমবায়েই গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে এ ধরণের রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন ছিল একদিকে পোপের অধীনে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সামন্ত প্রভু বা ফিউডাল লর্ডদের আধিপত্য। ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবে ইউরোপের এক বিরাট অংশে তখন ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্য বজায় থাকলেও সামন্ত প্রভুদের রাজত্ব ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ বিবাদের ফলে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই বিরাজ করত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর চেষ্টায় রাজার নেতৃত্বে আধুনিক যুগের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এক একটি বিরাট ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ইউরোপের ধর্মীয় ঐক্য লোপ পায় অপরদিকে তেমনি সামন্ত যুগের অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলারও অবসান ঘটে। ক্যাথলিক চার্চের দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয় যে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ইউরোপের ঐক্যবোধ ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু সামন্ত প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে এই রাষ্ট্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শৃঙ্খলা ও ঐক্য স্থাপনের সহায়ক ছিল। বারুদ আবিষ্কারের ফলে মানুষ যখন বন্দুক কামান ব্যবহার করতে আরম্ভ করল তখন সামন্ত প্রভুদের পক্ষে জনসাধারণের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেওয়াল তুলে বা পরিখা খনন করে বন্দুক কামানের আক্রমণ থেকে শহর বা দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বৃহত্তর রাষ্ট্রের সীমান্তকে সুরক্ষিত করেই তখন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। তাই বলা হয় যে বারুদ আবিষ্কারের অথবা gun powder revolution-এর ফলেই আধুনিক যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যখন বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকেও আর উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। এই অবস্থা হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিত্যার উন্নতির ফলে ধীরে ধীরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং পারমাণবিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে যেন খুবই বেমানান মনে হয়। রাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষিত করে নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আজ আর সম্ভব কি? সীমান্ত যতই সুরক্ষিত করা হোক কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্ততপক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সীমান্তের বাইরে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়। সীমান্ত সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষ ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত পথ অবরোধ করে একটি রাষ্ট্রের চরম অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া রেডিওর সাহায্যে প্রচার কার্য বা Propaganda চালিয়ে শত্রুপক্ষ একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য শিথিল করে দিতে পারে। সীমান্ত সুরক্ষিত করে প্রচার কার্যের এই অভিযান বন্ধ করা যায় না। সর্বোপরি আকাশ পথ দিয়ে বিমান আক্রমণ এবং আধুনিক কালের পারমাণবিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সীমান্ত সুরক্ষিত করে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা পূর্বে সম্ভব হলেও এখন আর সম্ভব নয়। এই দিক থেকে চিন্তা করলে আধুনিক পারমাণবিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে বেমানানই মনে হয়। তাই বলা হয় যে, জাতীয় রাষ্ট্র আজ এক সঙ্কটের সম্মুখীন। বিজ্ঞানের উন্নতি ও অর্থ নৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে এক সময়ে যেমন সামন্তপ্রভুদের রাজত্বের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করা প্রয়োজন হয়েছিল আজও তেমনি নতুন পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে জাতীয় রাষ্ট্রের বদলে নতুন ধরণের রাষ্ট্র প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। জন হার্জ (John Herz) তাঁর *International Politics in the Nuclear Age* বইতে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন।

অর্থ নৈতিক দিক থেকে এবং নাগরিকদের নিরাপত্তার দিক থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত অনেকটা মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ফলে এই ধরণের রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা হলেও নতুন ধরণের রাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠার কোন সম্ভাবনা নেই। জাতীয় রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য ধরণের কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য মানুষ সহজে স্বীকার করে নেবে না। তাই

জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রেখেই মানুষ আজ আধুনিক যুগের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন ধরণের বৃহত্তর সংস্থা গড়ে তুলছে। যদিও এই বৃহত্তর সংস্থাগুলি জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে তবুও এই সব সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই নতুন ধরণের বৃহত্তর সংস্থাগুলি প্রধানতঃ দুই রকমের —আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক। আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সামরিক সংস্থা এবং অর্থনৈতিক সংস্থা। বর্তমানে দুইটি প্রধান আঞ্চলিক সামরিক সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্রগুলি মিলে একটি গঠন করেছে এবং তার জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট দেশ একত্র হয়ে আর একটি গড়ে তুলেছে। প্রথমটি 1949 খৃষ্টাব্দে উত্তর আটলান্টিক চুক্তির (North Atlantic Treaty) ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়টি 1955 খৃষ্টাব্দে ওয়ারসো চুক্তির (Warsaw Treaty) ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। এই দুইটি আঞ্চলিক সামরিক সংস্থার মত ইউরোপের কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী গণতান্ত্রিক দেশগুলি দুইটি পৃথক অর্থনৈতিক সংস্থাও গড়ে তুলেছে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক সংস্থা COMECON বা Council for Mutual Economic Assistance নামে পরিচিত এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রধান অর্থ নৈতিক সংস্থাকে European Economic Community (EEC) বা Common Market বলা হয়। এ ছাড়াও বর্তমান পৃথিবীতে আরও অনেকগুলি আঞ্চলিক সংস্থা—অর্থ নৈতিক এবং সামরিক—গড়ে উঠেছে।[1] সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই আজ পৃথিবীর প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে অনেকগুলি বিশেষ সংস্থাও (specialized agencies) জড়িত আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার (Charter) বা সনদে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব করার কোন অধিকার নেই। তবুও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি স্পষ্ট আন্তর্জাতিক দিকও আছে। আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিভূ হিসেবেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান পরিচয়।[2]

---

1. অধ্যায়ে আঞ্চলিক সংস্থা নিয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।
2. অধ্যায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এই সব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়া এমন কতগুলি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান আছে যা জাতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখার উর্ধ্বে থেকে সমস্ত পৃথিবীকে একটি 'ইউনিট' ধরে গড়ে উঠেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানকে অনেক সময় trans-national organization বলা হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সরাসরি অস্বীকার করে না। তবে তাদের সংগঠন, কার্য-প্রণালী এবং উদ্দেশ্যের সাথে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা বা সার্বভৌমত্বের কোন সম্পর্ক নেই। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তাদের সহযোগিতায় অথবা সমবায়ে সৃষ্টি হয়েছে। সার্বভৌম রাষ্ট্রই তাদের ভিত্তি। কিন্তু এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের কাজ বিস্তৃত থাকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ কোন সমস্যা বা চাহিদার ভিত্তিতে এই সব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোন স্বীকৃত থাকে না।

রোমান ক্যাথলিকদের চার্চ এ রকমের একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান। ভ্যাটিকান (Vatica n) নামে অতি ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র এই চার্চের কেন্দ্রস্থল হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্যাথলিকদের সাথে এই চার্চের নিবিড় সংযোগ বর্তমান। যে সব রাষ্ট্রে ক্যাথলিকরা সংখ্যায় বেশী সে সব রাষ্ট্রে ক্যাথলিকদের মাধ্যমে এই চার্চের রাজনৈতিক প্রভাবও দেখা যায়। আবার যে সব রাষ্ট্রে ক্যাথলিকদের কার্যকলাপ সন্দেহের চোখে দেখা হয় (যেমন কম্যুনিষ্ট দেশ; ভারতবর্ষেও ক্যাথলিকদের কার্যকলাপ অনেকে জাতীয়স্বার্থ বিরোধী বলে মনে করেন।) সে সব রাষ্ট্রে অনেক সমস্যাও দেখা দেয়। ক্যাথলিক ভিন্ন অন্যান্য খ্রীষ্টীয় চার্চ যদিও 1964 খৃষ্টাব্দে একত্র হয়ে World Council of Churches স্থাপন করে তবুও ক্যাথলিক চার্চের মত বিশ্বের. বিভিন্ন দেশে এদের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না। ক্যাথলিক চার্চের মত ইসলামও এক সময়ে খলিফার নেতৃত্বে (Caliphate) পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু 1923 খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কামাল পাশা খলিফার পদ তুলে দেন এবং তখন থেকে ধর্মের ভিত্তিতে ইসলামের আর কোন বিশ্বসংগঠন থাকে না। বর্তমানে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি একত্র হয়ে যে সংগঠন স্থাপন করেছে তা অন্যান্য ,আঞ্চলিক সংগঠনের মত রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই ধরণের রাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠনকে বিশ্ব সংগঠন থেকে আলাদা করেই বিচার করা উচিত। হিন্দু,

বৌদ্ধ, ইহুদী বা অন্য ধর্মের কোন স্থায়ী বিশ্ব সংগঠন নেই। এই সব ধর্মের নেতৃবৃন্দ কখনও কখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান করেন মাত্র।

কার্ল মার্কস (Karl Marx) মনে করতেন যে জাতীয় রাষ্ট্র বড় বড় শিল্পপতি এবং বণিকশ্রেণী অথবা বুর্জোয়াদের স্বার্থে সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে এই ধরণের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে। তিনি প্রচার করেন যে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের মজুর শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে 1864 খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সংঘ (First International) গড়ে তোলেন। এই আন্তর্জাতিক সংঘ বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তাকে স্বীকার করে গঠিত হয় না; বিশ্বের সমস্ত মজুর শ্রেণীর স্বার্থেই সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) নেতা মাইকেল বাকুনিনের (Bakunin) সাথে মতবিরোধ এবং 1871 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার জন্য, 1873 খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম আন্তর্জাতিক সংঘের অস্তিত্ব লোপ পায়। পরে 1889 খৃষ্টাব্দে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ স্থাপিত হয় তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে যায়, কারণ একমাত্র রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি ছাড়া আন্তর্জাতিক সংঘের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রকেই তখন সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ বা কমিনটার্ন (Comintern) লেনিনের নেতৃত্বে 1919 খৃষ্টাব্দে মস্কোতে স্থাপিত হয়। এই কমিনটার্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিজমের পক্ষে এবং মজুর শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করতে আরম্ভ করে। অনেকে মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত এই কমিনটার্নের নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ এবং বিশ্বের মজুর শ্রেণীর স্বার্থকে অভিন্ন করে দেখা হয়। তাঁদের মতে কমিনটার্ন শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকম জাতীয় রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে না উঠে একটি বিশেষ জাতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিনটার্ন ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং পরে ইউরোপের কয়েকটি কম্যুনিষ্ট পার্টি মিলে কমিনফর্ম (Cominform) গঠন করে। এই কমিনফর্মের উপরও সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যের অভিযোগ আনা হয়। 1954 খৃষ্টাব্দে কমিনফর্মকেও ভেঙ্গে দেওয়া হল। আজকাল বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশের

মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় (যেমন চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক, যুগোস্লাভিয়া-সোভিয়েত সম্পর্ক ইত্যাদি) তাতে মনে হয় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে জাতীয় রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে উঠা সম্ভব হয় নি। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্বন্ধে (যেমন লিবারেলদের বা সোস্যালিষ্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠন) এই কথা আরও বেশী প্রযোজ্য।

মার্কসবাদীরা আশা করেছিলেন যে, শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে এক বিশ্ব আন্দোলনের রূপ নেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে এখন পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলন প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। যে দুইটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একটি অর্থাৎ World Federation of Trade unions (W.F.T.U.) কম্যুনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত, এবং অপরটি অর্থাৎ International Confederation of Free Trade Unions (I.C.F.T.U.) পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি দ্বারা প্রভাবিত। ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনও দ্বিধা বিভক্ত। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমিক একই বিশ্ব সংগঠনের মধ্যে একত্রিত হতে পারে নি।

শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর ঊর্ধ্বে বিশেষ উঠতে না পারলেও বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা নিজেদের মুনাফা অর্জনের জন্য সে ক্ষেত্রে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে Rothschild পরিবারের উদাহরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে Amschel Rothschild-এর পাঁচ পুত্র ইউরোপের পাঁচটি বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। এই পাঁচ ভাই-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল এবং তারা পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় করে এবং সরকারকে ঋণ প্রদান করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। উন্নতশীল দেশ গুলিতে বৃহদায়তন এমন অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যারা এ ভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অগ্রাহ্য করে প্রত্যক্ষ ভাবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি করে নিজেদের স্বার্থে এমন ভাবে উৎপাদন ও ব্যবসায় নীতি গ্রহণ করে যাতে সকলেই অধিকতর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কার্টেল (international cartel) গড়ে

তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের বৃহদায়তন তৈল কোম্পানী বিভিন্ন অনুন্নত দেশে প্রায় স্বাধীন ভাবেই তৈল উৎপাদন ও ব্যবসায়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিউবার চিনি উৎপাদনের উপর এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর শিল্পপতিদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতেও মার্কিন শিল্পপতিদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। শিল্পপতিরা জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া প্রধানতঃ নিজেদের উদ্যোগেই অনুন্নত অনেক দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনুন্নত দেশগুলি যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তারা এই বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বহুজাতিভিত্তিক বড় বড় কোম্পানী (multinational corporations) বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে।

আধুনিক পৃথিবীতে এই সমস্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তবুও তত্ত্বের দিক থেকে এখন পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকেই আন্তর্জাতিক সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 1648 খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত ওয়েষ্টফালিয়া সন্ধি (Treaty of Westphalia) থেকেই আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস সাধারণতঃ আরম্ভ করা হয়। সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রই এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হলেও মূলতঃ সেই কাঠামো এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। তাই Joseph Frankel তাঁর *International Relations* বইতে লিখেছেন: "In the last few decades, particularly since 1945, international society has undergone important changes, but its basic structure has remained the same since 1648, especially in theory; it is a society of sovereign territorial states."

2. বৈদেশিক নীতি, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

সমাজে কোন মানুষ সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না—অন্যের সাথে তাকে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে নানাধরণের সম্পর্ক তাকে স্থাপন করতেই হয়। যে নীতি অনুযায়ী এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই আমরা বৈদেশিক নীতি বলি। বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদেশে যাতায়াত, দেশের নিরাপত্তা ও অর্থ নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে একটি দেশের বৈদেশিক নীতি সৃষ্টি হয়। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য কোন দেশের সরকার বা প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি মানুষ যে পন্থা অবলম্বন করে তাকে মোটামুটিভাবে আমরা নীতি (policy) বলে থাকি।[1] একটি সরকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য লাভের জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই বিভিন্ন উদ্দেশ্য যেমন পরস্পরবিরোধী হতে পারে না, তেমনি বিভিন্ন নীতির মধ্যেও একটি সামঞ্জস্য থাকা স্বাভাবিক। দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি সরকার অনুসরণ করে চলে তাকেই জাতীয় নীতি বা national policy বলা যায়। এই জাতীয় নীতিকে মোটামুটিভাবে দুই অংশে ভাগ করা চলে--আভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি। যে নীতি রাষ্ট্র নিজের ভূখণ্ডে নিজের শক্তি ও সম্পদ দ্বারা অনুসরণ করতে পারে তাকে আমরা আভ্যন্তরীণ নীতি বলি, কিন্তু যে নীতি অনুসরণ করতে হ'লে অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য সহায়তা প্রয়োজন হয় বা যে নীতি অন্য রাষ্ট্রের মতিগতির উপর নির্ভরশীল তা পররাষ্ট্র নীতি বলে পরিচিত। আভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি আসলে একই জাতীয় নীতি বা national policyর দুই রকম প্রকাশ মাত্র। তাই এই দুই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে বিবেচনা করা উচিত নয়। একই সরকার এই দুই নীতিই পরিচালনা করে থাকে। এই দুই নীতির উদ্দেশ্যও অভিন্ন—দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা,

1. নীতি বা Policyর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Webesters New International Dictionary লিখেছে যে Policy হ'ল "a settled or definite course or method adopted and followed by a government, institution, body or individual.

দেশের উন্নতি সাধন করা, এক কথায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তার আভ্যন্তরীণ নীতির অন্তর্গত, কিন্তু এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ প্রয়োজন। তাই দেখা যায় আভ্যন্তরীণ নীতির সাথে বৈদেশিক নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে সামরিক প্রস্তুতির জন্য ভারতবর্ষকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠে। এইভাবে দেশের বৈদেশিক নীতি তার আভ্যন্তরীণ নীতিকে প্রভাবিত করে। তাই কোন দেশের বৈদেশিক নীতিকে তার আভ্যন্তরীণ নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

জাতীয় স্বার্থ, মূল্যবোধ ও বৈদেশিক নীতি

এই কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন যে, একটি দেশের বৈদেশিক নীতি সেই দেশের জাতীয় স্বার্থ অথবা জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সরকারের ধারণার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। বিসমার্ক বলেছিলেন: "For me there is only one compass—only one Pole Star : the well-being of the state". বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে লর্ড পামারষ্টোন (Lord Palmerston)-এর বিখ্যাত ঘোষণা আধুনিক যুগেও অনেকে স্মরণ করে থাকেন। তিনি বলেছেন: "England has no eternal friends, no eternal enemies, only eternal interests." জাতীয় স্বার্থ নিঃসন্দেহে বৈদেশিক নীতির ভিত্তি কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বলতে কি বুঝা যায় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র, জনসভা, পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সংস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির মাধ্যমে একটি বিশেষ সময়ে জাতীয় স্বার্থের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়। স্বৈরতান্ত্রিক দেশে সরকারই সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থের অর্থ স্থির করে, কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক সরকারও জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে না। অবশ্য প্রচার যন্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার (অনেক পরিমাণে গণতান্ত্রিক সরকারও) নিজের ধারণা অনুযায়ী জনমত গঠন করার চেষ্টা করতে পারে।

বিভিন্ন অঞ্চল ও শ্রেণীর পৃথক পৃথক স্বার্থকে একত্রীভূত করে

(aggragation of interests) জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধারণা থাকা স্বাভাবিক। একদল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হতে পারে এবং অপর দল সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করতে পারে। অনেক সময় সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থকেই জাতীয় স্বার্থের রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে। মতবাদের ভিত্তিতেও জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন দল বা নাগরিকের ধারণা আলাদা হতে পারে। একদল পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হ'তে পারে এবং অপর দল পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিরোধী হ'তে পারে। বৈদেশিক নীতিতে একদল সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগদান করা প্রয়োজন মনে করতে পারে, অপর দল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধী দলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে পারে এবং তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক হ'তে পারে। এই রকম বিভিন্ন মতের মধ্যে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করে জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা সহজ নয়। বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা যদি সৃষ্টি করা না যায় তবে সেই দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা খুব কঠিন। ন্যূনতম জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধেও যদি দেশের সমস্ত শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব না হয় তবে সেই দেশ কখনও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। জাতির ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ ঐক্যমত বিশেষ প্রয়োজন। অস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব Charles Evans Hughes বলেছিলেন: "Foreign policies are not built upon abstractions." বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ধারণা কখনও abstraction-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা যায় না। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব নীতির মাধ্যমেই জাতীয় স্বার্থকে রূপ দিতে হয়। একটি দেশের মৌলিক জাতীয় স্বার্থ বহু বৎসর ধরে প্রায় একই থাকে, কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। কম্যুনিষ্ট চীন যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু-রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত ছিল ততদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধাচারণ করে গেছে, কিন্তু চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব প্রকট হওয়ার পর থেকে চীন সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তিত হয়। চীন সম্বন্ধে এই উভয় নীতিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একটি দেশের পক্ষে কেবল নিজের জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্য দেশের—সে দেশ বন্ধু বা শত্রু যাই হোক না কেন, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা যদি না থাকে তবে কোন সরকারের পক্ষেই নিজের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সার্থকভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অন্য দেশের জাতীয় স্বার্থ, শক্তি ও পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেই সেই দেশের সাথে কি ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত এবং সম্ভব তা স্থির করতে হয়। যে সব রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে কোন সংঘাত থাকে না তাদের মধ্যেই বন্ধুত্ব সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে উঠতে পারে (যেমন কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি) এবং তাদের ভিতর বন্ধুত্ব অনিবার্যরূপেই সৃষ্টি হয়। প্রাচীন গ্রীসের অভিজ্ঞতা থেকে Thucydides বলেছিলেন : "Identity of interests in the surest of bonds whether between states or individuals." যেসব রাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী সেই সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। এমন হ'তে পারে যে দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘাত-শূন্য এবং পরস্পরের পরিপূরক। সেই অবস্থায় সংঘাতের ক্ষেত্র হ্রাস করে বন্ধুত্বের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা যেতে পারে; আবার স্বার্থের সংঘাতই যদি প্রধান হয়ে উঠে তবে যে ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব সেখানেও বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। যাই হোক, নিজের দেশের এবং অন্য দেশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করেই একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব। বিদেশ নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতেরা সেই দেশের অবস্থা ও নীতি সম্বন্ধে নিজের দেশের সরকারের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধিও এইভাবে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রেরণ করে। সেই সব রিপোর্ট থেকে সরকার অন্য দেশের অবস্থা ও মতিগতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্থির করে এবং এই সব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই বৈদেশিক নীতি গড়ে উঠে এবং প্রয়োজনমত তার পরিবর্তন করা হয়।

জাতীয় সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক দেশেই এক ধরণের মূল্যবোধ (values) সৃষ্টি হয়। ভালমন্দ, উচিত অনুচিত, উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে যে

ধারণা তাকেই আমরা মূল্যবোধ বলে থাকি। এই মূল্যবোধের একটা মানবিক ও সার্বিক দিক আছে আবার বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সাথেও মূল্যবোধ বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকে। ন্যায়, শান্তি, স্বাধীনতা এই ধরণের মৌলিক মানবিক নীতিগুলি প্রত্যেক রাজনৈতিক মতবাদের চরম উদ্দেশ্য হলেও (ফ্যাসীবাদ অবশ্য শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধের আদর্শেই বিশ্বাস করে এবং তাই ফ্যাসীবাদকে মানবতার শত্রু হিসেবেই ধরা হয়।) এই নীতিগুলির ব্যাখ্যা এবং বাস্তব জীবনে এই নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যাই হোক, এই মূল্যবোধের সাথে জাতীয় স্বার্থের সম্পর্ক নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

'জাতীয় স্বার্থ' কথাটা অনেকের কাছে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়। ন্যায়, নীতি, মানবতা ইত্যাদি নিঃস্বার্থ উদার মনোভাবের সাথে জাতীয় স্বার্থের মিল কোথায়? মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে সাধারণতঃ এই নিঃস্বার্থ পররাষ্ট্র নীতির সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[1]

তিনি স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে ন্যায়ধর্মের উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আসলে ন্যায় ধর্মের উপর ভিত্তি করে কোন দেশের পক্ষে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে একটি দেশকে 'ক্রুসেড'-এর মনোভাব নিয়ে অবিরাম অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতে হয়। সাধারণ ব্যক্তি মানুষের কার্যও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ হয়ত নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তার ধন সম্পদ ও জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। জাতির স্বার্থকে উপেক্ষা করার কোন অধিকার সরকারের নেই।[2] জাতির স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের কর্তব্য।

1. 1913 খৃষ্টাব্দের 27 অক্টোবর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন: "It is a very perilous thing to determine the foreign policy of a nation in the terms of material interest...we dare not turn from the principle that morality and not expediency is the thing that must guide us...We have no selfiish ends to serve...We are but one of the champions of the rights of mankind."
2. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা Alexander Hamilton লিখেছেন: "An individual may, on numerous occasions, meritoriously indulge the emotions of generosity and benevolence, not only without an eye to, but even at the expense of, his own interest. But a Government can rarely, if at all, be justifiable in pursuing a similar course..."

ন্যায়নীতি এবং অন্যান্য মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একেবারে সঙ্কীর্ণ ভাবে জাতীয় স্বার্থকে ব্যাখ্যা করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে সাথে সাথে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র নৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শগত (ideological) মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে জাতীয় স্বার্থ নিরূপণ করাও সম্ভব নয়। সোভিয়েত সরকার কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে সমস্ত পৃথিবীতে কম্যুনিজম স্থাপিত হওয়া উচিত। এই আকাঙ্খাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সোভিয়েত বৈদেশিক নীতিকে এই আকাঙ্খার প্রতিফলন মনে করলে সম্পূর্ণ ভুল করা হবে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের নানা ঘটনা ও পরিবেশের কথা ও তাদের গুরুত্ব চিন্তা করে সোভিয়েত সরকারকে তার পররাষ্ট্র নীতি গড়ে তুলতে হয়। এই সব ঘটনা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সোভিয়েত পরারাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। ষ্ট্যালিনের সময় সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির যে উদ্দেশ্য ছিল, ষ্ট্যালিনোত্তর যুগে তার অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ্বে কম্যুনিজম স্থাপন করার আকাঙ্খা সব সময়ই বর্তমান আছে, কিন্তু বাস্তব বৈদেশিক নীতি এমন সব ঘটনা ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে সেখানে এই আকাঙ্খার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বেশী থাকে না। তবে বৈদেশিক নীতির চরম উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে তবে হয়ত বলা যায় যে, সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য হল বিশ্বে কম্যুনিজম স্থাপন করা। উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যা বলা হল তা সব দেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সব দেশ থেকে কম্যুনিজম বিলোপ করে এক ধরণের গণতন্ত্র স্থাপন করা কাম্য মনে করে, কিন্তু তাদের বৈদেশিক নীতিকে সেই আদর্শগত ইচ্ছার প্রকাশ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল হবে। একটি বিশেষ সময়ের জাতীয় স্বার্থের সাথে যতদূর সম্ভব মূল্যবোধের সমন্বয় সাধন করে বৈদেশিক নীতি স্থির করার চেষ্টা হয়। তা করতে গিয়ে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের কোন এক দিকের সাথে মূল্যবোধের সংঘাতও দেখা দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন উভয়ই যখন কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে ছিল তখন চীনের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। আদর্শগত ভাবে চীনের বিরোধিতা করলেও বৃটেন তার অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য চীনের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদর্শগত স্বার্থকেই বড় করে দেখে চীনের সাথে কোন প্রকার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করে।

এই প্রসঙ্গে Joseph Frankel তাঁর *National Interest* বইতে জাতীয় স্বার্থ কথাটি যে তিন অর্থে ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি দেশ তার বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যে আদর্শ স্থাপন করতে চায় তাকে আমরা জাতীয় স্বার্থের আদর্শগত দিক (aspirational level) বলতে পারি। কিন্তু নিজের শক্তি সামর্থ্য ও পারিপার্শ্বিক বাধা-বিঘ্নের কথা বিবেচনা করে একটি রাষ্ট্র বিশেষ সময়ে বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে তাকে জাতীয় স্বার্থের বাস্তব দিক (operational level) বলা যায়। একটি দেশের সরকার তার বৈদেশিক নীতিকে ন্যায়ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের নামে যে ভাবে ব্যাখ্যা এবং সমর্থন করার চেষ্টা করে তাকে জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল জাতীয় স্বার্থের explanatory level বলে অভিহিত করেছেন। আদর্শগত (aspirational level) জাতীয় স্বার্থ রাজনৈতিক মতবাদ এবং জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা লাভ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত পৃথিবীতে কম্যুনিজম প্রসার করা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শগত জাতীয় (বা শ্রেণীগত) স্বার্থ। সেইভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপন করা পাকিস্তানের এবং সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শগত জাতীয় স্বার্থ। বাস্তব (operational level) জাতীয় স্বার্থ দেশের অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর ক'রে গড়ে উঠে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা হয়। সরকারের নীতি এই বাস্তব জাতীয় স্বার্থের উপরই জোর দেয়। আদর্শগত জাতীয় স্বার্থের সাথে বাস্তব জাতীয় স্বার্থের বিশেষ কোন মিল থাকে না। বিশ্বে কম্যুনিজম স্থাপন করা চীনের আদর্শ হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চীন পাকিস্তান সরকারের বন্ধু। বিশ্বে গণতন্ত্র স্থাপন করা মার্কিন সরকারের আদর্শ কিন্তু তার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মার্কিন সরকারের কোন অসুবিধা হয় নি। প্রত্যেক সরকারই তার বৈদেশিক নীতি ও জাতীয় স্বার্থকে আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধ ও শান্তির সহায়করূপে বর্ণনা করতে চেষ্টা করে। এই ভাবে জাতীয় স্বার্থের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকেই জাতীয় স্বার্থের explanatory level বলা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কম্যুনিষ্ট চীন প্রমুখ প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের বৈদেশিক নীতিকে শান্তি, স্বাধীনতা, মৈত্রী এবং প্রগতির

আদর্শ দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সরকারের বিভিন্ন বিবৃতি এবং নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাতে জাতীয় স্বার্থকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কেবলমাত্র এই সব সরকারী বিবৃতি ও বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে একটি দেশের জাতীয় স্বার্থ ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তাকে সহজ এবং সরল ভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং একটি দেশের বাস্তব আশা আকাঙ্খার ভিত্তিতেই সরকারী বিবৃতি ও বক্তৃতার অর্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় স্বার্থ বলতে কি বুঝায়?

প্রত্যেক জাতির প্রধান স্বার্থ হ'ল তার নিরাপত্তা অর্থাৎ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা। নিরাপত্তার সমস্যাই রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা—এই নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লে নাগরিকদের যুদ্ধ করতে হয়, অর্থ নৈতিক কষ্ট সহ্য করতে হয়, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা বন্ধ রাখতে হয়, সাময়িক ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার বিসর্জন দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র নিজস্ব ভূখণ্ডের এক অংশের উপর দাবী পরিত্যাগ করে নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 1938 খৃষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া সুদেতনল্যাণ্ডের উপর নিজস্ব অধিকার পরিত্যাগ করে সাময়িক ভাবে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অনেক সময় একটি রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় থাকলেও তার সার্বভৌমত্ব বাস্তবক্ষেত্রে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে চীন বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে এমন সব চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়েছিল যার ফলে তার নিজস্ব ভূখণ্ডের উপর অধিকার বজায় থাকলেও সার্বভৌমত্ব অনেক পরিমাণে খর্ব হয়। প্রত্যেক দেশই শত্রুভাবাপন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সমবেত প্রচেষ্টায় প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তা রক্ষার (Collective Security) জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও সেই চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হয়, কিন্তু সেই ধরণের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। আধুনিক যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্র কয়েকটি জোটে বিভক্ত। অতএব কোন একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হ'লে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে পৃথিবীর সমস্ত দেশ

তাদের কূটনীতি ভুলে গিয়ে আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। পারমাণবিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বর্তমান যুগের নিরাপত্তা সমস্যা পূর্ববর্তী যুগের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হয়। পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে না। কারণ নিরাপত্তার জন্য পারমাণবিক যুদ্ধের অর্থ হ'ল উভয়ের ধ্বংস।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় স্বার্থ বলতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক উন্নতি বুঝায়। রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক যে রকমেরই হোক না কেন প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্যদেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আদান প্রদান করার চেষ্টা করে। সেই কারণে অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন দেশে কন্‌সাল ইত্যাদি নিয়োগ করতে হয়। নিজের দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করতে হয় এবং অনেক সময় সরকারী সাহায্য বা Subsidy দিতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলি থেকে অর্থ সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ করতে হয়। দেশের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন দ্বারা প্রত্যেক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিই কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে একমাত্র অর্থনীতি দ্বারাই বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় তা মনে করার কোন কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ, জাতীয় স্বার্থ বলতে জাতীয় শক্তি অর্জন বুঝায়। এই কথা সত্য যে জাতীয় শক্তি কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না, তা লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা লাভ করতে গেলে ক্ষমতা বা শক্তির প্রয়োজন। নিরাপত্তা, অর্থ নৈতিক উন্নতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই শক্তির ভূমিকা অপরিসীম। তাই জাতীয় শক্তি রাষ্ট্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হ'লেও এই শক্তির মূল্য ও গুরুত্ব এতই বেশী যে শক্তি অর্জন রাষ্ট্রের একটি প্রধান লক্ষ্যেই পরিণত হয়। তাছাড়া সব রাষ্ট্রই এমন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বা বজায় রাখতে চায় যা তার জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির সহায়ক হবে।

এই সব উদ্দেশ্য ছাড়া জাতীয় স্বার্থ বলতে আরও অনেক কিছু বুঝায়। প্রত্যেক দেশেরই নিজের সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে একটি মতবাদ (ideology) বা মূল্যবোধ (value system) থাকে। সেই মতবাদ বা মূল্যবোধ দ্বারা

দেশের সকলেই যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে তা নয়। বিদেশের মতবাদ দ্বারা অনেকে আকৃষ্ট হয় এবং এই বৈদেশিক মতবাদের আকর্ষণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ব্যাহত করতে পারে। তাই নিজের দেশের মতবাদ ও মূল্যবোধকে বজায় রাখাও অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নিজের দেশের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করাও জাতীয় স্বার্থের অন্তর্গত।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় স্বার্থের উপর নির্ভর করেই একটি দেশের বৈদেশিক নীতি গড়ে উঠে এবং বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ

বৈদেশিক নীতি কি ভাবে গঠিত হয়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক দেশের বৈদেশিক নীতির একটি মূল লক্ষ্য (long-term goal) থাকে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি করে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই ধাপে ধাপে বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে হয়। অতএব প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আশু প্রয়োজন ও উপস্থিত আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করে বৈদেশিক নীতির সাময়িক উদ্দেশ্য (short-term objective) স্থির করতে হয়। বৈদেশিক নীতির সাময়িক উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সাময়িক উদ্দেশ্যগুলি এমন হওয়া চাই যাতে সে সব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে একটি রাষ্ট্র তার মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। তাই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং সেই লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আশু ও সাময়িক উদ্দেশ্য (immediate and short term objective) স্থির করা বৈদেশিক নীতি পরিচালনার প্রথম কাজ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে একটি দেশের বৈদেশিক নীতি—তার শেষ লক্ষ্য ও আশু উদ্দেশ্য—জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁদের যে ধারণা তা দ্বারাই সাধারণতঃ বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়ে

থাকে। তাই নীতি নির্ধারক মণ্ডলীর (decision-makers) মতাদর্শ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই বৈদেশিক নীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। জওহরলাল নেহেরুর সময়ে ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দল বা নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে মতপার্থক্যই যাই থাক না কেন, কোনও সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের বাস্তব অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। তাই বৈদেশিক নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা কখনও থাকতে পারে না। নীতি নির্ধারকেরা বৈদেশিক নীতিতে যা বাঞ্ছনীয় (desirable) মনে করেন অনেক সময়ই তা অনুসরণ করতে পারেন না, বিশেষ অবস্থায় যা সম্ভব (possible) তা নিয়েই প্রত্যেক সরকারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। একটি দেশের বৈদেশিক নীতি সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঐতিহ্য, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক মতবাদ ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্বারাও একটি দেশের বৈদেশিক নীতি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। এই সব আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রভাবকে বৈদেশিক নীতির মূল নির্ণায়ক (basic determinants) বলা হয়। বৈদেশিক নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের স্বাধীনতা এইসব প্রভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

একটি দেশের বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি (বৈদেশিক নীতি ও নিরাপত্তা নীতি বা defence policy ওতপ্রোতভাবে জড়িত) নির্ধারণের সময় সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তার আয়তন, প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেই হবে। ভারতবর্ষের কোন সরকারই হিমালয়, ভারত মহাসাগর বা ভারত-পাকিস্তান সীমারেখার গুরুত্ব অগ্রাহ্য করে বৈদেশিক নীতি স্থির করতে পারে না। বৈদেশিক নীতিতে সামরিক শক্তির প্রভাব সহজেই অনুমেয়। নিজের এবং বন্ধু ও শত্রু রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বিবেচনা করেই একটি দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে হয়। সেই কারণে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রকৃতি ভিন্ন রকমের হয়। অর্থনৈতিক ভাবে প্রত্যেক দেশই অন্য দেশের উপর কম বা বেশী নির্ভরশীল। অনেক রাষ্ট্রকেই বিদেশ থেকে খাদ্য, কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। সব রাষ্ট্রেরই

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন আছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের সময় সমস্ত সরকারকেই এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে। একটি দেশের বৈদেশিক নীতির উপর সেই দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যর প্রভাবও যথেষ্ট দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত নতুন রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের উপর বা শ্রেণী বা আঞ্চলিক স্বার্থের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁরা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য স্থাপন করে তাঁদের নীতি স্থির করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে জাতীয় স্বার্থ সমন্ধে একটি সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা সহজ নয়, কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। মোটামুটি একটা ঐক্যমত সৃষ্টি করতে না পারলে কোন বৈদেশিক নীতি সমস্ত দেশের সমর্থন লাভ করতে পারে না। দেশের বৈদেশিক নীতি যদি দলীয় নীতিতে পরিণত হয় তবে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সুনাম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বৈদেশিক নীতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। জওহরলাল নেহেরু যে জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন তা মোটামুটিভাবে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করে। সেই কারণেই এই নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। দেশের অধিকাংশ লোকের রাজনৈতিক ধারণা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। যদিও প্রত্যেক দেশের সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলের সম্মতির ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে তবুও সমস্ত দেশ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের মধ্যে জনসাধারণের অসন্তোষ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন অনেক সময় সরকার বৈদেশিক ব্যাপারে এমন নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি সেই দিকে আবদ্ধ হয়। সোভিয়েত

ইউনিয়নের অভ্যন্তরে খ্রুশ্চেভ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভেতর যে সংঘাত চলছিল তার সাথে হাঙ্গেরীতে 1956 খৃষ্টাব্দে সেভিয়েত হস্তক্ষেপের নিকট সম্পর্ক ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সেই ভাবে অনেকের ধারণা যে 1961 খৃষ্টাব্দে ভারত গোয়াতে যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করে তার সাথে কৃষ্ণ মেননের নির্বাচনী প্রচার যুক্ত ছিল। কৃষ্ণ মেনন তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নিজেই এই অভিযান প্রেরণের সব ব্যবস্থা ঠিক করেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক কিছুই জানতেন না। এই ভাবে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব অনেক সময়ই বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে, যদিও তা সর্বদা জনসাধারণের গোচরে আসে না।

এই সব আভ্যন্তরীণ প্রভাব ছাড়া বিশ্বপরিস্থিতির উপরও একটি দেশের বৈদেশিক নীতি অনেকাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয় তা পৃথিবীর সব দেশের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে। কোন সরকারই এই প্রভাবকে অস্বীকার করে বৈদেশিক নীতি স্থির করতে পারে নি। বৈদেশিক নীতি স্থির করার পূর্বে একটি দেশের সরকারকে বিশ্বপরিস্থিত এবং অন্যান্য দেশের উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক সরকারই প্রকাশ্য ভাবে এবং গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু আজকাল সংবাদের আধিক্য এত বেশী যে দেশের কোন প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষে তা ভাল করে দেখা সম্ভব নয়। সেইজন্য সংবাদের সংক্ষিপ্তসার অথবা নিজের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। ফলে বিশ্বপরিস্থিতির আসল অবস্থা অথবা অন্য দেশের বৈদেশিক নীতির আসল উদ্দেশ্যের সাথে এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা হয় তার ব্যাখ্যা নিয়েও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশ একই সংবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ব্যাখ্যা অনেক সময়ই নিজের দৃষ্টিভঙ্গী, আবেগ, ভয় বা উত্তেজনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তা ছাড়া যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার প্রণালীও সব দেশে এক রকম নয়। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলি যেভাবে ব্যাখ্যা করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা প্রণালী সে রকমের নয়। কম্যুনিষ্টরা বিভিন্ন ঘটনাকে এবং বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতিকে শ্রেণী স্বার্থ, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা

করে থাকে। পশ্চিমের দেশগুলি বিশ্বপরিস্থিতিকে এবং কোন দেশের বৈদেশিক নীতিকে এ ভাবে ব্যাখ্যা করে না। ফলে অনেক সময়ই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উদ্দেশ্যের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমন হতে পারে যে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্বন্ধে এক পক্ষ যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা সঠিক পরিস্থিতি থেকে একেবারেই আলাদা। অনেক সময়ই সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর না করে অন্য দেশের ভাবমূর্তির (Image) উপর নির্ভর করেই একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি রচিত হয়ে থাকে। অন্য দেশের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা থাকে তাকেই সেই দেশ সম্বন্ধে আমাদের ভাবমূর্তি বা image বলা হয়। যেমন পাকিস্তানের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি হল যে ভারত একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশ। তাই ভারত যাই করুক না কেন পাকিস্তান সে সব কার্যের বিস্তারিত কোন বিশ্লেষণ না করেই সিদ্ধান্ত করে নেবে যে ভারতের উদ্দেশ্য পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী। পাকিস্তান সম্বন্ধে ভারতের মনোভাবও এই ভাবমূর্তি দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কোন দেশ, ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রনায়কের মনে যদি বিশেষ কোন ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়ে যায় তবে তিনি প্রধানতঃ সেই ভাবমূর্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমস্ত তথ্যকে সেই ভাবমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করেন। Joseph Frankel তাঁর *International Relations* বইতে তাই লিখেছেন: "Images, not detailed information, govern political behaviour." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কও অনেকাংশে এই ভাবমূর্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখন কেউ কেউ মনে করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্যকে ভুল বোঝার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন সরকার ঠাণ্ডা লড়াইতে (cold war) জড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশের সরকারই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসনতন্ত্র প্রচলিত এবং তার ফলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা সব দেশে এক রকম নয়। তবুও এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সরকারের মধ্যে অনেকটা মিল দেখা যায়। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন না। সরকারের যিনি প্রধান তিনি সব-দেশেই এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে যে সব

দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকেই সরকার পরিচালনা করতে হয় (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট) সে সব দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা স্বভাবতঃই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের প্রচুর ক্ষমতা আছে। সেই ধরণের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভার সদস্যদের কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার এবং পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা রাষ্ট্রপতি দ্বারাই মনোনীত হন। মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের উপর বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে বিদেশ সচিব বা Secretary of State বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাষ্ট্রপতি বিদেশ সচিবের উপর বিশেষ নির্ভর না করে নিজেই বৈদেশিক নীতির মূলসূত্র নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বিদেশসচিব কর্ডেল হালের সাথে পরামর্শ না করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবার অনেক রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করার দায়িত্ব কার্যতঃ বিদেশ সচিবের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আইসেনহাওয়ার (Eisenhower) বৈদেশিক নীতি ব্যাপারে বিদেশ সচিব ডালেস-এর (John Foster Dulles) উপরই বিশেষ নির্ভর করতেন। ইংলণ্ডের মত পার্লামেণ্টারী শাসিত দেশে সাধারণতঃ মন্ত্রীসভার সদস্যরা একত্রে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভায় একজন পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকেন এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে তাঁকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার সকল মন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রী দ্বারা পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হন এবং প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীসভার কার্য পরিচালনা করেন। অনেক সময় মন্ত্রীসভার সকলের সাথে আলোচনা না করেই প্রধানমন্ত্রী বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। 1956 খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ইডেন (Eden) মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্যদের সাথে কোন আলোচনা না করেই ইজিপ্টের বিরুদ্ধে সুয়েজ অভিযান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের পদ্ধতিই সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষে মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটের একটি বিশেষ কমিটি আছে। এই কমিটি Standing Committee of the Cabinet on Foreign Affairs নামে পরিচিত ছিল। পরে শ্রীমতী গান্ধী ক্যাবিনেটের

কয়েকটি কমিটিকে একত্র করে Political Affairs Committee স্থাপন করেন।

আজকাল বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ সরকারের প্রধান পরিচালক যিনি (যেমন ভারতবর্ষে বা ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি) তিনি নিজের দায়িত্বেই গ্রহণ করে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে যে সব শীর্ষ সম্মেলন হয়ে থাকে তাতে তাঁরা নিজেরাই যোগদান করেন। তা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপর তাঁকে অনেক কাজের দায়িত্ব দিতেই হয়। তাঁর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মতামতের বা দৃষ্টিভঙ্গীর যদি বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে তবে কাজের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতের মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় তবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না, এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে অপসারণ করে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশে আসল ক্ষমতা কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতেই ন্যস্ত থাকে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি দ্বারাই পরিচালিত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উভয়ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে আইন সভার বা পার্লামেণ্টেরও অনেকখানি সক্রিয় ভূমিকা আছে, যদিও সে ভূমিকা আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যতখানি ব্যাপক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ততখানি ব্যাপক নয়। পার্লামেণ্টের সদস্যদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে পার্লামেণ্টের ভূমিকা অনেকটা পরোক্ষ, কিন্তু পরোক্ষ হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র যে সব দেশে প্রচলিত আছে সে সব দেশে পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত বৈদেশিক নীতি গৃহীত হতে পারে না। বৈদেশিক নীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে একটি বিশেষ কমিটি সৃষ্টি করা হয়েছে (The Consultative Committee of the Parliament for the Ministry of External Affairs)। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এইরকম কোন কমিটি না থাকলেও সরকার প্রয়োজন হলেই বৈদেশিক নীতি নিয়ে পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী কংগ্রেসের (যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে সে দেশে 'কংগ্রেস' বলা হয়) অনুমোদন ব্যতীত কোন চুক্তি সম্পাদন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেট (Senate)-এর দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। তার ফলে মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত অনেক চুক্তিই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে সিনেটের অনুমোদন না পাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয় না। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতি-সংঘের (League of Nations) সদস্য হতে পারে না। বর্তমানে আলাপ আলোচনা ও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে মার্কিন সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ইংলণ্ডের কমন্স সভার (House of Commons) এই ধরণের চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলি নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়ে থাকে।

যে সব দেশে আইনসভা সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী সে সব দেশে সরকারকে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য আইনসভার উপর নির্ভর করতেই হয়। দেশের নিরাপত্তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হলে অথবা অন্য দেশকে অর্থ সাহায্য করতে গেলে সরকারকে আইনসভার সম্মতি নিতেই হয়। সেই কারণে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে অনেকখানি সক্রিয় হয়ে উঠার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কার্যকরী করতে গিয়ে যদি কোন আইন প্রণয়ন করতে হয় তবে আইন সভার মাধ্যমেই তা করতে হবে।

আইন সভা বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির (Standing Committee) মাধ্যমেও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কমিটি (Senate Committee on Foreign Relations) এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে এই কমিটির সভাপতির (Chairman) প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে মন্ত্রীরা বৈদেশিক নীতি স্থির করেন এবং

আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব হল তা বাস্তবে প্রয়োগ করা। এই কথা সত্য হলেও আমলাতন্ত্রের প্রভাব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। গণতান্ত্রিক দেশে মন্ত্রিপরিষদের প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল থেকে নতুন নতুন মন্ত্রি ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের এ ভাবে পরিবর্তন হয় না; সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কার্যকাল অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী। দীর্ঘকাল কার্যে নিযুক্ত থাকায় তাদের যে অভিজ্ঞতা হয় সব মন্ত্রীই তার উপর কমবেশী নির্ভর করেন। যাঁরা প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের অনেকেরই বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে গভীর কোন জ্ঞান থাকে না এবং তাই অনেক সময়ই তাঁরা আমলাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করে চলেন। আমলাদের সিদ্ধান্তই অনেক সময় মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তরূপে প্রচারিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের রিপোর্ট সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বিদেশ দপ্তর (Foreign Office) মন্ত্রিপরিষদের কাছে প্রেরণ করে এবং তার ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ, বিশেষ করে প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, বৈদেশিক নীতির মূলসূত্র রচনা করে থাকেন। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন কোন বিষয়ে বিশেষ কোন নীতি দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করতে চান তখন আমলাদের সাথে তাঁদের মতবিরোধ প্রকট হয়েও উঠতে পারে। সেই সব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীদের নীতিই গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) যখন জার্মানী ও ইতালীর প্রতি তোষণনীতি গ্রহণ করেন তখন বিদেশ দপ্তরের সাথে তাঁর মতবিরোধ উপস্থিত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের অভিমত অনুযায়ীই পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করতে থাকেন। মন্ত্রীরা যদি এ রকম কোন বিশেষ নতুন নীতি প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর না হন তবে আমলাদের পরামর্শ তাঁদের নীতি নির্ধারণকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। বিদেশ দপ্তরের স্থায়ী কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কোন সরকারের পক্ষে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠে। এই কর্মচারীদের প্রভাব কমবেশী সব দেশেই দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিদেশ দপ্তরে আমেরিকাপন্থী ও রুশপন্থী উভয় রকম কর্মচারীই আছেন বলে শোনা যায়।

এই স্থায়ী আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী ছাড়াও সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদদের প্রভাবও বৈদেশিক নীতিতে অনেক সময় দেখা যায়। এর মধ্যে সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য। গণতান্ত্রিক এবং কম্যুনিষ্ট উভয় প্রকার রাষ্ট্রেই বে-সামরিক শাসনের অধীনে সামরিক বাহিনী কাজ করে থাকে। ভারতবর্ষেও এই নীতি অব্যাহত আছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার অনেক দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে এবং সেই সব দেশে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবেই বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে থাকে। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে কোন দেশেই সামরিক শাসনকে আদর্শ শাসন হিসেবে এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। সর্বত্রই বে-সামরিক শাসনের ব্যর্থতাকেই সামরিক শাসনের কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এবং এই ধরণের শাসনকে সাময়িক ভাবে প্রয়োজন বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যাই হোক, বে-সামরিক শাসনের বৈদেশিক নীতিতেও সামরিক বাহিনীর প্রভাব দেখা যায়। যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন সামরিক বাহিনীর পরামর্শ একটি দেশের বৈদেশিক নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন সেনানায়ক তাঁদের রচিত পুস্তকে লিখেছেন যে তাঁরা 1962 খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অভ্যন্তর থেকে চীনা সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে অপসারিত করার নীতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সামরিক প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাথে নিকট সামরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাও বলেছিলেন। অবশ্য সরকার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে সে পরামর্শ গ্রহণ করে নি। আজকাল অস্ত্রশস্ত্র এতই জটিল যে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ সরকার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন বলে মনে করে এবং তাঁদের পরামর্শ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণকে অনেকখানি প্রভাবিতও করে। নতুন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও বৈদেশিক নীতিতে তাদের প্রভাব কোন কোন দেশে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত তথ্যের উপর সব দেশের বৈদেশিক নীতি স্বভাবতঃই নির্ভর করে, কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের—গোয়েন্দা বিভাগ কেবল যে গোপনে তথ্য সংগ্রহের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। তারা নিজেরাই বৈদেশিক নীতিকে নিজেদের বিচার অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপর C. I. A. (Central Intelligence Agency)-র প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগে একটি দেশের বৈদেশিক নীতি জনমত দ্বারাও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই জনমতের এই ভূমিকা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এক দল লোক মনে করেন যে বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তার উপর নির্ভর করে সঠিক নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। জাতীয় স্বার্থে সরকার অনেক সময় জনসাধারণের কাছে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতেও পারে না। অতএব বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা অনেকে পছন্দ করেন না। তা ছাড়া বলা হয় যে অনেক সময় একটি বিতর্কিত বিষয়ে জনসাধারণের মতামত স্পষ্ট ভাবে বোঝাও যায় না। অপর একদল আছেন যাঁরা জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির উপর অধিকতর আস্থাশীল এবং তাঁরা মনে করেন যে যতদূর সম্ভব বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত সমস্ত খবর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করাই উচিত। যদিও সব বিষয়ে জনমত স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না তবুও আধুনিক যুগে সংবাদ পত্র, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত সংস্থার (যেমন শ্রমিক সংস্থা, বণিক সংস্থা ইত্যাদি—এ ধরণের সংস্থাকে interest group বা pressure group বলা হয়) মাধ্যমে জনমত সংগঠিত এবং প্রকাশিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক নীতি নিয়ে আজকাল অনেকেই চিন্তা ভাবনা করেন এবং কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে এই জনমত অগ্রাহ্য করে দেশের বৈদেশিক নীতি স্থির করা সম্ভব নয়। জনমতের চাপে অনেক সময় সরকারকে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনও করতে হয়। চীন সম্বন্ধে কৃষ্ণ মেননের নীতি ভারতের জনসাধারণ দ্বারা কঠোর ভাবে সমালোচিত হওয়ায় কৃষ্ণ মেননকে মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে যেতে হয়, এবং চীন সম্বন্ধে ভারত সরকার তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এখানে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে জনমতের প্রভাব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। অনেক দেশে শ্রমিক, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংস্থা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে দেশের বৈদেশিক নীতি কিছু পরিমাণে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। মার্কিন সরকারের ভিয়েৎনাম নীতি শেষের দিকে দেশের জনসাধারণ দ্বারা তীব্র ভাবে সমালোচিত হয় এবং জনমতের সেই প্রভাবকে মার্কিন সরকার উপেক্ষা করতে পারে নি। এ কথা ঠিক যে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সরকার জনমতকে কেবলমাত্র

অনুসরণ করে চলবে তা নয়; জনমত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়। যে সব দেশে কেবলমাত্র সরকার ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ভিন্ন অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ভাবে জনমত গঠনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না সে সব দেশে সরকারের নীতি ও জনমত অনেক সময় অভিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যে সব গণতান্ত্রিক দেশে সরকার বিরোধী সংবাদ পত্র, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও জনমত গঠনের সুযোগ দেওয়া হয় সে সব দেশে জনমতের নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকে। সে সব ক্ষেত্রে সরকারের উচিত যতদূর সম্ভব জনমতকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সাথে সাথে সরকারের নীতি প্রচার করে তার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করা। অতএব গণতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে অনেকেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে এবং কোন বিশেষ নীতি নির্ধারকের পক্ষে সব সময় বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না। তবে জওহরলাল নেহেরু বা প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা বৈদেশিক নীতিকে যে বিশেষ করে প্রভাবিত করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে সব দেশে একনায়কতন্ত্র প্রচলিত সে সব দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে প্রধান শাসক বা ডিক্টেটরের প্রভাব অনেক বেশী থাকে। হিটলার বা মুসোলিনীর সময়ে জার্মানী বা ইতালী যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে তার জন্য প্রধানতঃ হিটলার বা মুসোলিনীই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত যে সব দেশে একটি মাত্র দলের শাসন প্রচলিত আছে সে সব দেশের নীতি নির্ধারণে দলের বাইরের বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। কিন্তু দল ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের চেষ্টা হয়। তবে সেখানেও ষ্ট্যালিন বা মাও সে-তুং এর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ভিন্ন কোন মতের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে একজন ডিক্টেটর নিজের ইচ্ছামত বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করলেও বৈদেশিক নীতির যে সব মূল নির্ণায়ক শক্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

নীতি নির্ধারণের পরে সেই নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার দায়িত্ব অনেকাংশে রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কর্মচারীর উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক মতবাদ

1. রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ ও প্রকৃতি
2. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশ
3. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইহার ভূমিকা
4. রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইহার ভূমিকা

1. রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ ও প্রকৃতি

'ক্ষমতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে। অনেকের ভাল বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, অনেকের কবিতা লেখার ক্ষমতা থাকে, অনেকের কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিচার করার সময় 'ক্ষমতা' শব্দটি আমরা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। 'ক্ষমতা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Morgenthau বলেন যে, ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি অন্যের মন এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। তিনি লিখেছেন: "When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men". ক্ষমতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Charles P. Schleicher বলেন যে, রাজনীতির একটি মূল উদ্দেশ্য হ'ল অন্যের আচরণকে একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করা এবং সংযত রাখা অর্থাৎ অন্যের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করা। ক্ষমতা বলতে আমরা এই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই বুঝি—অন্যকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যা স্বেচ্ছায় সে করতে রাজী হবে না। তাঁর ভাষায়: "Politics means directing or restraining, ie., controlling the actions of others. Power is the ability to exercise such control—to make others do what they otherwise would not do.........." সামাজিক জগতেও অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবৃত্তি আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এই প্রবৃত্তির প্রকাশ বলেই ধরা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বলপ্রয়োগ থেকে পৃথক করে বিবেচনা করা উচিত। বলপ্রয়োগ করেও একটি দেশ অন্য দেশের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলা হয় না। তা হ'ল সামরিক ক্ষমতা। সামরিক শক্তি এবং সেই শক্তিকে ব্যবহার করার সম্ভাবনার উপর একটি দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান

একটি দেশের পক্ষে অন্য দেশের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ, কিন্তু সামরিক ক্ষমতা যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকাশ না বলে সামরিক ক্ষমতার প্রকাশ বলাই সঙ্গত। অতএব আমরা বলতে পারি যে যুদ্ধ না করে অন্য দেশের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বলা হয়। একটি দেশ নানাভাবে সাহায্য করার প্রলোভন দেখিয়ে অথবা তার ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে অথবা বিশেষ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অন্য দেশের আচরণ প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভাবে অন্য দেশের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা।

2. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশ

রাজনীতির সাথে ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যেখানে ক্ষমতার প্রশ্ন সেখানে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকাই স্বাভাবিক। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই কথা যেমন সত্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ভাবে সত্য। যে সব দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল আছে সেই সব দেশে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই। প্রত্যেকটি দলের ভিতরও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব খুব প্রকট ভাবে প্রকাশ পায়।

কোন সময়তেই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষমতা সমান থাকে না। কয়েকটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী থাকে। অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য স্থিতাবস্থাকেই রক্ষা করার চেষ্টা করে। সেই সব রাষ্ট্র যে নীতি অবলম্বন করে Morgenthau তাকে স্থিতাবস্থার নীতি বা policy of status quo বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু যে সব রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিশেষ অবস্থাতে সন্তুষ্ট নয় তারা স্থিতাবস্থার পরিবর্তন করে অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজেদেরকে অধিকতর ক্ষমতাশালী করে তুলতে চায়। এই সব রাষ্ট্র স্থিতাবস্থার পরিবর্তন (revision) কামনা করে। অতএব এই ধরণের রাষ্ট্রগুলিকে আমরা revisionist power বলে বর্ণনা করতে পারি। Morgenthau এই সব রাষ্ট্রের নীতিকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি বা policy of imperialism বলে অভিহিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ বা imperialism কথাটি অন্য অর্থেও ব্যবহার করা হয় বলে এই শব্দটি এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। যাই হোক, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি এবং স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার নীতি ছাড়াও অনেক সময় একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন কারণে নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করাই এই নীতির আশু উদ্দেশ্য এবং Morgenthau এই নীতির নাম দিয়েছেন policy of prestige. তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের তুলনায়

নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করে, কোন কোন দেশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিশেষ সময়ে ক্ষমতা যে ভাবে বণ্টন করা আছে তা বজায় রাখার চেষ্টা করে, এবং তৃতীয়তঃ, কোন কোন রাষ্ট্র বিভিন্ন কারণে নিজের ক্ষমতা নানা-ভাবে প্রকাশ করে নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রচার করতে আগ্রহী।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিবর্গ যে ব্যবস্থা স্থাপন করে তা তাদের স্বার্থের অনুকূলে থাকে এবং তারপর থেকে তারা সেই ব্যবস্থা বজায় রাখার নীতিই গ্রহণ করে চলে। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের মাধ্যমে ইউরোপে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হ'ল তাতে অষ্ট্রিয়া অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তাই 1815 খৃষ্টাব্দের পর থেকে অষ্ট্রিয়া তার বন্ধু রাষ্ট্রদের সহায়তায় Concert of Europe এর সাহায্যে ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ ভিয়েনা সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা যে ভাবে বণ্টন করা হয় তা অপরিবর্তিত রাখাই হ'ল সেই সময়ের অষ্ট্রিয়ার নীতি। বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া সমস্ত জার্মানীকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন স্থিতাবস্থাতে পরিবর্তন আনার জন্য যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে (Policy of blood and iron)। 1871 খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর জার্মানীই ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ রূপে পরিগণিত হয় এবং তখন থেকে বিসমার্কের নীতি ছিল ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। পরে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম সেই স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে জার্মানীকে ইংলণ্ডের মত একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন এবং সেই নীতির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল তাতে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স ও বৃটেনই সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। তাই তখন থেকে ফ্রান্স ও বৃটেন—বিশেষ করে ফ্রান্স—জাতিসংঘের মাধ্যমে ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ প্যারিস সম্মেলনে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে হারে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় তা বজায় রাখাই ছিল ফ্রান্স ও বৃটেনের নীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিস সম্মেলনে জার্মানীকে অস্বাভাবিক ভাবে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা হয় এবং জাপান ও ইতালীও সেই সম্মেলনে গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই জার্মানী, ইতালী ও জাপান স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার নীতি গ্রহণ করে এবং এই তিন রাষ্ট্রই জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে চলে আসে। স্থিতাবস্থায়

অসন্তুষ্ট রাষ্ট্র সমূহ যে নীতি অবলম্বন করে তার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর দুইটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বর্তমানে উভয়ের নীতিই হ'ল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম পরিবর্তনেরই বিরোধী তা মনে করার কোন কারণ নেই। যে সব পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার আধিপত্য বিশেষ ভাবে হ্রাস পেতে পারে তারা সেই ধরণের পরিবর্তনেরই বিরোধিতা করে থাকে।

যুদ্ধের ফলেই সাধারণতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের আপেক্ষিক ক্ষমতার পরিবর্তন সাধিত হয়। যুদ্ধ যে কারণেই আরম্ভ হোক না কেন যুদ্ধের শেষে বিজয়ী রাষ্ট্র নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী ক'রে তোলার চেষ্টা করে। তখন পরাজিত রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে নতুন স্থিতাবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করে এবং ফলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে অস্বাভাবিক ভাবে দুর্বল করে তোলা হয় কিন্তু হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করে। তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সামরিক ভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনেক সময় একটি শক্তিশালী দেশকে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে এবং তার ফলেও একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায়। অন্য রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক শক্তিশালী হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে কোন কোন দেশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ক (power relations)-কে স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্যেই কিছু পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করতে পারে (স্থিতাবস্থার নীতি)। আবার কখনও একটি রাষ্ট্র প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিজের দেশকে অন্য দেশের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করে থাকে (স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের নীতি)। প্রথম ক্ষেত্রে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে স্থিতাবস্থাকে বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপোষ নীতি অবলম্বন করে স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার সমস্ত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ক্ষেত্রে আপোষ নীতি আসলে তোষণ নীতি

(Appeasement)-তেই পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায় করাই হিটলারের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ইউরোপে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে জার্মান জাতির আধিপত্য বিস্তার করা, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে জার্মানীকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন হিটলারের উদ্দেশ্যকে ভুল ব্যাখ্যা করে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই জার্মানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপোষ নীতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেই আপোষ নীতি (policy of compromise) তোষণ নীতি (policy of appeasement)-তে পরিণত হ'ল, এবং শেষ পর্যন্ত চেম্বারলেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। অতএব একটি রাষ্ট্র প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ক (power relations) এবং স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রেখে তার মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছে, কিংবা বর্তমান সম্পর্ক ও স্থিতাবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করাই তার উদ্দেশ্য, সেই সম্বন্ধে সঠিক বিশ্লেষণ না করতে পারলে অন্যান্য দেশের পক্ষে সেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে—বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে--ক্ষমতা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে তাতে সাফল্য লাভ করার জন্য সাধারণতঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিভিন্ন উপায়ে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অন্যকে পূর্ণ ভাবে অবহিত রাখার চেষ্টা করে। Morgenthau এই নীতিকে মর্যাদার নীতি বা policy of prestige নামে বর্ণনা করেছেন। একটি রাষ্ট্র যে যথেষ্ট শক্তিশালী সেই বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সচেতন করে রাখাই এই নীতির আশু লক্ষ্য। কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করেন এবং কখনও কোন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের প্রতি যদি যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা না হয় তবে কোন রাষ্ট্র তা নীরবে সহ্য করে না। অনেক সময় নিজের দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে একটি রাষ্ট্র নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। নেপোলিয়নের পতনের পর 1815 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। ফলে সেই সময় অষ্ট্রিয়ার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। পরে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য ক্রিমিয়া

যুদ্ধের পর 1856 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। প্যারিসে আরও কতগুলি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া যখন অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করে সমস্ত জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সমর্থ হয় তখন জার্মানী ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশরূপে পরিগণিত হয়। তাই 1878 খৃষ্টাব্দে বল্কান সমস্যা আলোচনার জন্য জার্মানীর রাজধানী বার্লিনেই এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। অতএব যে দেশ যখন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে সাধারণতঃ সেই দেশেই তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে একটি দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় অনেক সময় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে—যেমন নেদারল্যাণ্ডসের হেগ বা সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা—আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়ে থাকে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি অনেক সময় নিজেদের মর্যাদা বাড়াবার জন্য বা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিভিন্ন ভাবে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ভূমধ্যসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে তাদের নৌবাহিনী প্রেরণ করে সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব ও আধিপত্য ঘোষণা করার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের পারমাণবিক শক্তির পরিচয় দিয়ে এবং প্রকাশ্যে সেই সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালিয়ে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। বর্তমানে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেবলমাত্র সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হন না, নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

এই ভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কারণ কি? ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সাথে এই নীতির কি সম্পর্ক? বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ক (power relations) সম্বন্ধে একটি দেশ যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, সেই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই ব্যাপারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই মার্কিন সরকারের উদ্দেশ্য। তাই মার্কিন সরকারের

ক্ষমতা সম্বন্ধে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিকে সব সময় সচেতন রাখাই মার্কিন সরকারের নীতি। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন বন্দরে যুদ্ধের জাহাজ প্রেরণ করে থাকে। ল্যাটিন আমেরিকান দেশ-গুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা (শক্তিশালী দেশ হিসেবে মর্যাদা) যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে সেই অঞ্চলে খুব সহজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধের পরে সেই মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা বৃটেনের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। যে সব রাষ্ট্র প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ক (power relations) এবং স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করতে চায় তারাও প্রথমতঃ শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী জার্মানীর সামরিক মর্যাদা এক সময়ে এত বৃদ্ধি পায় যে অনেক দেশ জার্মানীর সেনাবাহিনীকে অপরাজেয় বলেই মনে করে। এই ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হওয়ায় জার্মানীর পক্ষে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার নীতিকে জোরের সাথে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। তাই একটি রাষ্ট্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা বা স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করা যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, নিজের মর্যাদা (prestige) প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সেই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজ হয়।

একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতাই তার মর্যাদার আসল ভিত্তি। ক্ষমতার সাথে মর্যাদার সামঞ্জস্য না থাকলে সেই নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না। অনেক সময় একটি রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন এক ধারণার সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে যার কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকে না। অর্থাৎ ক্ষমতার তুলনায় মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এই ধরণের হঠকারী নীতি বেশীদিন ধ'রে অনুসরণ করা চলে না। মুসোলিনী ইতালীর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা সৃষ্টি করে তোলেন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দেখা গেল যে তার কোন ভিত্তিই নেই। অপর দিকে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সামরিক শক্তি অনুযায়ী মর্যাদা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়েও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তি ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে জাপান ও জার্মানীকে যদি সচেতন করে তুলতে

পারত তবে তারা হয়ত অন্য ধরণের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ত। সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ছিল কিন্তু সেই অনুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েতের কোন সামরিক মর্যাদা ছিল না। তাই বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রাহ্য করতে সাহস পায়। ফিনল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন ভাব দেখায় যার ফলে রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সময় তার সামরিক শক্তি অনুযায়ী সামরিক মর্যাদা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হ'ত তবে সোভিয়েত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের নীতি অবশ্যই অন্য রূপ গ্রহণ করত বলে মনে হয়। নিজের শক্তি অনুযায়ী বিশ্বরাজনীতিতে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিসঙ্গত। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের রাজনীতিতে মর্যাদার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

3. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইহার ভূমিকা: বিরোধ, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই নিহিত থাকে। রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে, একটি বিশেষ যুগের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তাদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং অনেক সময় কোন কোন দেশ নিজের ক্ষমতা বাস্তবে প্রদর্শন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে। অনেকের মতে ক্ষমতার প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক আকাঙ্খা এবং তার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ক্ষমতার আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রকাশ। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলে থাকেন যে অনেক নিম্নতর প্রাণীর মধ্যেও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং ক্ষমতার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণকে প্রাণিজগতের এই প্রবৃত্তিরই উন্নততর প্রকাশ রূপে বর্ণনা করা যায়। মানব ইতিহাসের সমস্ত যুগে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কেই নয়, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতার বিশেষ ভূমিকা সর্বদেশে সর্বকালে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক জীবনেও এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সমস্ত যুগেই বর্তমান। Morgenthau (তিনি আধুনিক যুগে এই মতের একজন বিশেষ সমর্থক) বলেন যে, পারিবারিক জীবনে আমরা শাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে যে সম্পর্ক দেখতে পাই তার মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। পরিবারের ভেতর এতদিন যে ক্ষমতা শাশুড়ী ভোগ করছিলেন পুত্রবধূ এসে স্বভাবতঃই সেই ক্ষমতার অংশ দাবী করে এবং তাই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানেও এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। একটি গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে—আঞ্চলিক জীবন থেকে আরম্ভ

করে জাতীয় জীবন পর্যন্ত—এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। সমস্ত দেশেই বিভিন্ন দল ও উপদল নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরও প্রকট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে মানুষের চরিত্র ও তার প্রবৃত্তির মধ্যেই ক্ষমতার প্রতি এক স্বাভাবিক আকর্ষণ বর্তমান এবং অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিছু সংখ্যক মানুষ সমস্ত জাতির উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ পায় কিন্তু অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। তবুও যতটুকু সম্ভব সকলেই অন্যের উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে সচেষ্ট। সামাজিক অবস্থা এবং জনমতের উপর এই প্রবৃত্তির প্রকাশভঙ্গী অনেকাংশে নির্ভর করে। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের জন্য নরহত্যা আজ কেউ সমর্থন করেন না কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখন যুদ্ধের রূপ ধারণ করে তখন শত্রুহত্যা আজও সামাজিক ভাবে সমর্থিত এবং প্রশংসিত। স্বৈরতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে সহ্য করা হয় না কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা নাগরিকদের একটি প্রধান কর্তব্য বলে মনে করা হয়। তাই ক্ষমতা দখল ও প্রভাব বিস্তার করার জন্য মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিহিত আছে তার প্রকাশভঙ্গী সামাজিক পরিবেশ ও জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও এই প্রবৃত্তি মানবচরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই। প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রই তার প্রতিবেশীর তুলনায় নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতদূর সম্ভব তাদের পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করে নিয়েছে। কম্যুনিষ্ট চীন ও ফ্রান্স এখন পারমাণবিক শক্তি বাড়াবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিরোধী পক্ষের ভয়ের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেকে সংযত রাখতে বাধ্য হয় এবং এই ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বই একমাত্র সত্য নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতাও সত্য। দ্রুত যাতায়াত ও সংবাদ

আদান প্রদানের ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি, আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্ভব, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ইত্যাদির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ পরস্পারের খুব নিকটে এসে গিয়েছে। বর্তমানে, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর, এই ধারণা আজ অনেকের মনেই সৃষ্টি হয়েছে যে ভবিষ্যতে সকল রাষ্ট্রকেই পারস্পরিক সহযোগিতার পথ ধরেই চলতে হবে। পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে সমস্ত মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। অতএব বাঁচার তাগিদেই আধুনিক কালের দুই বৃহত্তম শক্তি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ পরিহার করার নীতি গ্রহণ করে চলতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আজ মনে করে যে যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কোন দেশের জনসাধারণের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়। তবে এই কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিহার করা সম্ভব হবে। আসলে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা দুইই সত্য এবং জাতীয় স্বার্থ দ্বারা উভয়কেই সমর্থন করা চলে। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি যতখানি এবং যত সহজে আকৃষ্ট হয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিকে তত হয় না। Schleicher ঠিকই লিখেছেন: "Conflict captures the headlines; the relatively unexciting and long-term co-operative process is interpersed, if indeed it receives notice at all." এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে Charles P. Schleicher তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন *International Relations—Co-operation and Conflict.*

প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ভূমিকা কম নয়। সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মিশ্রণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে Arnold Wolfers তাঁর *Discord and Collaboration—Essays on International Politics* বইতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা উভয়ই এক সঙ্গে দেখা যায়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে ব্যাপকতর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে ক্ষমতার প্রশ্ন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তেমন ভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। যদিও অর্থনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় তবুও একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত এমন অনেক সম্পর্ক স্থাপন করে যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কোন সম্পর্ক থাকে না। পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক পরিমাণে গড়ে উঠে। একটি দেশ যখন অন্য রাষ্ট্রের সাথে পলাতক অপরাধীকে প্রত্যার্পণের উদ্দেশ্যে কোন সন্ধি স্থাপন করে (Extradition Treaty) তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার সাথে রাজনীতি বা ক্ষমতার কোন প্রশ্ন জড়িত থাকে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত দিককে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা যথার্থ বলে মনে হয় না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তিন ধরণের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে— বিরোধের সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক এবং সহযোগিতার সম্পর্ক। বিরোধের সম্পর্ক বলতে বুঝায় এমন সম্পর্ক যেখানে স্বার্থের সংঘাত আছে কিন্তু কোন ঐক্য নেই, অর্থাৎ যেখানে সমস্ত ক্ষেত্রেই দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ, পরস্পর বিরোধী। প্রতিযোগিতার সম্পর্ক বলতে আমরা এমন সম্পর্ক বুঝি যেখানে স্বার্থের সংঘাত আছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থের ঐক্যও আছে। এমন যদি হয় যে স্বার্থের ঐক্য আছে কিন্তু সংঘাত নেই, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রেই দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ যদি অভিন্ন হয় তবে সেই সম্পর্ককে সহযোগিতার সম্পর্ক বলা যায়।

মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমরা এই তিন ধরণের অবস্থা দেখতে পাই। মানুষ যখন পাহাড় পর্বতের গুহায় বাস করত তখন সে অপরিচিত সব লোককেই শত্রু মনে করে নিত, এবং তার সাথে সহযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠত না। স্বার্থের সংঘাতই ছিল সেখানে একমাত্র সত্য, এবং সে সম্পর্ক ছিল বিরোধের সম্পর্ক। মা ও শিশুর সাথে যে সম্পর্ক তাতে স্বার্থের ঐক্য আছে, সংঘাত নেই, অর্থাৎ পূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক। আধুনিক যুগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে স্বার্থের সংহতি এবং স্বার্থের ঐক্য দুই-ই বর্তমান থাকে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থের ঐক্য ও স্বার্থের সংঘাত দুইই উপস্থিত থাকে। প্রতিযোগিতার সম্পর্কই আজ সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত বেশী থাকে এবং সে দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থের ঐক্য এত বেশী দেখা যায় যে তাদের মধ্যে যে সংহতি আছে তা আমরা অনেক সময়

ভুলেই যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের ভূমিকাই আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠে, কিন্তু এই সংঘাতের পিছনেও এই দুই রাষ্ট্রের স্বার্থের ঐক্য বর্তমান। এই সংঘাত যদি পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হয় তবে উভয়ের ধ্বংসই অনিবার্য—এখানেই হল স্বার্থের ঐক্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে স্বার্থের ঐকটাই ছিল প্রধান। কিন্তু সেই ঐক্য থাকা সত্ত্বেও স্বার্থের সংঘাতও বর্তমান ছিল, এবং সেই সংঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত চীন ও যুগোস্লাভিয়ার সাথে সোভিয়েতের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশেও সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব জোরদার হয়ে উঠে। সেই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার বন্ধুদেশগুলির স্বার্থের ঐক্য প্রথম দিকে খুব বেশী করে দেখা গেলেও সাথে সাথে সেখানে স্বার্থের সংঘাতও বর্তমান ছিল, এবং পরে তা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে উঠে। বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থের ঐক্য ও স্বার্থের সংঘাত সাধারণতঃ সব সময়ই বর্তমান থাকে, এবং তার প্রকাশ নির্ভর করে একটি বিশেষ সময়ের বিশ্বপরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শক্তি-সামর্থ্যের উপর। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতই প্রধান, কিন্তু স্বার্থের ঐক্য একেবারে অনুপস্থিত নয়। ভারত বা পাকিস্তান কেউ অপর পক্ষকে একেবারে ধ্বংস করার কথা চিন্তা করে না। দেশের শাসকবর্গের ইচ্ছা যাই হোক না কেন, বিশ্বপরিস্থিতি ও দেশের শক্তিসামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করতে হয়। আরব-ইসরাইল সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিরোধ বা সংঘাতই প্রধান। আরব রাষ্ট্রজোট প্রথম দিকে ইসরাইলের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, কিন্তু ধীরে ধীরে বিশ্বপরিস্থিতি এবং নিজেদের শক্তিসামর্থ্য চিন্তা করে ইসরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে একটা আপোষ মীমাংসার দিকেই আরব রাষ্ট্র সমূহ অগ্রসর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা বড় নৈতিক সমস্যা হল কি ভাবে বিভিন্ন দেশের স্বার্থের বিরোধ হ্রাস করে স্বার্থের ঐক্যকে প্রাধান্য দেওয়া যায়, এবং বৃহত্তর ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রীয় বিরোধ দূর করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে জাতিসংঘের কার্যাবলী শেষ হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপরও মানুষের বিশ্বাস কমে আসে। ঠাণ্ডা লড়াই এবং পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা মানুষকে অন্য ভাবে চিন্তা করতে প্ররোচিত করে। এই চিন্তাকে যুদ্ধের ভয় বা পাল্টা আক্রমণের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধকে পরিহার করার নীতি বলা যায় (deterrence), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক শেলিং (Thomas C. Schelling) তাঁর *The Strategy of Conflict* বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক এবং পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা চিন্তা করেই তিনি এই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধকেই যদি একমাত্র সত্য মনে করে এবং তার ফলে এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করে তবে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দুই পক্ষই যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সেখানে কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পরাজিত করে জয়লাভ করতে পারে না। অতএব পারমাণবিক যুদ্ধ পরিহার করা উভয় পক্ষের স্বার্থেরই অনুকূল। এখানে তাদের স্বার্থের ঐক্য পারমাণবিক যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে উভয় পক্ষই অপরকে সংযত রাখতে পারে, এবং এই নীতি অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রও তারা আবিষ্কার করতে পারে। অধ্যাপক শেলিং (Schelling) মনে করেন যে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বিরোধের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সংঘাত সত্ত্বেও স্বার্থের ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেই ঐক্যসূত্রের ভিত্তিতে বিরোধকে সীমিত রাখা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা সম্ভব। আবেগ উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি যুক্তিপূর্ণ ভাবে প্রকৃত জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে এবং বাস্তব অবস্থাকে কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার না করে অপর পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তবে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা সম্ভব বলে অনেকের ধারণা। তা ছাড়া আর এক দল মনে করেন যে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে—যে সব বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সংঘাত নেই—আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করতে পারলে পরে অন্যান্য বৃহত্তর এবং বিতর্কিত বিষয়েও সেই সহযোগিতার মনোভাব বিস্তার লাভ করতে পারে। বিশ্ব ডাক সংগঠন (Universal Postal Union), খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (Food and Agri-cultural Organization), বিশ্ব-আবহাওয়া সংগঠন (World Meteor-

ological Organization), এ ধরণের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাগুলির কাজে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা সহজেই পাওয়া যায়। এ ধরণের সহযোগিতার পরিধি যদি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা যায় তবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সহযোগিতার পথও সুগম হতে পারে বলে অনেকে আশা করেন। তাঁরা মনে করেন যে দুইটি দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক খারাপ থাকলেও ব্যবসায় বাণিজ্য বা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যা রাজনৈতিক বিরোধ সমাধানের এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের সহায়ক হবে।

4. রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইহার ভূমিকা

রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology কথাটির সাথে আমরা আজকাল খুবই পরিচিত। বর্তমান যুগের ঠাণ্ডা লড়াইকে অনেকে রাজনৈতিক মতবাদের লড়াই রূপে বর্ণনা করে থাকেন। মার্কস্‌বাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ, গান্ধীবাদ, মুজিববাদ—এই ধরণের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের কথা আজকাল শোনা যায়। জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র, শান্তি, আধুনিকীকরণ (modernization) ইত্যাদি ধারণাকেও অনেকে রাজনৈতিক মতবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম, খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্মীয় চিন্তাধারার সাথেও বর্তমান কালের রাজনৈতিক মতবাদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে ideology কথাটি আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে প্রচলিত হয়ে আছে। অনেকে মনে করেন যে ট্রেসি—Destutt de Tracy (1754-1836)—প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। আবার অনেকের ধারণা যে জেরেমি বেন্‌থাম (Jeremy Bentham)-এর লেখাতেই ideology কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সে যাই হোক ফরাসী বিপ্লবের যুগ থেকেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে মতবাদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষ এই বিষয়ে বিশেষ রূপে সচেতন ছিল না। আধুনিক যুগে ideology-র উপর যে ভাবে জোর দেওয়া হয় পূর্বে সেই রকম ছিল না। এই বিষয়ে অনেকে গবেষণামূলক অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার মধ্যে কার্ল মেনহেইম (Karl Mannheium)-এর *Ideology and Utopia* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Ideology বলতে কি বুঝা যায়? অনেকে নানা ভাবে ideology-র ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[1] সাধারণতঃ ideology বা মতবাদের তিনটি

---

1. Richard C. Snyder এবং H. Hubert Wilson তাঁদের *Root of Political Behaviour* বইতে লিখেছেন : "An ideology is a cluster of ideas about life, society or government, which originate in most cases as consciously advocated or dogmatically asserted social, political or religious slogans or battle-cries and which through continuous usage and preachment gradually become the characteristic beliefs or dogmas of a particular group, party or nationality."

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : (1) আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে এক স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা ; (2) সেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পথ হিসাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তা বা থিওরী ; এবং (3) সেই সব চিন্তা বা থিওরী অনুযায়ী সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে মানুষকে আদর্শ সমাজ স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। মানুষকে সংঘবদ্ধ ভাবে রাজনৈতিক কার্যে উদ্বুদ্ধ করাই ইতিহাসে ideology-র প্রধান ভূমিকা। রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology-র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে এবং এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে রাজনৈতিক মতবাদের সাথে ধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ধর্ম প্রচারের জন্য মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে, অনেক সময় ধর্মের নামে যুদ্ধ করে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনও সম্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক মতবাদ মানুষকে রাজনৈতিক কার্যে যে ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে তা অন্য কোন ভাবে সম্ভব হয় না। অর্থনীতি বা পরিবেশ দ্বারা মানুষের কার্য অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হতে পারে কিন্তু ideology বা মতবাদ তাকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করে অন্য কোন কিছুই তাকে সে ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। আধুনিক যুগের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসে এই ideology বা মতবাদের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট। ফরাসী বিপ্লব বা রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের অনেক কারণ আছে কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদ মানুষকে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য যে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তার গুরুত্ব অনেকখানি।

একটি রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা জাতির বাস এবং নানা ভাষা প্রচলিত। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের আদর্শ এই সমস্ত গোষ্ঠিকে একত্র রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছে। আদর্শগত ঐক্য যদি না থাকে তবে একটি রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখা খুব কঠিন। ইসলামের আদর্শ দ্বারা পাকিস্তান তার দুই খণ্ডের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাঙ্গালীদের যখন পাকিস্তানের তথাকথিত ইসলামিক রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখন আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যে দেশ রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে বিভক্ত সেই দেশে বিদেশী প্রোপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্র বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক যখন ফ্রান্স আক্রান্ত হয় তখন নাৎসী সমর্থক ফ্রান্সের অনেক অধিবাসী দেশের

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টা না করে জার্মানীকেই গ্রহণ করে নেয়। নাগরিকদের মধ্যে মতবাদের ঐক্য না থাকলেও জাতীয় ঐতিহ্য ও শাসনতন্ত্রের প্রতি যদি আনুগত্য থাকে তবে দেশের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল ও লেবার পার্টির মধ্যে পার্থক্য অনেক কিন্তু উভয় দলই ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র এবং জাতীয় ঐতিহ্যের (National Ethos) প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ায় সেখানে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। দেশের শাসনতন্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগকেই এক ধরণের রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology বলা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে দেশের শাসনতন্ত্র ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও কোন ঐক্য নেই সেই দেশে রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এই পটভূমিতেই স্পেনে 1937-38 খৃষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology-র সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। সাধারণতঃ একই মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম প্রধান অনেক দেশ ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন। ইসলামের প্রতি আনুগত্য এবং ইহুদী ধর্মের বিরোধিতা আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের একটি প্রধান ভিত্তি। রাজনৈতিক মতবাদের ঐক্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। বর্তমান যুগের জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যেও এই কারণে কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব দেখা যায় (জোটনিরপেক্ষতাকেও মোটামুটি ভাবে এক ধরণের ideology বলে বর্ণনা করা যেতে পারে)। রাজনৈতিক মতবাদের ঐক্য যেমন বন্ধুত্বের পথকে সুগম করে রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধ তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে তুলতে পারে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাথে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধ অনেকাংশে রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধেরই ফলশ্রুতি। উভয় পক্ষই প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে যে ভাবে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাতেই ঠাণ্ডা লড়াইতে মতাদর্শের সক্রিয় ভূমিকা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতীত যুগে ইসলাম ও খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ এবং প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের জন্যও এই মতবাদের পার্থক্য অংশতঃ দায়ী ছিল। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে যে যুদ্ধের সূচনা করে তাতে রাজনৈতিক মতবাদের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology-র ভূমিকা থাকলেও তার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া উচিত নয়! কোন দেশের সরকার একমাত্র অথবা প্রধানতঃ রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশকেই—তার রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন—রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে (এক কথায় জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করতে হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্য ইত্যাদি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology দ্বারা কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি দেশকে এমন নীতিও অবলম্বন করতে হয় যা রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology দ্বারা কখনও সমর্থন করা যায় না। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পুঁজিবাদী দেশ ফ্রান্সের সাথে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করে। পরে সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসী জার্মানীর সাথেও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। এই ধরণের চুক্তি ও বন্ধুত্ব রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয়ই মার্কসবাদ-লেলিনবাদে বিশ্বাসী কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্তমানে প্রায় অহি-নকুলের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট চীনের রাজনৈতিক মতবাদ পরস্পর বিরোধী হ'লেও বর্তমানে এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের অনেক উন্নতি ঘটেছে। তেমনি ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেও মার্কিন সরকারের সম্পর্ক আজ অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণ। কম্যুনিষ্ট চীন আজ ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যতম বন্ধু। তাই রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মতবাদ অভিন্ন হলেও বন্ধুত্ব হয় না, পরস্পরবিরোধী হলেও বন্ধুত্ব হতে পারে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, এবং এই কথা বলা যেতে পারে যে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ যদি অভিন্ন হয় তবে সেই বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে পারে এবং রাজনৈতিক মতবাদ পরস্পরবিরোধী হ'লে বন্ধুত্ব ততখানি গভীর না হওয়ারই সম্ভাবনা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology-র আড়ালে নিজের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে

থাকে। White Man's Burden এর মুখোশ পরে বৃটেন এদেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম দিকে বিভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তার সমর্থনে 'Manifest Destiny' নামে এক মতবাদ সৃষ্টি করে তোলে। জার শাসিত রাশিয়া স্লাভ জাতির ঐক্যের নামে (Pau Slavism) বল্কান অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। আসলে উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে রাজনৈতিক মতবাদের নামে অনেক রাষ্ট্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে থাকে।[1] Morgenthau এই মতের বিশেষ সমর্থক। তিনি বলেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক মতবাদকে ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করে থাকে। যে সব রাষ্ট্র স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট তারা শান্তির আদর্শ, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি (Ideologies of Status Quo) প্রচার করে; কারণ শান্তি ও আইন সব সময়ই স্থিতাবস্থার সমর্থক। যে সব রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন কামনা করে তারা ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, এই ধরণের আদর্শ মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে থাকে। এই সব আদর্শ স্থিতাবস্থাকে পরিবর্তন করার রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করে (Morgenthau-র ভাষায় Ideologies of Imperialism)। এমন অনেক মতবাদ আছে, যেমন গণতন্ত্র, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ, যা বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমান যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি সকল দেশই গণতন্ত্র, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ ইত্যাদির কথা বলে এবং নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে থাকে। Morgenthau এই সব মতবাদকে Ambiguous Ideologies বলে অভিহিত করেছেন। আসলে কোন রাষ্ট্র যখন এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের নেতৃত্ব দেয় তখন সেই রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকেই তার রাজনৈতিক মতবাদের স্বার্থ বলে ধরে নেওয়া হয়। পৃথিবীর সমস্ত কমুনিষ্টরা (চীন-সোভিয়েত বিরোধের পূর্বে) সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থকেই কম্যুনিজমের স্বার্থ বলে মনে করত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন বিপদ বা ক্ষতিকে সমস্ত কমুনিষ্ট আন্দোলনের বিপদ ও ক্ষতি বলেই মনে করা

1. Morgenthau তাঁর *Politics Among Nations* বইতে লিখেছেন: "The true nature of the policy is concealed by ideological justifications and generalizations."

হত। অর্থাৎ সোভিয়েতের জাতীয় স্বার্থ ও কম্যুনিজমের স্বার্থকে অভিন্ন রূপেই দেখা হ'ত। জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতিকে বিভিন্ন ধরণের উচ্চ আদর্শের নামে প্রচার করা বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে রাজনৈতিক মতবাদ বা ideology-র প্রভাব কিছুটা কমে এসেছে। অনেক exhaustion of ideology, erosion of ideology—ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করছেন।[1] বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছে তা বাস্তবায়িত করা অসম্ভব বলেই অনেকের ধারণা। আজকাল অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষ মতবাদের দৃষ্টিতে বিচার না করে সমাজতাত্ত্বিক (sociological) ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন। অনেকে মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদের কার্যকারণ কোন সম্পর্ক নেই। আন্তর্জাতিক সমস্যাকেও মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে জাতীয় স্বার্থের পটভূমিতেই বিচার করা সঙ্গত বলে অনেকের ধারণা। এই non-ideological চিন্তাধারা অবশ্য সমস্ত দেশে এখনও স্বীকৃতি লাভ করে নি। তবে চীন-সোভিয়েত বিরোধ, মার্কিন-চীন বন্ধুত্ব ইত্যাদি ঘটনা এই চিন্তা-ধারাকেই সমর্থন করেছে বলে মনে হয়।

---

1. Daniel Bell এর *The End of Ideology* বই দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় শক্তি

1. জাতীয় শক্তির অর্থ।
2. জাতীয় শক্তির উপাদান।
3. জাতীয় শক্তির মুল্যায়ন।

1. জাতীয় শক্তির অর্থ

শক্তি অথবা Power আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কথা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেকাংশে এই ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। শক্তি ভিন্ন কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার অনেক সময়ই ঘটে থাকে কিন্তু তার জন্য কোন রাষ্ট্রকে শক্তি অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল শক্তি অর্জনের অধিকার। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যও শক্তির প্রয়োজন—সেখানেই হ'ল জাতীয় শক্তির নৈতিক ভিত্তি। যদিও জাতীয় শক্তি রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র, তবুও রাষ্ট্রের সাথে শক্তি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থেকে শক্তিকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। অনেক সময় আমরা রাষ্ট্রকেই Power বা শক্তি বলে বর্ণনা করে থাকি (যেমন Great Power বা বৃহৎ শক্তি ইত্যাদি)। নিজের স্বার্থ ও নীতি অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাকেই আমরা জাতীয় শক্তি বা national power বলতে পারি। জর্জ সোয়ারজেনবার্গার (George Schwarzenberger) তাঁর *Power Politics* বইতে শক্তি বা Powerএর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে শক্তি হ'ল "capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance." কেবল মাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেই যে অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করা যায় তা নয়। অর্থনৈতিক সাহায্য বা চাপ, রাজনৈতিক সমর্থন বা বিরোধিতা ইত্যাদি নানা ভাবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। সামরিক শক্তিই হয়ত জাতীয় শক্তির মূল এবং শেষ ভিত্তি কিন্তু সামরিক ক্ষমতাই জাতীয় শক্তির একমাত্র প্রকাশ নয়। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক ক্ষমতার মূল্য সামরিক ক্ষমতার চেয়ে কম নয়। প্রচার কার্য বা প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে অন্য দেশের জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও জাতীয় শক্তির অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের ঠাণ্ডা লড়াই-তে

এই প্রচার কার্যের গুরুত্ব খুবই বেশী। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সামরিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রোপাগাণ্ডার ক্ষমতা ইত্যাদি সবই এক জাতীয় শক্তির প্রকাশ। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাবে সামরিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি না থাকে তবে কোন রাষ্ট্র প্রোপাগাণ্ডার ক্ষমতাও অর্জন করতে পারে না। তাই E. H. Carr তাঁর *The Twenty Years' Crisis* বইতে বলেছেন যে "in its essence, power is an indivisible whole." তবে আলোচনার সুবিধার জন্য Carr জাতীয় শক্তিকে সামরিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রোপাগাণ্ডার ক্ষমতা, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

2. জাতীয় শক্তির উপাদান

একটি রাষ্ট্রের শক্তি বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান উপাদান হ'ল :

(1) ভৌগোলিক অবস্থা (Geography)

(2) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources)

(3) শিল্পের উন্নতি (Industrial Development)

(4) সামরিক প্রস্তুতি (Military Preparedness)

(5) লোকসংখ্যা (Population)

(6) জাতীয় চরিত্র ও মনোবল (National Character and National Morale)

(7) জাতীয় নেতৃত্ব—সরকারের দক্ষতা ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য (National Leadership : Quality of Government and Quality of Diplomacy)

(8) আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ভাবমূর্তি (International Prestige and Image)

(9) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (International Strategic Environment)

এই বিভিন্ন উপাদানগুলি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হ'ল।

ভৌগোলিক অবস্থা

একটি দেশের শক্তি তার ভৌগোলিক অবস্থান (location)-এর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইংলিশ প্রণালী দ্বারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইংলণ্ডের জাতীয় শক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে এই প্রণালী অতিক্রম করে ইংলণ্ডকে আক্রমণ করা খুবই কষ্টকর। অতএব ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থা তার জাতীয় শক্তির একটি প্রধান উপাদান। সেইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও এশিয়া থেকে বিশাল সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকায় ইউরোপ বা এশিয়া থেকে কোন শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি আক্রমণ করতে পারে নি। আধুনিক

পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে ভৌগোলিক নিরাপত্তার মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তবু ভৌগোলিক অবস্থানকে জাতীয় শক্তির একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে আজও স্বীকৃতি দিতে হবে। পারমাণবিক যুদ্ধ সম্ভব হ'লেও আধুনিক যুগের সমস্ত যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে, এমন নহে। বর্তমানেও প্রাক-আণবিক যুগের যুদ্ধই বেশী প্রচলিত। তাই ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বকে আজও অস্বীকার করা যায় না।

ইতালী আল্পস্ পাহাড় দ্বারা ইউরোপ হ'তে অনেকটা বিচ্ছিন্ন কিন্তু তার ফলে ইতালীর জাতীয় শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি। আল্পস্ পাহাড়ের উপত্যকা সমূহ দক্ষিণ দিকে ঢালু থাকায় মধ্য ইউরোপ থেকে ইতালীকে আক্রমণ করা সহজ, কিন্তু ইতালী থেকে মধ্য ইউরোপের কোন দেশকে আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই উত্তর দিক হ'তে ইতালী অনেক বার আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু ইতালীর পক্ষে উত্তর দিকে অভিযান প্রেরণ করা বিশেষ সম্ভব হয় নি। অতএব ইতালীর ভৌগোলিক অবস্থান তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক না হয়ে তার নিরাপত্তার সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলেছে। পাহাড় পর্বত একটি দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে যেমন রক্ষা করতে পারে তেমনি আবার বাইরের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির প্রগতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেও রাখতে পারে। পীরেনিজ পাহাড় সেইভাবে স্পেনকে পশ্চিম ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখে। তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থানও সেই দেশকে বহির্জগতের সমস্ত পরিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই ইংলণ্ডের পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য স্থাপন করা এবং নৌশক্তিতে বলীয়ান হওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই একই কারণে জাপান ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং জাহাজ নির্মাণ কারখানায় এত উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। নেপাল বা আফগানিস্তানের মত স্থলবেষ্টিত (land locket) দেশের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করা খুব কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানই তাকে মনরো নীতির (Monroe Doctrine) মাধ্যমে ইউরোপের রাজনীতির প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে সাহায্য করেছে। আবার এই ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরবর্তীকালে আটলান্টিকের অপর প্রান্তে পশ্চিম ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি

দেশের রাজনীতিতে জড়িত করে। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান সেই দেশকে প্রথমে বাল্টিক ও পরে কৃষ্ণ সাগরের দিকে এবং শেষে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহারের উপযোগী কোন সামুদ্রিক বন্দর না থাকায় রাশিয়া এই সব সমুদ্র উপকূলে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ইউরোপের সমুদ্র উপকূলে অনেক বন্দর সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু আফ্রিকার উপকূল এতই খাড়া যে সেখানে বন্দর স্থাপন করা খুবই কঠিন। জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বেলজিয়াম কয়েকবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে বাধ্য হয়। পোল্যাণ্ডের ইতিহাস তার ভৌগোলিক অবস্থা (জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পোল্যাণ্ড অবস্থিত) দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এডেন, সিঙ্গাপুর, জিব্রল্টার, সুয়েজ খাল, দার্দানেলিজ, মাদাগাস্কার, সিংহল, ফরমোজা ইত্যাদি অঞ্চল তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর্যন্ত) তার নিরাপত্তা সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বৈদেশিক নীতি ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। হিমালয় দ্বারা ভারতের উত্তর সীমা সুরক্ষিত। হিমালয় পর্বতের ভেতর দিয়ে বাইরের শত্রুর পক্ষে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা যেমন সুকঠিন তেমনি এই পথে অন্য দেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য স্থাপন করাও দুষ্কর। প্রধানতঃ উত্তর পশ্চিমের খাইবার গিরিপথ দিয়েই অতীতে ভারতবর্ষ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছে এবং এই পথে সীমিত পরিমাণে ব্যবসায় বাণিজ্যও সম্ভব হয়েছে। ভারত-চীন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্ত রাজনৈতিক ও সামরিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তর দিক হ'তে যে সব গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সম্ভব সেইগুলিকে সুরক্ষিত রাখা ভারতের নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে সব দেশের সীমারেখা ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত নয় সেই সব দেশের প্রতিরক্ষা সমস্যা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠে। এই সব কারণেই নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে ভূগোল দ্বারাই একটি দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয় ("The foreign policy of a country is determined by its geography")। কথাটি যে আংশিক ভাবে সত্য সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটি দেশের জাতীয় শক্তি তার ভৌগোলিক আয়তন (size)-এর উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। অবশ্য কেবলমাত্র আয়তন দ্বারা একটি দেশের শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতেই আয়তনের গুরুত্ব বিচার করা প্রয়োজন। আয়তনে বড় হ'লেই একটি দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে না। সাহারা অনেক বড় কিন্তু শক্তিহীন। জাপান আয়তনে ছোট হয়েও রাশিয়ার মত বৃহৎ দেশকে যুদ্ধে (1904-5) পরাজিত করতে সমর্থ হয়। রাশিয়ার বিরাট আয়তন সাইবেরিয়ার পূর্ব প্রান্তে সৈন্য, রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে অসুবিধাই সৃষ্টি করছে। কিন্তু 1812 খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের আক্রমণ এবং পরে হিটলারের আক্রমণ প্রতিহত করতে ভৌগোলিক আয়তন রাশিয়াকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। আয়তনে বিরাট বলে রুশ বাহিনীর পক্ষে অনেক দিন পর্যন্ত পশ্চাদাপসরণ করা সম্ভব হয়, এবং সেই সময় পাল্টা আক্রমণের জন্য রাশিয়া নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার সময় পায়। শত্রুর পক্ষে রাশিয়ার মত বিরাট দেশে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং অধিকৃত অঞ্চলকে শাসনাধীনে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের বিশাল আয়তনও এই ভাবে চীনকে বিশেষ সাহায্য করে। ক্ষুদ্র দেশকে জাপান যে ভাবে সহজেই জয় করে নেয়, চীনকে সেইভাবে জয় করতে পারে না। আয়তনে বড় দেশকে জয় করা কঠিন ব'লে সহজে কোন রাষ্ট্র এই ধরণের দেশকে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না। বৃহদায়তন অনেক সময় দুর্বলতার কারণও হ'তে পারে। বৃহৎ রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং কার্যকরী প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করা কঠিন হয়।

একটি দেশের জলবায়ুর (climate) উপরও সেই দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। খুব গরম বা খুব শীত কোনটাই জাতীয় শক্তির অনুকূল নয়। অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিও সেই ভাবে দেশের উন্নতিকে ব্যাহত করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই জাতীয় শক্তি ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি পরিমাণে নির্ধারিত হয়? (Geopolitics)

একটি দেশের বৈদেশিক নীতি তার ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা অনেক

পরিমাণে নির্ধারিত হয়, সেই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভূগোল ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তা রাজনৈতিক ভূগোল বা Political Geography বলে পরিচিত। এই Political Geography থেকে লব্ধ জ্ঞানকে যখন বাস্তব রাজনীতিতে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে সাধারণত: Geopolitics বলা হয়ে থাকে। Geopolitics এর কোন কোন প্রবক্তা এই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন যে একমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই একটি দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। নাৎসী জার্মানীতে কার্ল হাওশোফার (General Karl Haushofer)-এর নেতৃত্বে Geopolitics এক চরম রূপ ধারণ করে। সেখানে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা একটি দেশের বৈদেশিক নীতিকে কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে জার্মানীর বৈদেশিক নীতিকে বিশেষ পথে পরিচালনা করার চেষ্টাও আরম্ভ হয়। হাওশোফার (1869-1946) নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতিকে তাঁর geopolitics এর মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে আরম্ভ করেন।

জার্মানীতে geopolitics সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় তা প্রধানত: তিনটি মূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত :

(1) রাষ্ট্র একটি জৈব প্রতিষ্ঠান (organic state)—অন্যান্য জীবজন্তুর মত রাষ্ট্রেরও জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু আছে।

(2) রাষ্ট্র কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে চিরদিন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না—তার উন্নতি এবং বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন ভূখণ্ড প্রয়োজন। এই ধারণাই নাৎসী জার্মানীর Lebensraum নীতির ভিত্তি।[1]

(3) রাষ্ট্রের সীমারেখা কখনও অপরিবর্তনীয় হতে পারে না—তার পরিধি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে সীমারেখাও পরিবর্তন হতে বাধ্য (organic frontier)। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় ধারণারই অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ মাত্র।

যে সকল মানুষের চিন্তাধারার ফলে জার্মানীতে geopolitics সম্বন্ধে এই সব ধারণা সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে Friedrich Ratzel (1844-1904)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে মিউনিকের Politechnic Institute এবং পরে লিপজিগ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক ছিলেন। জার্মানীতে geopolitics সম্বন্ধে যে মতবাদ গড়ে উঠে তার যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের

1. অনেকে মনে করেন যে নতুন ভূখণ্ড নিলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সেই রাজনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই হ'ল Geopolitics।

কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার সব কয়টিই Ratzel তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই অধ্যাপকের মতবাদ দ্বারা কার্ল হাওশোফার বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। Ratzel কার্ল হাওশোফারের পিতা মাক্স হাওশোফার (Max Haushofer)-এর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইসার (Isar) নদীর তীরে তাঁরা দুই জন প্রায়ই একত্রে বেড়াতেন এবং কার্ল হাওশোফার তখন তাঁদের সাথে থেকে তাঁদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনে যেতেন। Ratzelএর চিন্তাধারার ভিত্তিতেই কার্ল হাওশোফারের মতবাদ গড়ে উঠে তবে হাওশোফার জার্মান বৈদেশিক নীতির সাথে যে রকম ভাবে যুক্ত ছিলেন Ratzelএর সেই রকম কোন যোগাযোগ ছিল না। জার্মান বৈদেশিক নীতির সাথে Ratzelএর মতবাদের কোন নিবিড় সম্পর্ক কখনও স্থাপিত হয় নি।

Ratzel রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে যে সব নীতি বা নিয়মের কথা ('The Laws of thc Territorial Growth of States') উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতেই নাৎসী জার্মানীর Lebensraum মতবাদ গড়ে উঠে। কার্ল হাওশোফার এবং হিটলার উভয়ই এই সব নীতিগুলি স্বীকার করে নেন। তার পূর্বেও জার্মানীতে এই ধরণের মতবাদ অনেকে প্রচার করেছেন। লিষ্ট (Friedrich List) মনে করতেন যে জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উত্তর মহাসাগর থেকে আরম্ভ করে বাল্টিক সাগর হয়ে কৃষ্ণ সাগর ও আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন[1]। পরে Von Treitschke আধুনিক অর্থে Lebensraum কথাটি ব্যবহার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নাওমেন (Friedrich Naumann) ইউরোপের বিরাট ভূখণ্ডে জার্মানীর প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন (idea of Mittel-Europa) দেখেন এবং তা প্রচার করেন। এই সমস্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই নাৎসী জার্মানীর Lebensraum মতবাদটি বিচার করা উচিত। এই মতবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে geopolitics এর অবদান সবচেয়ে বেশী।

1. 1818 খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে যে Zollverein বা অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপিত হয় তাতে Friedrich List এর নেতৃত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মানী তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সব রাষ্ট্র রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন থেকেও অবাধ বাণিজ্যের ভিত্তিতে নিজেদের ভিতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপন করে Zollverein সৃষ্টি করে। এই অর্থনৈতিক সহযোগিতা জার্মানীকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

Geopolitics সম্বন্ধে Ratzel এর মতবাদ পরে Rudolf Kjellen (1864-1922) নামক সুইডেনের একজন অধ্যাপক বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বিশ্বরাজনীতিতে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। 1916 খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলম থেকে প্রকাশিত *State As a Form of Life* নামক তাঁর বিখ্যাত বইতে তিনিই প্রথম geopolitics শব্দটি ব্যবহার করেন। এই পুস্তকে তিনি বলেন যে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের সমবায়ে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যক্তি মানুষের মত রাষ্ট্রও জীবন্ত। তাঁর মতে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষমতা বা power এবং এই ক্ষমতাই আইনের ভিত্তি। প্রত্যেক রাষ্ট্রই ক্ষমতার জোরে নিজের ভূখণ্ডের সীমা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। তিনি প্রচার করেন যে ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবী কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে জার্মানী হবে একটি অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। জার্মানীতে geopolitics সম্বন্ধে যে মতবাদ সৃষ্টি হয় তাতে Kjellen এর অবদান অনস্বীকার্য।

Geopolitics এর আলোচনায় স্যার ম্যাকিণ্ডার (Sir Halford Mackinder)এর নাম উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ভূগোল শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সর্বজন-স্বীকৃত। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক ছিলেন এবং London School of Economics এর প্রধান পরিচালক (Director) এবং Royal Geographical Societyর সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ম্যাকিণ্ডারের মতবাদ দ্বারা জার্মানীর কার্ল হাওশোফার বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন যদিও হাওশোফার Geopolitics কে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন তাতে ম্যাকিণ্ডারের কোন সমর্থন ছিল না। তবুও কার্ল হাওশোফার ম্যাকিণ্ডারকে 'the most brilliant English geopolitician' রূপে অভিহিত করেন। 1904 খৃষ্টাব্দে Royal Geographical Societyতে ম্যাকিণ্ডারের লেখা 'The Geographical Pivot of History' নামে একটি প্রবন্ধ নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতেই প্রথম তাঁর মতবাদের পরিচয় যায়। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মাত্র স্থল এবং তিন-চতুর্থাংশই জল। সেই প্রবন্ধে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট স্থলভূমিকে তিনি World Island বলে অভিহিত করেন এবং এই World Island এর কেন্দ্রভূমিকে তিনি Pivot Area বলে বর্ণনা করেন। এই Pivot Area বলতে কোন্ স্থানকে বুঝায় সেই সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট না

হলেও মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া (ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশের), পশ্চিম চীন, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও ইরান (বেলুচিস্তান ও ইরানের সমুদ্র উপকূল খণ্ড বাদ দিয়ে), এই ভূখণ্ডকেই তিনি Pivot Area বলে বর্ণনা করেছেন। Pivɔt Area বাদ দিয়ে বাকী পৃথিবীকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। Pivot Area-র সাথে সংযুক্ত যে সব অঞ্চল আছে, যেমন চীন, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, এই ভূখণ্ডকে তিনি Inner বা Marginal Crescent নামে অভিহিত করেন। Pivot Area থেকে এইসব অঞ্চল স্থলবাহিনী দিয়ে অধিকার করে নেওয়া সহজ। গ্রেটবৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ নিয়ে যে অঞ্চল থাকে তাকে ম্যাকিণ্ডার Outer অথবা Insular Crescent বলে বর্ণনা করেন। 1919 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রধান বই *Democratic Ideals and Reality* তে তিনি Pivot-র পরিবর্তে Heartland কথাটি ব্যবহার করেন। এই পুস্তকে তিনি স্থলশক্তি (land power)-র সাথে সমুদ্র শক্তি (sea power)-র সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শেষ পর্যন্ত স্থলশক্তির জয়লাভই সুনিশ্চিত। যে ভূখণ্ডকে তিনি Heartland বলে বর্ণনা করেছেন সেই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে এত বেশী সমৃদ্ধ যে সেই ভূখণ্ডে যদি কোন বিশেষ রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এই ভূখণ্ডকে তিনি "the greatest natural fortress on earth" বলে বর্ণনা করেছেন এবং নৌশক্তির আক্রমণ থেকে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত। ম্যাকিণ্ডারের ভয় ছিল যে পূর্ব ইউরোপ থেকে কোন শক্তি প্রথমে সমস্ত Heartland জয় করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাই তিনি লিখেছেন :

"Who rules East Europe,
commands the Heartland :
Who rules the Heartland
commands the World-Island :
Who rules the World-Island
commands the World."

তিনি মনে করতেন যে ভবিষ্যতে কোন সময় জার্মানী ও রাশিয়া যদি একত্র হয়

তবে সমস্ত পৃথিবীকে তারা হয়ত জয় করে নিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাইতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যখন শান্তি সম্মেলনে মিলিত হন তখনই ম্যাকিণ্ডার তাঁর *Democratic Ideals and Reality* বই প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে জার্মানী ও রাশিয়াকে একত্র হওয়ার কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়—এই দুই দেশের মধ্যস্থলে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

বহু বৎসর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পত্রিকা *Foreign Affairs* ম্যাকিণ্ডারকে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা এবং রণনীতির পরিপ্রেক্ষিতে Heartland সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব ধারণা বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করে। তার ফলে উক্ত পত্রিকায় 1943 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে The Round World and the Winning of the Peace নামে ম্যাকিণ্ডারের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[1] এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডকেই মোটামুটি ভাবে Heartland বলা যেতে পারে তবে সাইবেরিয়ার লেনা (Lena) নদীর পূর্ব অঞ্চলকে তিনি Heartland থেকে বাদ দিয়ে দেন। সেই অঞ্চলকে তিনি Lenaland নামে অভিহিত করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে ম্যাকিণ্ডার Heartland সম্বন্ধে তাঁর মূল ধারণার কোন পরিবর্তন করেন নি। তিনি লেখেন যে আধুনিক বিমান যুদ্ধনীতির ফলে এই ধারণার পরিবর্তন করার কোন কারণ নেই। তিনি স্বীকার করেন যে জার্মানীকে পরাজিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি (land power) হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত ভূখণ্ড সবচেয়ে বেশী সুরক্ষিত অঞ্চল।[2] তিনি তখনও বিশ্বাস করতেন যে পূর্ব ইউরোপ ও Heartland এর উপর আধিপত্য স্থাপিত হ'লে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব। সেই অবস্থায়

1. এই প্রবন্ধের কিছু পরিবর্তন করে ম্যাকিণ্ডার পরে *Compass of the World* নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

2. **"All things considerd, the conclusion is unavoidable that if the Soviet Union emerges from this war as conqueror of Germany, she must rank as the greatest land power on the globe. Moreover, she will be the Power in the strategically strongest defensive position."**

তিনি লিখেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার প্রতিহত করতে হলে উত্তর আটলান্টিক দেশগুলির একত্র হয়ে শক্তি সাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর মতে এই পদ্ধতিতেই ভবিষ্যতে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। ম্যাকিণ্ডার বর্তমান যুগের বিমান বাহিনীর ভূমিকা সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিনা সেই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সমস্ত পৃথিবী জয় করা সম্ভব হয় নি, এবং মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কিন বিমান শক্তি ছাড়া অন্ততঃপক্ষে ম্যাকিণ্ডারের World Island জয় করার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন বাধাই ছিল না।

জার্মানী ও রাশিয়া একত্র হয়ে সমস্ত পৃথিবী যাতে অধিকার করতে না পারে সেটাই ছিল ম্যাকিণ্ডারের লক্ষ্য কিন্তু তাঁরই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কার্ল হাওশোফার জার্মানী যাতে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে সেই চেষ্টাই করেন। কার্ল হাওশোফার 1869 খৃষ্টাব্দে মিউনিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং geopolitics এর মতবাদ দ্বারা তিনি নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতিকে পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন। তিনি প্রথমে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মেজর জেনারেল হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (পূর্বেই তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন) রাজনৈতিক ভূগোল এবং সামরিক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হলেও আগামী যুদ্ধে জার্মানী যাতে জয়লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন ভূতপূর্ব জার্মান সেনানায়কের সাথে গোপনে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে গভীর ভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র হেস্ (Rudolf Hess)-এর সাহায্যে তিনি হিটলারের সাথে পরিচিত হন এবং হিটলার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী সাহায্যে মিউনিকে Institute of Geopolitics নামে বিরাট এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। জার্মানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য এই Institute সংগ্রহ করে এবং হাওশোফার হিটলারের একজন নিকট উপদেষ্টায় পরিণত হন।

হাওশোফার এবং তাঁর সহকর্মীরা Geopolitics সম্বন্ধে যে সব ধারণা প্রচার করতে থাকেন তার মূল বক্তব্য এই ভাবে প্রকাশ করা চলে :

(1) সামরিক কারণে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা উচিত।

(2) জার্মান জাতির নেতৃত্বে সমস্ত পৃথিবীতে উন্নততর সভ্যতা স্থাপন করতে হবে। পৃথিবীতে এটাই হল জার্মান জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকা। সেই কারণে জার্মান জাতিকে নতুন নতুন দেশ জয় করে নিজেকে প্রসারিত করতে হবে (Lebensraum)। যে সব দেশ জার্মানীর প্রভুত্ব স্বীকার করে নেবে তারা নতুন জীবন লাভ করবে এবং যে সব রাষ্ট্র জার্মানীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে বাধা দেবে তাদের বিরোধিতা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

(3) জার্মান ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চল এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সব দেশ প্রয়োজন সেই সব দেশে জার্মান শাসন প্রবর্তন করতে হবে। সাময়িক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় এবং জাপান এশিয়াতে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে কিন্তু ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তার করতেই হবে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর উপর জার্মান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(4) ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পরে এশিয়া (ম্যাকিণ্ডারের ভাষায় World Island) জয় করে জার্মানী তার অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে যার ফলে সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করা জার্মানীর পক্ষে কঠিন হবে না। নৌশক্তি শেষ পর্যন্ত স্থলশক্তি দ্বারা পরাজিত হবে।

(5) দেশের সীমারেখার স্থায়ী কোন মূল্য নেই। জার্মানীর স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সেই সীমারেখার পরিবর্তন করতে হবে এবং সেই অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

কার্ল হাওশোফার এবং মিউনিকের তাঁর সহকর্মীরা মনে করতেন যে ফ্রান্স ও ইতালী সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপর সহজেই জার্মান প্রভুত্ব স্থাপন করা সম্ভব। তাঁরা আফ্রিকাতে জার্মান কলোনী স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাপানের চীন আক্রমণ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারেন নি। চীনের ভূখণ্ডের আয়তন এত বেশী যে চীনের পক্ষে পশ্চাদাপসরণ করেও বহু বৎসর ধরে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব। তাঁরা মনে করতেন যে এশিয়াতে বৃটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্য আক্রমণ করাই জাপানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কার্ল হাওশোফার জার্মানী ও জাপানের

মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ভারতবর্ষ, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম জার্মানীর পরিকল্পনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে। হিটলার তাঁর Mein Kampf বইতে পূর্বদিকে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করার সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথাই বলেছেন। 1939 খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাওশোফার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি। হাওশোফার ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করতেন যে বৃটেনের পক্ষে পূর্বের মত তার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও তাঁরা বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল যে জার্মানী প্রথমতঃ জাপানের সহায়তায় Heartland এর (ম্যাকিণ্ডারের ভাষায়) উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করবে এবং পরে নৌশক্তি বৃদ্ধি করে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মোকাবিলা করতে হবে। ইংলণ্ডের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার ফলে হাওশোফার হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ (1941) সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন যে রাশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডকে জয় করা জার্মান সেনাদলের পক্ষে তখন সম্ভব হবে না। হাওশোফার তখন মনে করতেন যে জার্মানীর উচিত প্রথমে জাপান ও রাশিয়ার সহায়তায় ম্যাকিণ্ডারের Heartland-এর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করা। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের বিরোধিতা করায় হিটলার হাওশোফারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং 1944 খৃষ্টাব্দে হাওশোফারকে কারাগারে (concentration camp) নিক্ষেপ করা হয়। যুদ্ধের পর 1945 খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং মিউনিকে ফিরে আসেন। জীবনের আশা আকাঙ্খা তাঁর সব তখন চূর্ণ হয়ে গেছে এবং প্রায় এক বৎসর পর বৃদ্ধ অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

Geopolitics সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আলফ্রেড মাহান্ (Admiral Alfred T. Mahan)-এর মতবাদ উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি দেশের ভূমিকা এবং তার বৈদেশিক নীতি ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। মাহানের ধারণা ছিল যে, যে দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি নৌশক্তি উন্নতির পক্ষে সহায়ক সেই দেশই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের যে সুবিধা

আছে স্থলপথে সেই সুবিধা পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। সামরিক বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নৌশক্তিতে বলীয়ান একটি রাষ্ট্র যে রকম সহজে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে পারে কোন স্থলশক্তির (land power) পক্ষে তা সম্ভব নয়। নৌশক্তির গুরুত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি ইংলণ্ডের কথাই বিস্তৃতভাবে বহুবার উল্লেখ করেছেন। তবে ইংলণ্ড ভবিষ্যতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নৌশক্তিতে পরিণত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই ভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন যে ইউরোপ বা এশিয়া মহাদেশের কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সমুদ্রপথকে নিয়ন্ত্রণ করা কখনও সম্ভব হবে না। যে সব দেশের সীমারেখা অন্য দেশের ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত (যেমন ফ্রান্সের, জার্মানীর বা রাশিয়ার) তারা সেই সীমান্ত রক্ষার জন্য এত বেশী অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয় যে তাদের পক্ষে সমুদ্রে আধিপত্য স্থাপন করার মত নৌশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। স্থলপথে সীমান্ত আক্রান্ত হওয়ার কোন সমস্যা বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের না থাকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উত্তর বা দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার কোন সমস্যা নেই বললেই চলে) তাদের পক্ষে বৃহৎ নৌশক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। এ কথা মনে রাখা উচিত যে বিমান বাহিনী ও পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে মাহান তাঁর এই মতবাদ প্রচার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ যে বৎসর আরম্ভ হয় (অর্থাৎ 1914) সেই বৎসরই মাহান ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী স্থল বাহিনীতে শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়েও নৌশক্তিতে পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিতে (বৃটেনের পরেই) পরিণত হয় এবং সাবমেরিণের সাহায্যে ইংলণ্ডকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মাহানের মতবাদের বিরুদ্ধেই যায় যদিও শেষ পর্যন্ত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রে আধিপত্য স্থাপন করে জার্মানীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়।

মাহান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য যে ভাবে চেষ্টা করেছেন তার মূলকথা হ'ল : (1) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে হবে, (2) সেই মর্যাদা লাভ করতে হ'লে সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করা প্রয়োজন, এবং (3) শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজের নৌবহর সৃষ্টি করেই এই আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মাহানের মতবাদ দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। মার্কিন নৌসেনানায়কেরা

মাহানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই শক্তিশালী নৌবহর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি যে তার নৌবহরের উপরই অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত সেই বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিমান বাহিনী এবং পরবর্তী যুগে পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে মাহানের মতবাদ আজ আর তেমন উপযোগী নয়। সাবমেরিণ এবং বিমান বাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা মাহানের পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ এই নতুন রণনীতি আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি মারা যান।

আলফ্রেড মাহান তাঁর ব্যাখ্যা করে প্রায় 20 খানি পুস্তক রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে *The Influence of Sea Power on History* বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া *The Influence of the Sea Power on the French Revolution and Empire* (দুই খণ্ড), *Sea Power in its relation to the War of 1812* (দুই খণ্ড), *The Interest of American in Sea Power, Present and Future* ইত্যাদি বইও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

Geopolitics-এর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অধ্যাপক স্পাইকম্যান (Nicholas J. Spykman)-এর অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইয়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। একটি দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ভূগোলের প্রভাব তিনি বিশেষ ভাবে স্বীকার করেন, কিন্তু ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা বৈদেশিক নীতির সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। বৈদেশিক নীতিতে ভূগোলের প্রভাবকে তিনি "a conditioning rather than determining factor" বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে ভৌগোলিক পরিবেশ ছাড়া জনসংখ্যা, দেশের অর্থনীতি, সরকারের গঠন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে। তাই স্পাইকম্যান "geographical determinism"-এর মতবাদকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন।

স্পাইকম্যান মনে করতেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার (ম্যাকিণ্ডারের ভাষায় World Island) রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা খুবই বিপদজনক। এই সব মহাদেশের পক্ষে ভবিষ্যতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণ রূপে বেষ্টন (encircle) করে ফেলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ম্যাকিণ্ডার এই তিন মহাদেশের Heartland-কে যে রকম শক্তিশালী ভেবেছেন এবং তার উপর যে ধরণের গুরুত্ব দিয়েছেন স্পাইকম্যান তা স্বীকার

করতে রাজী নন। ম্যাকিণ্ডার যে অঞ্চলকে Inner Crescent নাম দিয়েছেন (অর্থাৎ চীন, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র নিয়ে যে ভূখণ্ড) স্পাইকম্যান মনে করেন যে সেই অঞ্চল তথাকথিত Heartland থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। স্পাইকম্যান এই অঞ্চলকে Inner Crescent নাম না দিয়ে Rimland বলে বর্ণনা করেছেন। Heartland এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী এই Rimland অঞ্চল স্পাইকম্যানের মতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলই স্থলশক্তি (land power) এবং নৌশক্তির (sea power) মধ্যে সংঘর্ষ এড়াইবার মধ্যবর্তী অঞ্চল বা buffer zone. এই Rimland-এর উপর কোন শক্তি যদি তার আধিপত্য বিস্তার করতে পাবে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার নিরাপত্তা ভীষণ ভাবে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ম্যাকিণ্ডারের ফর্মুলা পরিবর্তন করে স্পাইকম্যান তাঁর বিখ্যাত বই *The Geography of the Peace*-এ লিখেছেন: "Who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destinies of the world." স্পাইকম্যানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বই হ'ল *America's Strategy in World Politics.* স্পাইকম্যান মনে করেন যে এই Rimland-এর সম্পূর্ণ অঞ্চল যাতে কোন বৃহৎ শক্তির অধিকারে না আসে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। পৃথিবীতে আমেরিকার কর্তৃক স্থাপন করা স্পাইকম্যানের উদ্দেশ্য ছিল না—শক্তি সাম্য স্থাপন করে শান্তি বজায় রাখাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

Geopolitics-এর মতবাদকে অনেকেই বিজ্ঞানসম্মত মনে করেন না। কোন কোন লেখক এই মতবাদকে pseudo science বলে বর্ণনা করেছেন। ভৌগোলিক পরিবেশকে জাতীয় শক্তির একটি উপাদান রূপে সকলেই স্বীকার করেন। বৈদেশিক নীতির উপর এই পরিবেশের প্রভাবকেও কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু ভৌগোলিক পরিবেশকে জাতীয় শক্তির একমাত্র উপাদান এবং বৈদেশিক নীতির একমাত্র নির্ধারক মনে করার কোনই কারণ নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চল বা ভূখণ্ডের গুরুত্ব অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশী হ'তে পারে। সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু Geopolitics এর নামে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি একটি দেশ যদি অধিকার করতে চেষ্টা করে তবে এই মতবাদ একটি দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির অস্ত্রে পরিণত হয় মাত্র। কার্ল হাওশোফারের

Geopolitics নাৎসী জার্মানীর হাতে সেই ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে Geopolitics-এর মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

একটি দেশের শক্তি তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং অন্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে যে দেশকে বাঁচতে হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সেই দেশের একটি বিশেষ দুর্বলতা থেকে যায়। অন্য দেশ থেকে যাতে খাদ্য আমদানী করা সম্ভব হয় এমন ভাবে সেই দেশ তার বৈদেশিক নীতিকে পরিচালিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল নয়, এমন নীতিও তাকে গ্রহণ করতে হ'তে পারে। খাদ্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ভারতের বৈদেশিক নীতিতে এই দুর্বলতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। খাদ্যে যতই আমরা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছি ততই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের এই দুর্বলতা দূর হ'তে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। গ্রেট বৃটেনকে খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করার পথকে নিরাপদ রাখার জন্য গ্রেট বৃটেনকে সর্বদাই বিশেষ ভাবে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। দুই মহাযুদ্ধেই জার্মানী সাবমেরিন ও বিমান আক্রমণ দ্বারা ইংলণ্ডের বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করার প্রয়াসকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে। ফলে গ্রেট বৃটেন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় জার্মানীর পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর। দুই বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানীর এই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে জার্মানীর যুদ্ধনীতি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। খাদ্যাভাব থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে অধিকার করা জার্মানীর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

খাদ্যের মত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপরও জাতীয় শক্তি বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। যে সব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দেশের শিল্পোন্নতি এবং সামরিক শক্তি নির্ভর করে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত আধুনিক যুগে একটি দেশের সামরিক শক্তি গড়ে উঠতে পারে না এবং

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি দেশের গুরুত্ব অনেকাংশে তার সামরিক শক্তির দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে সৈন্যদের সাহস ও বীরত্ব অনেক মূল্যবান ছিল কিন্তু আধুনিক যুগে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও কলকারখানার মূল্যই অনেক বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয় সম্পদে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর কোন দেশই খনিজ সম্পদে একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এলান বেটম্যান (Alan M. Bateman) গুরুত্বপূর্ণ 27টি খনিজ সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 13টিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 15টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই প্রত্যেক দেশই বিভিন্ন কাঁচামাল অন্য দেশ থেকে আমদানী করতে বাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশ থেকে টিন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, সীসা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। বিদেশের উপর কমবেশী এই নির্ভরতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর জন্য সেই দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, জলপথ বা স্থলপথ যে ভাবেই হো'ক কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনার পথকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন, দেনা পাওনার সমস্যা সমাধান করতে হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হয় ইত্যাদি। এমন অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনৈতিক শক্তি দুই একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানীর উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। সৌদি আরব, ইরাণ, কুওয়েৎ, ইরাক, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি তৈল রপ্তানীর উপরই নির্ভরশীল। মালয় টিনের উপর, বার্মা ও থাইল্যাণ্ড চালের উপর, ইন্দোনেশিয়া রাবারের উপর, বাংলাদেশ পাটের উপর, সিংহল চা-এর উপর, ব্রাজিল কফির উপর নির্ভর করে। এই সব দেশ তাদের জিনিষ সুবিধামত রপ্তানী করার সুযোগ যদি না পায় অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের জিনিষের মূল্য বা চাহিদা যদি হ্রাস পায় তবে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা ধীরে ধীরে কমে আসার ফলে বাংলাদেশ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। Synthetic rubber আবিষ্কারের ফলে ইন্দোনেশিয়ারও সেই ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়। এক সময়ে অর্থ নৈতিক ও সামরিক উন্নতির

জন্য কয়লার গুরুত্ব খুব বেশী ছিল। কয়লার দ্বারাই ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন কলকারখানা চালিত হ'ত। কয়লাই ছিল তখন শক্তি উৎপাদনের প্রধান উপায়' কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শক্তি উৎপাদনেব উৎস হিসেবে তেলের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে তৈলজাত শক্তি দ্বারাই বিভিন্ন ইঞ্জিন, গাড়ী, কলকারখানা, সামরিক সরঞ্জাম পরিচালিত হয়। তার ফলে তেলের মূল্য কয়লার চেয়ে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তৈল সম্পদে যে সব দেশ সমৃদ্ধশালী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। গ্রেট বৃটেন কয়লা ও লোহায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও তৈল সম্পদে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ফলে স্বভাবতঃই বৃটেনের শক্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলি তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশ্ব রাজনীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। আধুনিক যুগে ইউরেনিয়াম (uranium)-এর অর্থ নৈতিক ও সামরিক মূল্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ ইউরেনিয়াম থেকে আণবিক শক্তি সৃষ্টি করা যায়। পূর্বে ইউরেনিয়ামের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না কিন্তু বর্তমানে যে সব দেশ ইউরেনিয়ামের অধিকারী (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা) তাদের গুরুত্ব স্বভাবতঃই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পের উন্নতি

প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ হয়েও একটি দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুর্বল হয়ে থাকতে পারে যদি সেই দেশ শিল্পে উন্নত না হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালকে ব্যবহার করে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট পুঁজি, কারিগরি দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞান। প্রাকৃতিক সম্পদে ও কাঁচামালে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত বিশ্বে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে পারে নি। তার প্রধান কারণ হ'ল কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় শিল্পে অনগ্রসরতা। শিল্পোন্নতির ফলে আশা করা যায় ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিন একটি প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে

পারবে। অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যতীত কোন দেশের পক্ষেই আন্তর্জাতিক জগতে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থ নৈতিক উন্নতির উপরই একটি দেশের সামরিক শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে। এক সময় ইংলণ্ড অর্থ নৈতিক ভাবে সবচেয়ে উন্নতশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হ'ত। তখন বিশ্ব রাজনীতিতে ইংলণ্ডই ছিল প্রকৃত পক্ষে প্রধান বৃহৎ শক্তি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মর্যাদা তার প্রধান ভিত্তি হ'ল তাদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ও উন্নতি।

সামরিক প্রস্তুতি

একটি দেশের শক্তি স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ ভাবে তার সামরিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করার জন্য এই সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আধুনিক সমর সজ্জা ও সমর নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান, সবল নেতৃত্ব এবং কি ধরণের সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা—এই সবের উপরই একটি দেশের সামরিক প্রস্তুতির সাফল্য নির্ভর করে।

সমর নীতি ও সমর বিজ্ঞান সব যুগে এক রকম থাকে না। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের অস্ত্রপাতি এবং কৌশলও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। যে রাষ্ট্র এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না সেই দেশ আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত দেশের কাছে সাধারণতঃ পরাজিত হয়ে থাকে। আধুনিক যুগের প্রথম দিকে ইউরোপ তার উন্নত ধরণের অস্ত্র ও সমর কৌশলের ফলেই প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারত আক্রমণের সময় কামান ব্যবহার করেন। কিন্তু ভারতের রাজারা তখনও কামানের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন খবর রাখতেন না। ফলে তাদের পরাজয় ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাবমেরিণ ব্যবহার করে জার্মানী ইংলণ্ডকে বিপর্যস্ত করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও জার্মানী বিমান যুদ্ধে যে নতুন কৌশল প্রবর্তন করে এবং স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সাথে বিমানবাহিনীর যে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয় তার ফলে প্রথম দিকে মিত্রশক্তি যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। এই নতুন সমর পদ্ধতির জন্যই জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করে প্রথম পর্যায়ে মিত্রশক্তিকে বহুস্থানে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে সব দেশ পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত তারা অন্যান্য দেশের

তুলনায় সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছে। রণপদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও সামরিক নেতৃত্বের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর মতো একজন সমর বিশারদের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে উঠে। কিন্তু নেপোলিয়ানের সাথে যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যদল পরাজিত হয়। কারণ তখন ফ্রান্সের সামরিক নেতৃত্ব প্রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী কুশলী এবং দক্ষ ছিল।

একটি দেশের সামরিক শক্তি তার সেনাবাহিনীর গঠন এবং বিন্যাসের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। কত বড় বাহিনীর প্রয়োজন, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর হার কি হওয়া উচিত, কি পরিমাণে কোন্ অস্ত্র উৎপাদন করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ও বাস্তব ধারণা যদি না থাকে তবে অর্থব্যয়, সামরিক দক্ষতা এবং আধুনিক সমর বিজ্ঞান ও কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সামরিক প্রস্তুতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

লোকসংখ্যা

একটি দেশের জাতীয় শক্তি কিছু পরিমাণে তার লোকসংখ্যার উপরও নির্ভর করে। তবে এই কথা কখনও বলা যায় না যে লোকসংখ্যা যত বেশী হয় জাতীয় শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। তা হ'লে চীন (লোকসংখ্যা প্রায় 66 কোটি 50 লক্ষ) এবং ভারতবর্ষ (লোকসংখ্যা প্রায় 41 কোটি) পৃথিবীর দুইটি প্রধান শক্তিশালী দেশে পরিণত হত। অপেক্ষাকৃত কম লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড এক সময় পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়। তেমনি ভাবে লোকসংখ্যায় বৃহৎ না হয়েও জাপান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছে। লোকসংখ্যায় অনেক বেশী বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ও চীন জাপান কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হয়। তাই দেখা যায় যে লোকসংখ্যার উপর জাতীয় শক্তি প্রত্যক্ষভাবে তেমন বিশেষ নির্ভর করে না। তবে জাতীয় শক্তি বিচার করতে গিয়ে লোকসংখ্যাকে একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (লোকসংখ্যা প্রায় 18 কোটি) বা সোভিয়েত ইউনিয়নের (লোকসংখ্যা প্রায় 21 কোটি) লোকসংখ্যা খুব সামান্য হ'লে তাদের পক্ষে বর্তমানে পৃথিবীর প্রধানতম দুইটি শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ। সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট লোকবল প্রয়োজন। সামরিক প্রয়োজনেই ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানী জনসংখ্যা বৃদ্ধি করায়

নীতি গ্রহণ করে। কেবলমাত্র লোকসংখ্যা নয়, জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উৎপাদন ক্ষমতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় ইত্যাদির উপরই একটি দেশের শক্তি নির্ভর করে। একটি দেশের লোকসংখ্যার অধিকাংশ যদি তরুণ হয় তবে তা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নতির ক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকাই প্রধান। সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার দুইই বেশী এবং তাই দেশের লোকসংখ্যায় তরুণদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। শিল্প বিপ্লবের প্রথম স্তরে জন্মের হার বেশীই থাকে কিন্তু মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় তরুণদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও বৃদ্ধদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি দেশ যখন শিল্পোন্নতির চরমে পৌঁছে তখন সাধারণতঃ জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় দেশে বৃদ্ধদের সংখ্যা স্বভাবতঃই অনেক বৃদ্ধি পায়। জাতীয় শক্তি বিচার করার সময় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। একটি দেশের লোকসংখ্যার মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে, সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি জাতীয় জীবনের সাথে একাত্মবোধ না হয় তবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি না পেয়ে দুর্বলতাই বৃদ্ধি পায়।

একটি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পোন্নতি, সামরিক প্রস্তুতি ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত কম লোকসংখ্যা নিয়েও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হ'তে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পোন্নতি, সামরিক প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে সমপর্যায়ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে তুলনা করলে জনসংখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। 1870—1940 এই সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর অবস্থার মধ্যে তুলনা করলেই লোকসংখ্যার গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা যাবে। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা জার্মানীর তুলনায় খুব কম বৃদ্ধি পায়। এই 70 বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বাড়ে মাত্র 40 লক্ষ এবং জার্মানীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় 2 কোটি 70 লক্ষ। তাই ফ্রান্স জার্মানী সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং এই ভয় তার বৈদেশিক নীতিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা যায় যে সামরিক কাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিকের সংখ্যা জার্মানীতে 1 কোটি 50 লক্ষ আর ফ্রান্সে মাত্র 50 লক্ষ। অতএব মোটামুটিভাবে এই কথা বলা যায় যে জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদান যদি সমান থাকে তবে দুইটি দেশের শক্তি বিচার করার সময় লোকসংখ্যার গুরুত্ব স্বীকার করতেই

হয়। তবে একটি দেশের লোকসংখ্যার গুরুত্ব বিচার করার সময় সেই দেশের মোট জনসংখ্যার হিসাব করলেই চলে না। কার্যক্ষম লোকের হার কত তা নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন।

জাতীয় চরিত্র ও মনোবল

অনেকে মনে করেন যে প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে জাতীয় শক্তি নিরূপণ করা সম্ভব নয়। একটি দেশ তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার সময় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করতে পারে না। Morgenthau মনে করেন যে যুদ্ধের প্রতি অনীহা ইংরাজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এই সব দেশের জনসাধারণ পছন্দ করেন না। কিন্তু যুদ্ধ এবং সামরিক শিক্ষা ও উদ্যোগ আয়োজনের প্রতি জার্মানীর একটা বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। বিশেষ জাতীয় সংকট ভিন্ন ইংরাজ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা সামরিক উদ্যোগ আয়োজনের বিরোধিতাই করে থাকে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা জার্মান চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার উপর যেমন জোর দেয়, জার্মানী বা রাশিয়ার নাগরিকরা তেমন দেয় না। সেই সব দেশের লোকেরা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টার উপরই বেশী জোর দিয়ে থাকে। সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং বিদেশীদের উপর অবিশ্বাসের জন্য এই সব দেশের জনসাধারণ সরকারের সামরিক প্রস্তুতিকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। Morgenthau মনে করেন যে জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সরকার সহজেই দেশে জঙ্গী মনোভাব সৃষ্টি করে তুলতে এবং নিজেদের সুবিধামত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রবল হওয়ায় সেই সব দেশের সরকারকে অনেক সতর্কতার সাথে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে হয়। জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করার জন্য যে সামরিক শক্তি বা জঙ্গী মনোভাব প্রয়োজন হয় অনেক সময় এই সব দেশের সরকার সহজে তা গড়ে তুলতে পারে না। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাই এই সব দেশ বেশী সতর্কতার সাথে চলতে বাধ্য হয়।

জাতীয় চরিত্র জাতীয় শক্তির একটি বিশেষ উপাদান। একটি দেশের জাতীয় শক্তি তার শিল্পের উন্নতি, সামরিক প্রস্তুতি ইত্যাদির মত

জাতীয় চরিত্রের উপরও নির্ভর করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পর হিটলারের প্রবল বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও ইংলণ্ড অবিচলিত থাকে। ইংলণ্ডের এই মনোবল তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে ইংলণ্ডের জাতীয় শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভের জন্য তার সামরিক শক্তি এবং লোকবলের মত জাতীয় চরিত্রও অনেকাংশে দায়ী। Morgenthau মনে করেন যে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী এবং রণচাতুর্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পিছনে তার জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য সক্রিয় ছিল—সেটা হ'ল তার পরিমাণবোধের অভাব অথবা lack of moderation. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানী ও জাপান অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে আবার শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে তা অংশতঃ তাদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে পতনের পর জার্মানীর নব্য অভ্যুত্থানও জার্মান জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। অনেকে মনে করেন যে ভারতের জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হ'লে কেবল মাত্র আর্থিক সাহায্যে দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যে মনোভাবই পোষণ করি না কেন এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় শক্তিকে জাতীয় চরিত্রের ভূমিকা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। শিল্পোন্নতি বা সামরিক প্রস্তুতির মত জাতীয় চরিত্রের অবদান সঠিক ভাবে পরিমাপ করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া জাতীয় চরিত্রের প্রভাব ইতিহাসে বা রাজনীতিতে সম্যকভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ পায় না। একটি দেশের জাতীয় চরিত্র সেই দেশের জলবায়ু এবং দীর্ঘকালীন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে জাতীয় চরিত্রও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। অতএব জাতীয় চরিত্র একটি দেশের সনাতন বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না। ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত না করে অনেকে জাতীয় চরিত্রকে একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের শারীরিক গঠন এবং রক্তের বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন যে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য race-এর উপর নির্ভরশীল এবং তা অপরিবর্তনীয়। জার্মানীর নাৎসী দল এই নীতিতে বিশ্বাস করে প্রচার করতে থাকে যে Nordic Race পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং

সমস্ত পৃথিবীতে এই Nordic Race-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। জার্মান জাতির (তথাকথিত Nordic Race এর অন্তর্ভুক্ত) পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা অগণিত ইহুদী নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এই ধরণের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক এবং মারাত্মক। জাতীয় চরিত্রের সাথে দেশবাসীর শারীরিক গঠন বা রক্তের বা race-এর কোন সম্পর্ক নেই এবং জাতীয় চরিত্র অপরিবর্তনীয় নয়।[1]

জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয় মনোবলের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলেও তারা অভিন্ন নয়। যুদ্ধ বা জাতির অন্য কোন সঙ্কট কালেই জাতীয় মনোবলের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ বা অন্য কোন সঙ্কট কালে সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্বেও দেশের জনসাধারণ জাতির সম্মান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কতদূর দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে এবং সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তার উপরই দেশের মনোবল নির্ভর করে। সঙ্কট কালে জাতির যৌথ প্রতিক্রিয়াতেই একটি দেশের মনোবল বুঝা যায়। জাতির মনোবল দৃঢ় ও অটুট থাকলে সরকার ও জনসাধারণ একত্রে জাতির সঙ্কট মোচনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু জাতীয় মনোবলের ভিত্তি যদি শিথিল হয় তবে সেই দেশের পক্ষে যুদ্ধে বা সেই ধরণের কোন সঙ্কটে জয়লাভ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অতএব কোন জাতির শক্তি বিচারের সময় জাতীয় মনোবলকে জাতীয় চরিত্রের মতই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। চীন যখন ভারত আক্রমণ করে অথবা এবং

পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেয় তা সরকারকে সেই সব সঙ্কট কালে বিশেষ সাহায্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী কর্তৃক ফ্রান্স যখন আক্রান্ত হয় তখন ফ্রান্সের মনোবল এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে তা ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পরাজয় প্রায়

1. জাতীয় চরিত্রের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে Morgenthau তাঁর বই *Politics Among Nations* এ লিখেছেন: "One can readily agree...that the allegedly inevitable determination of the national character by the "blood"—that is, the common biological characteristics of the members of a certain group—is a political fabrication without any basis in fact. One can also agree that the absolute constancy of the national character, deriving form the immutability of the qualities of a pure race, belongs in the realm of political mythology."

সুনিশ্চিত জেনেও জার্মানরা যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেয় তা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে 1918 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শত্রুর আক্রমণের ফলে জার্মানীর মনোবল সহজেই ভেঙ্গে পড়ে এবং তার ফলে জার্মানীর পরাজয় ত্বরান্বিত হয়। অতএব একটি দেশের মনোবল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা প্রায় অসম্ভব। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে সরকারের নীতি বিশেষ করে বৈদেশিক নীতির পিছনে যদি জনসমর্থন থাকে তবে জাতীয় মনোবল দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক, আর সরকারের নীতি যদি জনমতের বিরুদ্ধে যায় তবে তা দ্বারা জাতীয় মনোবল ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। সরকারের প্রোপাগাণ্ডা এবং নেতৃত্বের উপর জাতীয় মনোবল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। জাতীয় সংহতির সাথেও জাতীয় মনোবলের নিকট সম্পর্ক বর্তমান। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা যদি জাতীয় সংহতিকে ব্যাহত করে তোলে বা ভাষাগত, শ্রেণীগত অথবা বর্ণগত (racial) বিদ্বেষ যদি জাতীয়তা-বাদের অন্তরায় রূপে দেখা দেয় তবে সেই দেশের জাতীয় মনোবল ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। নাগরিকদের কোন বিশেষ অংশ যদি সরকার দ্বারা অবহেলিত মনে করে তবে সঙ্কটকালে সেই অংশ সরকারকে সাহায্য না করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে এবং ফলে সেই পরিমাণে জাতীয় মনোবলের ভিত্তিও শিথিল হ'তে বাধ্য।

জাতীয় নেতৃত্ব—সরকারের দক্ষতা এবং কূটনৈতিক নৈপুণ্য

একটি দেশের জাতীয় শক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের উপর। জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব। আধুনিক যুগে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদানের প্রধান দায়িত্ব সরকারের। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনবলের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি সাধন করা এবং সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা বর্তমান যুগের সমস্ত সরকারেরই একটি প্রধান কর্তব্য। জাতীয় শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা এবং তা কার্যকরী করে তোলা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করতে কোন দেশের সরকার যদি ব্যর্থ হয় তবে সেই দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ নৈতিক ও সামরিক বলে বলীয়ান হয়েও বিশ্ব রাজনীতিতে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি। পৃথিবীর একটি প্রধান শক্তির পক্ষে যে ধরণের বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল মার্কিন সরকার তখন তা গ্রহণ করতে বিরত থাকে। ফলে জাতীয় শক্তির তুলনায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল খুবই নগন্য। নিজের শক্তিতে যতখানি সম্ভব তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে একটি দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। যদি কোন দেশ উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে নিজের শক্তিতে সম্ভব নয় এমন ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে তবে সেই বৈদেশিক নীতি সাধারণতঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালী এবং সুকর্নের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া সেই ধরণের বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করে বিফল হয়। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একটি দেশের সরকারের পক্ষে এমন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যা অনুসরণ করা ও কার্যকরী করা সেই দেশের পক্ষে সম্ভব। সেই বাস্তব বৈদেশিক নীতিকে সার্থক করে তোলার জন্য যে ধরণের শক্তি প্রয়োজন সরকারকে সেইভাবে জাতীয় শক্তি গড়ে তুলতে হয়। লোকবল, খাদ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ না হয়েও ইংলণ্ডের পক্ষে এক সময় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ইংলণ্ডের এই উন্নতির অন্যতম কারণ এই যে ইংলণ্ডের সীমিত শক্তি দ্বারা অনুসরণ করা ও কার্যকরী করা সম্ভব এমন বাস্তব বৈদেশিক নীতি ইংরাজ সরকার নির্ধারণ করতে এবং সেই নীতিকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে (policy of splendid isolation) ইউরোপের বাইরে অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে এবং সেই নীতিকে কার্যকরী ও সার্থক করে তোলার জন্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি গড়ে তোলে। নৌশক্তির সাহায্যে একদিকে সাম্রাজ্য স্থাপন এবং বিদেশ থেকে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানী করা সম্ভব হয় এবং অপর দিকে ইংলিশ প্রণালীর উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে ইংলণ্ড বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিজের দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখতেও সক্ষম হয়। এই বাস্তব নীতি

গ্রহণ করেই ইংলণ্ড নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছিল। ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অবলম্বন করলে তার জন্য যে বিরাট স্থল-বাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন হ'ত তা ইংলণ্ডের পক্ষে গঠন করা কখনও সম্ভব ছিল না, কারণ ইংলণ্ডের লোকবল ও খাদ্য দুইই ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ দেশের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। বাস্তব ও কার্যকরী বৈদেশিক নীতি উদ্ভাবন করা এবং সেই অনুসারে জাতীয় শক্তি গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারকে সমস্ত সমস্যা বিবেচনা করে জাতীয় সম্পদের সাহায্যে দেশের শক্তি গড়ে তুলতে হয়।

জোর করে দেশের অন্যান্য সমস্যা অগ্রাহ্য করে বড় বড় শিল্প কারখানা এবং সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তুললেই সত্যিকারের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা হয় না। জনসাধারণের মতামত ও চাহিদাকে উপেক্ষা করে কোন সরকারের পক্ষে জাতীয় শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ভোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি প্রত্যেক দেশের জনসাধারণেরই কাম্যবস্তু। সমাজের এই সব দাবী অগ্রাহ্য করে কেবল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা যে কোন সরকারের পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। সরকার যদি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয় তবে সামরিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায় না। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা জাতীয় শক্তির একটি অন্যতম ভিত্তি। সরকারের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতি যাতে জনসমর্থন লাভ করে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক সরকারের অবশ্য কর্তব্য। সরকার যে বৈদেশিক নীতি জাতীয় স্বার্থের জন্য অনুকূল মনে করে তার পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। গণতন্ত্র যে সব মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সেইগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে অনেক সময় নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক নীতি যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের এক সুদূরপ্রসারী নীতি অবলম্বন করতে হয় এবং আশু লাভের চেয়ে প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হয়। তার ফলে অনেক সময় সেই নীতির পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যা স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতি পরিত্যাগ না করে যতদূর সম্ভব জনমতকে গ্রহণ ও সন্তুষ্ট করা প্রত্যেক সরকারের অবশ্য কর্তব্য। জনমত অপরিবর্তনীয়

নয়, এবং প্রত্যেক সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। কেবল নিজের দেশে নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নিজের বৈদেশিক নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। একটি দেশের বৈদেশিক (আভ্যন্তরীণ নীতির ব্যাপারেও এই কথা প্রযোজ্য) নীতির স্বপক্ষে যদি বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা যায় তবে তা দ্বারা সেই দেশের জাতীয় শক্তিকেই প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা হয়।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ভাবমূর্তি

আন্তর্জাতিক সমাজে একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা ও ভাবমূর্তিও জাতীয় শক্তির একটি প্রধান উৎস। একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি নির্ভর করে তার ইতিহাস, সমাজ এবং বর্তমান নীতি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ধারণা ও অভিমতের উপর। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, অন্য দেশকে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, রাষ্ট্রীয় সংহতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতি, নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, খেলাধূলার জগতে অগ্রগতি—এ সব কিছুর উপরই একটি দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি নির্ভর করে। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলির মর্যাদা স্বভাবতঃই অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী। পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তার ভাবমূর্তি (বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রদের কাছে) অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রমুখ পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় এবং শাখারভ, সোলঝেনিৎসিন প্রমুখ চিন্তাবিদদের মতবাদের ফলে সোভিয়েতের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি আবার অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নত মানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় কিন্তু নিগ্রোদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য তা অনেকখানি মলিন হয়ে আসে। 1962 খৃষ্টাব্দের ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায় ভারতের মর্যাদা হঠাৎ অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। তেমনিভাবে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রসমূহ 6 দিনের মধ্যে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় আরব

রাষ্ট্রগুলির বিশেষভাবে ইজিপ্টের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। ভাবমূর্তি যদি ভাল থাকে তবে সহজেই অন্য দেশের নীতিকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করা যায়, কিন্তু ভাবমূর্তি খারাপ থাকলে তা একেবারেই সম্ভব নয়। অতএব ভাবমূর্তিও জাতীয় শক্তির একটি উপাদান। এখানে মনে রাখা দরকার যে একটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের ধারণা থাকতে পারে। ভারতের কাছে পাকিস্তানের যে ভাবমূর্তি, শ্রীলঙ্কার কাছে পাকিস্তানের সে ভাবমূর্তি নয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

একটি দেশের শক্তি কেবলমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভর করে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং অন্য দেশের সাথে কি সম্পর্ক তার উপরও জাতীয় শক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। বৈদেশিক কোন শক্তির সামরিক, কূটনৈতিক বা অর্থ নৈতিক সাহায্য পেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। পাকিস্তানের শক্তি বিচার করার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের সাথে তার সম্পর্ক অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ইসরাইলের শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে সব সময়ই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে। তা ছাড়া অন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হলে একটি দেশকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে তার বন্ধু রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে থাকতে হয়। ফলে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে দেশের সার্বভৌমত্বও ক্ষুণ্ন হতে পারে।

3. জাতীয় শক্তির মূল্যায়ন

জাতীয় শক্তি মূল্যায়নের সময় মনে রাখা উচিত যে জাতীয় শক্তির ধারণা সব সময় আপেক্ষিক। একটি দেশের জাতীয় শক্তি অন্যান্য দেশের জাতীয় শক্তির তুলনায় বিচার করতে হবে। আমরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর দুইটি প্রধান শক্তিশালী দেশ হিসেবে স্বীকার করে নেই তখন এই কথাই বলা হয় যে বর্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেক বেশী। একটি দেশ এক বিশেষ সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু সেই দেশ যে চিরদিনই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। জাতীয় শক্তি যে সব উপাদানের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া আর সব উপাদানেরই পরিবর্তন ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বও সব যুগে সমান থাকে না। অতীতে ইংলিশ প্রণালী যে ভাবে ইংলণ্ডকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আর ইংলিশ প্রণালীর সেই গুরুত্ব নেই। তাই বিভিন্ন দেশের জাতীয় শক্তির হার সব যুগে সমান থাকে না। এক যুগে যে দেশ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী পরবর্তী যুগে সেই দেশ অন্য দেশের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ হিসেবে গণ্য হ'ত কিন্তু সেই যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় অনেক হ্রাস পায়। অতএব জাতীয় শক্তি বিচারের সময় এই পরিবর্তনশীলতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই দিক বিবেচনা না করে সার্থক ভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় শক্তি যে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেক বৎসর পর্যন্ত সেই দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নি। তাই তাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। জার্মানীর সাথে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য জেনেও বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে চুক্তি করবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। তার প্রধান কারণ হ'ল রাশিয়ার জাতীয় শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণা। নিজের এবং অপর দেশের শক্তির পরিবর্তনের সাথে

সামঞ্জস্য রেখে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের শক্তি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় অনেক হ্রাস পায় তখন আর বৃটেন পৃথিবীর রাজনীতিতে একটি প্রধান শক্তির ভূমিকা নেওয়ার কোন চেষ্টা করে না। বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির এই পরিবর্তন বৃটিশ জাতির রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয়।

অনেক সময় জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটির উপর জোর দিয়ে জাতীয় শক্তি বিচার করা হয়। কেহ ভৌগোলিক পরিবেশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। একদল আছেন (যেমন জার্মানীর ন্যাৎসী পার্টি) যারা জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষতার উপর এমন জোর দেন যে অন্যান্য উপাদানগুলির ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করা হয়। আবার অনেকে একমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারাই একটি দেশের জাতীয় শক্তি পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। এই ধরণের চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। জাতীয় শক্তি বিচার করার সময় পার্থিব (যেমন ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পোন্নতি, সামরিক প্রস্তুতি, লোকসংখ্যা) এবং অপার্থিব (যেমন জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মনোবল, জাতীয় নেতৃত্ব) সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতি

1. কূটনীতি
2. প্রচার কার্য
3. বৈরীমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা
4. অর্থনৈতিক কার্য
5. যুদ্ধ

1. কূটনীতি

কূটনীতির অর্থ, প্রকৃতি ও বিভিন্ন রূপ

বিভিন্ন লেখক কূটনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কিন্তু কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। কূটনীতির আসল উদ্দেশ্য হ'ল নিজ দেশের স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সার্থক এবং কার্যকরী করে তোলা। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং যতদূর সম্ভব তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। কূটনীতি ও বৈদেশিক নীতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অন্যান্য প্রয়োজন বিবেচনা করে জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক নীতি রচনা করে। সেই নীতিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য রাষ্ট্র কূটনীতির আশ্রয় নেয়। [illegible]শিক নীতিকে সফল করে তোলার জন্য কূটনীতি একটি প্রধান উপায়। পররাষ্ট্র নীতি স্থির করা কূটনীতির কাজ নয়; পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করে তোলাই কূটনীতির উদ্দেশ্য। অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ না করে তাদের সহযোগিতায় এবং প্রয়োজন হ'লে তাদের উপর বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে এবং ভয় দেখিয়ে নিজ দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাই কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। অন্য দেশের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে সেখানে কূটনীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করতে হবে।[1] কিন্তু যুদ্ধের সময় কূটনৈতিক সমস্ত কাজ অচল হয়ে পড়ে বলে যারা মনে করেন (যেমন নিকলসন্) তাঁদের অভিমত সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। যুদ্ধের সময়ও কূটনৈতিক কার্য চলতে থাকে তবে পরোক্ষ ভাবে এবং অন্য পন্থায়।

কূটনীতি একটি অতি প্রাচীন পন্থা। একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কূটনীতির মাধ্যমেই বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের পক্ষে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

---

1. Morgenthau তাঁর *Politics Among Nations*-এ লিখেছেন: "For a diplomacy that ends in war has failed in its primary objective: the promotion of national interest by peaceful means."

করা সম্ভব। প্রাচীন যুগে গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। ঐতিহাসিক Thucydides-এর লেখায় সেই সম্পর্কের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের মত স্থায়ী ভাবে দূত বিনিময়ের প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না বটে, কিন্তু বিশেষ কারণে প্রয়োজন হ'লেই গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে দূত বিনিময় হত। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মধ্যেও এই ধরণের দূত বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইতালীতে যে সব স্বাধীন নগরের সৃষ্টি হয় তারা পরস্পরের মধ্যে দূত বিনিময় করে নিজেদের ভেতর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির সাথে সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে স্থায়ী রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের প্রথা প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। রাষ্ট্রদূতরা তখন সাধারণতঃ বিদেশী রাজ দরবারে নিজেদের দেশের রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবেই পরিগণিত হতেন। অন্য দেশের রাজার সাথে তাঁর নিজের রাজার যোগসূত্র স্থাপন করাই রাষ্ট্রদূতের প্রধান দায়িত্ব ছিল। রাষ্ট্রদূতরা সকলেই বিত্তশালী সামন্ত শ্রেণী হ'তে মনোনীত হ'তেন এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁরা বিশেষ কোন বেতন পেতেন না।

আধুনিক যুগে শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গণতন্ত্র প্রসারের ফলে কূটনীতি পরিচালনার পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা অনেক পরিবর্তিত হয়। অনেক দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং বৃটেন প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকলেও রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়। সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও ক্ষমতা সর্বত্রই বিশেষ ভাবে খর্ব হয়। এই নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূতরা রাজার প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য না হ'য়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকেন। যে দেশে তাঁরা নিযুক্ত হন সেই দেশের কেবলমাত্র রাজার সাথে সম্পর্ক না রেখে সরকারের সমস্ত বিভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও দেশে জনমতের সাথে তাঁদের নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় এবং সেই সম্বন্ধে নিজের সরকারের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করতে হয়। দেশে জনমতের প্রাধান্য যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে রাষ্ট্রদূতদের কাজের পরিধিও সেই সঙ্গে বাড়তে আরম্ভ করে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক,

যাতায়াতের সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর নিবিড় হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিনা বেতনে বা অল্প টাকায় বিত্তশালী লোকদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করার প্রথা আর নেই। জনসাধারণের মধ্য থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে মনোনয়ন করে উপযুক্ত বেতন ও শিক্ষা দিয়ে সরকার বর্তমানে তাঁদের নিয়োগ করে থাকেন।

এই ভাবে আধুনিক যুগের কূটনীতি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই "গণতান্ত্রিক কূটনীতি" এক নতুন রূপ ধারণ করে এবং গণতান্ত্রিক কূটনীতির এই নতুন রূপকে বলা হয় Open Diplomacy বা প্রকাশ্য কূটনীতি। এই Open Diplomacy-কে কূটনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার বলেই মনে করা যেতে পারে। গণতন্ত্রে জনসাধারণই রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে জনসাধারণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই প্রকাশ্য কূটনীতির উদ্দেশ্য। "গোপন কূটনীতি"র (Secret Diplomacy) বিরুদ্ধেই এই "প্রকাশ্য কূটনীতি"র দাবী উত্থাপিত হয়। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশের রাজারা নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে চুক্তি স্থাপন করে তা গোপন করে রাখতেন। অন্য দেশের সরকার বা তাঁর নিজের দেশের জনসাধারণ সেই সব চুক্তি সম্বন্ধে কোন খবরই পেত না। গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরও এই ধরণের গোপন কূটনীতি অব্যাহত থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই গোপন কূটনীতির বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রতিবাদ গড়ে উঠে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেকে মনে করেন যে এই গোপন কূটনীতির প্রথা বিশ্বশান্তি স্থাপনের পথে একটি অন্তরায় এবং এই ধরণের কূটনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করে যুদ্ধের প্রস্তুতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে দেখা গেল যে বৃটেন এবং মিত্রপক্ষের কোন কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে ইতালীর সাহায্য লাভের জন্য ইতালীর সাথে এমন সব গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে যার শর্ত মিত্র পক্ষের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তখন প্রকাশ্য কূটনীতির দাবী জোরদার হয়ে উঠে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফার প্রথম দফায় এই প্রকাশ্য কূটনীতির কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়:

Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any

kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view." প্রকাশ্য কূটনীতির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং খোলাখুলি ভাবে এবং জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অবগত রেখে অন্য দেশের সাথে কূটনৈতিক আলোচনা চালাতে হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রেও কোন পর্যায়ে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করা চলবে না। প্রকাশ্য কূটনীতি সম্বন্ধে উইলসনের এই ব্যাখ্যা অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি-গুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চুক্তির শর্ত যদি গোপন রাখা হয় তবে অন্য রাষ্ট্রের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উদ্রেগ হ'তে পারে এবং তার ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রকাশ করে জাতীয় পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র এবং সমস্ত জনসাধারণকে সেই সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা যদি দেওয়া না যায় তবে একটি দেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ব্যাপারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ পায় না। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব পর্যায়ে প্রকাশ্য এবং খোলাখুলি ভাবে করা সম্ভব নয়। এই সব আলোচনাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে অনেক সময় উভয় পক্ষকেই একটা নমনীয় নীতি অবলম্বন করতে হয়। সার্থক ভাবে এই সব আলোচনার জন্য যে অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে হলে আলোচনার সময় গোপনীয়তা বজায় রাখা আবশ্যক। আলোচনা যদি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার সমস্ত বিবরণ যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'তে থাকে তবে নিজস্ব পরিকল্পনা মত কূটনৈতিক চালে এই সব আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন রাষ্ট্রদূত বা কোন বৈদেশিক মন্ত্রীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আলোচনার ফলাফল জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা উচিত এবং সেই বিষয়ে জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কূটনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র সেই ভাবেই গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

নিকলসন (Harold Nicolson) তাঁর বিখ্যাত বই *Evolution of Diplomacy*-তে "গণতান্ত্রিক কূটনীতি"র তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেখানে

-গণতান্ত্রিক বা প্রকাশ্য কূটনীতি সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ব্যাখ্যাকেই সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে কূটনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দায়িত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, জনসাধারণের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ নাগরিক দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেকখানি সচেতন হ'লেও বৈদেশিক নীতি নিয়ে খুব চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। তৃতীয়তঃ, তাদের সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই জনসাধারণ অনেক সময় বিভিন্ন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং তা অভ্রান্ত মনে করে। দায়িত্ব সহকারে কূটনীতিকরা যখন কাজ করেন তখন সমস্যার সমস্ত দিকে তাঁকে চিন্তা করতে হয় এবং জনসাধারণ তাদের নিজস্ব মতামত দ্বারা কূটনীতিকদের যদি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তবে তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে সরকার তার নিজের নীতির পক্ষে জনমত সৃষ্টি না করে কোন গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে অনেকক্ষেত্রে সময় মত প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব হয় না। এই বিলম্বের ফলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হ'তে পারে। পঞ্চমতঃ, কূটনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হওয়ার ফলে সুস্পষ্ট নীতির পরিবর্তে ভাসাভাসা নীতি গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। *Evolution of Diplomacy* বইতে নিকলসন বলেন যে গণতান্ত্রিক কূটনীতির প্রধান দুর্বলতা হ'ল তার অনিশ্চয়তা। বিদেশী সরকারের সাথে যাঁরা বিভিন্ন আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁদের যদি এই বিশ্বাস না থাকে যে আলোচনার ফলে যে চুক্তি সম্পাদিত হবে তাঁর সরকার তা অনুমোদন করবেন তবে তাঁদের পক্ষে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি যদি কোন বিধান সভা বা কোন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ হয় তবে কূটনৈতিক অফিসারদের মনে অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে গণতান্ত্রিক বা প্রকাশ্য কূটনীতির যে ব্যাখ্যা প্রেসিডেণ্ট উইলসন দিয়েছিলেন [1] তা গ্রহণযোগ্য না হ'লেও একটি

1. প্রেসিডেণ্ট উইলসন নিজেও পরে স্বীকার করেছেন যে open diplomacy বলতে তিনি গোপন চুক্তির বিরোধিতা করেছেন, গোপন আলোচনার নয়। 1918 খৃষ্টাব্দে সিনেটের কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি বললেন: "when I pronounced for open diplomacy, I meant not that there should be no private discussions of delicate matters, but that no secret agreements should be entered into, and that all international relations, when fixed, should be open, aboveboard and explicit.

দেশের কূটনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির উপর মোটামুটি ভাবে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব মেনে নিতেই হবে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতন্ত্র স্বীকার করে বৈদেশিক নীতিতে গণতন্ত্র অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আলোচনার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করেও কূটনীতি এবং বৈদেশিক নীতির উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব। বৈদেশিক নীতির মূলসূত্রগুলি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহ জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক যুগে গণসমর্থন ব্যতীত কোন কূটনীতি বা পররাষ্ট্র নীতি সার্থক ও কার্যকরী হ'তে পারে না। গণতান্ত্রিক কূটনীতির অর্থ এই নয় যে জনসাধারণ দ্বারা কূটনীতি পরিচালিত হবে। সরকারের কূটনীতির পিছনে জনসমর্থন থাকা চাই, এটাই হ'ল গণতান্ত্রিক কূটনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে কূটনৈতিক পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। Jules Cambon ঠিকই বলেছেন যে প্রকাশ্য কূটনীতির আদর্শ গৃহীত হওয়ার ফলে কূটনীতির বহিরাবরণ (outward form) পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র কিন্তু মৌলিক (substance) কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাহায্যে এবং রাষ্ট্রনায়করা নিজেরা মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালনা করে থাকেন। এই ধরণের কূটনীতিকে সাধারণতঃ যথাক্রমে diplomacy by conference এবং personal diplomacy বলা হয়। এই ধরণের কূটনীতিতে রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কূটনীতিবিদদের কার্য ও ভূমিকা আলোচনার সময় এই ধরণের কূটনীতির অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কূটনীতিবিদদের কার্য ও ভূমিকা

রাষ্ট্রদূতরা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হন। তাই তাঁদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁরা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাঁদের কার্য সম্পাদন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের বিশেষ কতগুলি সুবিধা দেওয়া হ'য়ে থাকে। রাষ্ট্রদূত, তাঁদের পরিবারবর্গ এবং তাঁদের অফিসের সকল কর্মচারীকে তাঁরা যে রাষ্ট্রে নিযুক্ত হন সেই রাষ্ট্রের সরকারী কর্তৃত্বের বহির্ভূত হিসেবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রদূতরা যেখানে থাকেন এবং তাঁদের অফিস যেখানে অবস্থিত সেই স্থানকে রাষ্ট্রদূতের নিজের দেশের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরা হ'য়ে থাকে।

তাঁরা যে দেশে নিযুক্ত থাকেন সেই দেশের সরকারী কর্মচারীদের কোন কর্তৃত্ব সেই সব স্থানে স্বীকৃত হয় না। তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ কর বা বাণিজ্য শুল্ক দিতে হয় না। তাঁরা যে রাষ্ট্রে কাজ করেন রাষ্ট্রদূতদের সেই রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী এক্তিয়ারের বহির্ভূত মনে করা হয়। জাতিসংঘ এবং বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মচারীরাও এই সব অধিকার ভোগ করে থাকেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন রাষ্ট্রদূত বা তাঁর অফিসের কোন কর্মচারা যদি অবাঞ্ছিত কোন কার্যে লিপ্ত থাকেন তবে যে রাষ্ট্রে তিনি নিযুক্ত আছেন সেই রাষ্ট্রের সরকার দেশ থেকে তাঁর বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারে।

একটি দেশের কূটনীতি পরিচালনার করার দায়িত্ব থাকে সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Foreign Office) এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও বিভিন্ন কূটনৈতিক অফিসারদের উপর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৈদেশিক নীতি স্থির করে এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। এই কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে থাকেন।

রাষ্ট্রদূতরা বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি সেই দেশের যে সব সরকারী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হবেন সেই সব অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তিনি নিজেও ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং যেদেশে তিনি নিযুক্ত আছেন সেই দেশের মন্ত্রী ও বড় বড় সরকারী কর্মচারী, সেই দেশে নিযুক্ত অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রে প্রতিনিধি এবং প্রয়োজন বোধে অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করে থাকেন। কোন বিশেষ কারণে ভারতবর্ষ যখন কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানায় বা শোকবার্তা প্রেরণ করে তখন সেই দেশে নিযুক্ত ভারতের প্রতিনিধির মাধ্যমেই তা পাঠাতে হয়।

একজন রাষ্ট্রদূত তাঁর নিজের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যে দেশে তিনি নিযুক্ত আছেন সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রদূতকে আলোচনা চালাতে হয় এবং প্রয়োজন হ'লে বিভিন্ন চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারের নির্দেশে চুক্তিতে সই করে থাকেন। যে বিদেশী রাষ্ট্রে তিনি নিযুক্ত আছেন সেই রাষ্ট্রে তাঁর নিজের দেশের যে

সব নাগরিক বাস করেন বা ব্যবসায় করেন বা বেড়াতে যান তাদের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রদূতের একটি প্রধান কর্তব্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংবাদ আদান প্রদানের আধুনিক উন্নত ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রদূতেরা এইসব ব্যাপারে পূর্বের মত আর স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পান না। তিনি যত দূরেই নিযুক্ত থাকুন না কেন তাঁর নিজের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্যাবেল, টেলিফোন ইত্যাদির সাহায্যে সর্বদা বিস্তারিত ভাবে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সমস্ত ব্যাপারে সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রদূতকে চলতে হয়। নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করে স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর বিশেষ কিছুই নেই। তাছাড়া আধুনিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্রে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নানা রকম চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এই সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং অথবা তাঁর কোন বিশেষ প্রতিনিধি সাধারণতঃ যোগদান করে থাকেন। ফলে রাষ্ট্রদূতদের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। তবে এখনও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সংখ্যাই বেশী এবং এই সব চুক্তি সম্পাদনে রাষ্ট্রদূতরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

রাষ্ট্রদূতদের রাজনৈতিক কার্যাবলী বিশেষ গুরুত্ব। যে দেশে তাঁরা নিযুক্ত থাকেন সেই দেশের পররাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় নীতি, সামরিক প্রস্তুতি, জনমত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁকে বিস্তারিত সংবাদ আহরণ করতে হয়। এই সব সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনেক সময় কোন কোন দেশের রাষ্ট্রদূতের অফিস কিছু পরিমাণে গুপ্তচরের কাজ করে থাকে, যদিও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রদূতরা কখনও গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। একজন রাষ্ট্রদূতকে সাহায্য করার জন্য অনেক অভিজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁরা সেই দেশ সম্বন্ধে তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করে রাষ্ট্রদূতকে সাহায্য করেন। রাষ্ট্রদূতকে সেই দেশ সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত ভাবে নিজের সরকারকে প্রেরণ করতে হয়। প্রধানতঃ এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাঁর সরকার সেই দেশ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টে যদি সেই দেশের নীতি ও মনোভাব যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত না হয় তবে সেই দেশ সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেশের নীতি সঠিক এবং নির্ভুল হতে পারে না। তাঁর নিজের

সরকার খুশী হবেন এবং সেই সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এমন রিপোর্ট দেওয়ার একটা সহজ প্রবণতা অনেক রাষ্ট্রদূতের মধ্যে দেখা যায়। তার ফলে তিনি তাঁর সরকারের সুনজরে থাকতে পারেন কিন্তু তা দ্বারা রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করা হয় না। তাঁর নিজের দেশের নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিদেশে প্রচার করা এবং সেই নীতি ও আদর্শের পক্ষে বিদেশে জনমত গঠন করাও রাষ্ট্রদূতের একটি বিশেষ দায়িত্ব। যে দেশে তিনি নিযুক্ত আছেন সেই দেশের জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রদূতের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার, চালচলন ও কথাবার্তা দ্বারা তিনি সেই দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যদি আকৃষ্ট করতে না পারেন তবে তিনি তাঁর কাজে কখনও সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হ'তে পারবেন না।

একটি দেশের কূটনৈতিক অফিসাররা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত থাকেন। Ambassador বা Ministerরা হ'লেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া Counsellor, Secretary (তাদের ভেতর আবার First Secretary, Second Secretary এবং Third Secretary এই তিন শ্রেণী থাকে) এবং নানা ধরণের Attache এবং Assistant Attache থাকেন। বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কূটনৈতিক অফিসারদের সম্মান নির্ভর করে তাঁরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত অফিসার তার উপর। কন্সালরাও (Cousuls) একটি দেশের বৈদেশিক সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা অনেক সময় কূটনৈতিক কাজও করে থাকেন। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং তিনি যে দেশে নিযুক্ত আছেন সেই দেশের সাথে তাঁর নিজের রাষ্ট্রের ব্যবসায় বাণিজ্য যাতে প্রসার লাভ করে তার জন্য চেষ্টা করা কন্সালের অন্যতম কার্য। তা ছাড়া বিদেশে তাঁর নিজের দেশের নাগরিককে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করাও তাঁর বিশেষ দায়িত্ব।

একটি দেশের বৈদেশিক দপ্তর সাধারণতঃ তার রাষ্ট্রদূত ও কন্সালদের সাহায্যেই অন্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করে থাকে, কিন্তু কখন কখনও বিশেষ করে বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমেও এই কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই ধরণের কূটনীতিকে Diplomacy by Conference বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের

মাধ্যমে এই ধরণের কূটনীতি বিশেষ প্রসার লাভ করে। সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলাপ আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের দ্বারা সমাধান করার প্রচেষ্টা এই কূটনীতি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই জন্য এই ধরণের কূটনীতিকে Morgenthau নাম দিয়েছেন Diplomacy by Parliamentary Procedure. জাতিসংঘ সৃষ্টির পূর্বেও এই ধরণের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংঘটিত হয়েছে, যেমন 1899 এবং 1907 খৃষ্টাব্দের হেগ শান্তি সম্মেলন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে এই ধরণের কূটনীতি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বর্তমানে প্রতি বৎসর অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংঘটিত হয়ে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাইরেও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালনা করার চেষ্টা আধুনিক বিশ্বরাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ 1955 খৃষ্টাব্দের বান্দুং সম্মেলন এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন সম্মেলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। SEATO, CENTO, NATO, Warsaw Pact ইত্যাদি সংগঠন বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালনা করে থাকে। এই সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকা গৌণ এবং তার ফলে তাঁদের গুরুত্ব কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু একটি দেশের কূটনীতির উপর প্রকাশ্য ভাবে অনুষ্ঠিত এই সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রভাব খুবই সীমিত। জাতিসংঘের কাউন্সিল বা সাধারণ সভায় প্রকাশ্যে কোন সমস্যা, বিশেষ করে রাজনৈতিক সমস্যা, আলোচিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন দেশ তাদের বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের সাথে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক আলোচনা করে নেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধেও এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্ন দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক সম্মেলন নয়। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপন আলোচনার স্থান এখনও মুখ্য এবং সেই সব আলোচনায় রাষ্ট্রদূতরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সাধারণতঃ রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যাতায়াত এবং সংবাদ আদান প্রদান অত্যন্ত সহজ হওয়ায় রাষ্ট্র অথবা সরকারের প্রধান ব্যক্তিরা অনেক সময় নিজেরা আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য নীতি স্থির করে থাকেন। পূর্বেও রাষ্ট্র প্রধানরা এই রকমের আলোচনায় মিলিত হয়েছেন,

কিন্তু বর্তমানে এই ধরণের কূটনৈতিক আলোচনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এই ধরণের কূটনীতিকে সাধারণতঃ personal diplomacy আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে এই ধরণের কূটনীতি বিশেষ প্রসার লাভ করে। 1941 খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ব্যক্তিগত ভাবে মিলিত হন এবং তার ফলেই Atlantic Charter রচিত হয়। চার্চিল এবং রুজভেল্ট 1943 খৃষ্টাব্দে চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাইশেকের সাথে কায়রোতে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা ষ্ট্যালিনের সাথে সেই বৎসরই তেহেরাণে এবং 1945 খৃষ্টাব্দে ইয়াল্টাতে মিলিত হয়ে ভবিষ্যতের নীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও এই ধরণের ব্যক্তিগত আলোচনার প্রথা অব্যাহত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন্ চীন এবং রাশিয়ায় গিয়ে সেই সব দেশের রাষ্ট্রীয় নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বরাজনীতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ভিতর এই সব ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে মিলিত না হ'য়ে বিশেষ দূতের মাধ্যমে মত বিনিময় করে থাকেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন্ হেন্‌রী কিসিংগারকে এই ভাবে তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। হ্যারী হপকিন্স (Hary Hopkins) প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ দূত হিসেবে অনেক কূটনৈতিক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেক সময় রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান মন্ত্রী টেলিফোনের মাধ্যমে কূটনৈতিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। রুজভেল্ট ও চার্চিল এই ভাবে টেলিফোনে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে কূটনীতি পরিচালনার কার্যে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। বৈদেশিক ব্যাপারে তাঁদের প্রধান কাজ হ'ল নীতি নির্ধারণ করা—বাস্তবে সেই নীতিকে প্রয়োগ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য কূটনৈতিক অফিসারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রীর মত লোকের উপর যদি কূটনীতি পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত

ও পছন্দ অপছন্দ দ্বারা রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হ'তে পারে। কূটনৈতিক আলোচনা যতদূর সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পর্যায়ে যে আলোচনা হয় তা জন-সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে এবং সেই আলোচনা ব্যর্থ হ'লে দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে গভীর নৈরাশ্য বা অহেতুক বৈরীভাব সৃষ্টি হ'তে পারে। রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যে সব কূটনৈতিক আলোচনা হয় তাতে জন-সাধারণের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় না এবং তা ব্যর্থ হ'লেও সেই ব্যর্থতার প্রভাব তেমন ব্যাপক আকারে দেখা দেয় না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক আলোচনা সাধারণতঃ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়, কারণ আলোচনার সময় প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী অপর পক্ষকে যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিতে পারবেন রাষ্ট্রদূতদের পক্ষে নিজেদের দায়িত্বে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

Diplomacy by conference বা personal diplomacy-র ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকা গৌণ মনে হ'লেও এই সব শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে রাষ্ট্রদূতদের যে ভূমিকা থাকে তার মূল্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

2. প্রচার কার্য

প্রচার কার্যের অর্থ

একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্র নীতিকে কূটনীতির সাহায্যে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করে। আধুনিক যুগে কূটনীতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য প্রচারকার্যের বা প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যও নেওয়া হয়। প্রচার কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের মনকে জয় করা। নিজের নীতির সপক্ষে স্বদেশে এবং বিদেশে জনমত সৃষ্টি করার জন্য একটি রাষ্ট্র যে সব কাজ করে থাকে তাকে আমরা প্রচার কার্য বলি। বিভিন্ন ধরণের প্রচার কার্য প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। ভারতের সম্রাট অশোক জগতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ যীশুখ্রীষ্টের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে এবং তাদের কাজের ফলেই 'প্রোপাগাণ্ডা' কথাটি বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। আধুনিক যুগে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্যের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সহজে এবং অল্প ব্যয়ে অসংখ্য লোকের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে নিজের নীতি ও মতবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হওয়ার ফলেই প্রচার কার্য বা প্রোপাগাণ্ডা আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত ডাক ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের প্রচলন, অল্পব্যয়ে সংবাদপত্র এবং পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ, রেডিও, সিনেমা ও বর্তমানে টেলিভিশনের প্রসার—এই সব বিষয়ে উন্নতির জন্যই ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চালনা আজ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগের রাজনীতিতে সব রাষ্ট্রেই—সেই রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক না হ'লেও—জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব নীতি ও মতবাদের সপক্ষে নিজের ও অন্য দেশের জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রচার কার্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, শত্রুর মনোবল ধ্বংস করার জন্য এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রচার কার্যের সাহায্য বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক,

রাজনীতিতে প্রচার কার্যের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার যন্ত্র সমস্ত বিশ্বে বিশেষ নিপুণতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির প্রচার কার্যের পরিধি অপেক্ষাকৃত কম।

প্রচার কার্যের নীতি ও কৌশল

একটি দেশের প্রচার কার্যের পদ্ধতি সেই দেশের রাষ্ট্রীয় গঠন এবং রাজনৈতিক মতবাদের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। প্রচার কার্যের উদ্দেশ্যের উপরও প্রচার কার্যের পদ্ধতি নির্ভর করে। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ প্রচার কার্য এবং বৈদেশিক প্রচার কার্যের পদ্ধতি এক রকমের হ'তে পারে না। যুদ্ধের সময় যেভাবে প্রচার কার্য চালাতে হয় শান্তির সময়ে সেই পদ্ধতিতে চলা সম্ভব নয়।

আভ্যন্তরীণ প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য হ'ল সরকারের নীতির পক্ষে দেশের জনমত গঠন করা। সংবাদপত্র, পুস্তিকা, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, সভা সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার জনসাধারণের কাছে তার নীতি ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে জন-সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকে না। সরকারের বিরুদ্ধপক্ষ সরকারের নীতির বিরুদ্ধেও প্রচার কার্য চালাবার সুযোগ পায়। কিন্তু যে সব দেশে বিরোধী দলকে স্বীকার করা হয় না সেই সব দেশে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন প্রচার কার্য সম্ভব নয়। সেই সব দেশে সরকারের নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে সরকারের নীতি যদি জনস্বার্থ বিরোধী হয় তবে প্রকাশ্য ভাবে সরকারের বিরোধিতা করতে না পারলেও জনমত সরকার বিরোধী হয়ে উঠতে পারে। সরকারের নীতির উৎকর্ষতা এবং যৌক্তিকতার উপর প্রচার কার্যের সাফল্য নির্ভর করে। প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে একটি জাতিকে যে মোহগ্রস্ত করে রাখা সম্ভব হিটলারের জার্মানী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিটলারের দল প্রচার করতে থাকে যে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর সামরিক বাহিনী পরাজিত হয় নি—ইহুদী এবং বামপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই জার্মানী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভার্সাই সন্ধির উপর জার্মান জাতির তীব্র বিদ্বেষের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হিটলারের নাৎসী দল প্রচার করতে থাকে যে পবিত্র আর্যরক্তের

অধিকারী জার্মান জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, কিন্তু ইহুদী এবং কম্যুনিষ্টদের ষড়যন্ত্রের ফলেই জার্মানী পরাজিত হ'য়ে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। জার্মানীর অধিকাংশ লোকের কাছে হিটলার জাতির ত্রাণকর্তা রূপে পরিগণিত হন এবং অনেকেই স্বেচ্ছায় হিটলারের একনায়কত্ব স্বীকার করে নেয়। ক্ষমতা লাভ করে গোয়েবেলস্ (Goebbels)-এর সাহায্যে হিটলার তাঁর প্রচার যন্ত্রকে দক্ষতার সাথে নিপুণ ভাবে গড়ে তোলেন এবং সমস্ত জার্মান জাতির মধ্যে একটিমাত্র জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই উদ্দেশ্যে জার্মান সংবাদপত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, সিনেমা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি স্লোগান (যেমন 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নেতা') এবং প্রতীক (যেমন স্বস্তিকা)-এর সাহায্যে জার্মান জাতির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে (যখনই নিজেদের মধ্যে দেখা হ'ত তখনই জার্মানরা পরস্পরকে 'Heil Hitler' বলে অভিবাদন জানাত) হিটলার সমস্ত দেশকে নাৎসী মতবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তবে হিটলারের সাফল্য একমাত্র তাঁর প্রচার কার্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে তা মনে করা ভুল। একদিকে ইহুদী এবং বিরোধী দলের উপর চরম অত্যাচার করা হয় এবং অপর দিকে যুদ্ধের আয়োজন করতে গিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। তা ছাড়া রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণ, সার (Saar) অঞ্চলের গণভোটে জয়লাভ, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া দখল, রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কূটনৈতিক সাফল্যও হিটলারকে জনপ্রিয় করে তোলে।

হিটলারের মত মুসোলিনীও প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে জনসাধারণের অন্তর জয় করার চেষ্টা করেন। ইতালীয় জনসাধারণের মনে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের স্বপ্ন তুলে ধরে মুসোলিনী নিজের ফ্যাসিস্টবাহিনীকে সীজারের সেনাদল রূপে অভিহিত করতে থাকেন। বিশেষ ধরণের স্লোগান, প্রতীক এবং পোষাকের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে উগ্র জাতীয়তাবাদবোধ সৃষ্টি করে মুসোলিনী দেশের জনমতকে নিজের মতবাদ অনুযায়ী সংগঠিত করতে সমর্থ হন।

সোভিয়েত রাশিয়াতেও প্রচার কার্যের বিশেষ সাফল্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেণীহীন সমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় জনমত গঠনের সমস্ত যন্ত্র বা মাধ্যমগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে। সরকার বিরোধী কোন প্রচার সেখানে সহ্য করা

হয় না। বিশেষ ধরণের প্রতীক (যেমন, কাস্তে হাতুড়ি), স্লোগান (যেমন, ছনিয়ার মজদুর এক হও) এবং কথা (যেমন, সর্বহারা, মেহনতী জনতা, বিপ্লব) ব্যবহার করে মানুষের মনকে বৈপ্লবিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি প্রচার কার্যের সাহায্য বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই নাৎসী জার্মানী প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে দেশে যুদ্ধের পক্ষে মনোভাব গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। তাই যুদ্ধের সময় শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণার মনোভাব সহজেই জার্মানীতে জাগ্রত করা সম্ভব হ'ল। সামরিক অভিযানের সঙ্গে জার্মানীর প্রোপাগাণ্ডা অভিযান সমান তালে চলতে থাকে। শত্রুর মনোবল ধ্বংস করার কাজে জার্মান প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধের প্রথম দিকে বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে যুদ্ধে যোগদান না করে জার্মান প্রোপাগাণ্ডা সেই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নাৎসী মতবাদে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কয়েকটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল। সেই সব সংস্থাগুলিকে জার্মানী ইহুদী বিরোধী পুস্তক পুস্তিকা এবং 'পোষ্টার' পাঠিয়ে সাহায্য করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে যুদ্ধে যোগ না দেয় সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাৎসীরা জার্মানীর নির্দেশে বিশেষ ভাবে জনমত গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রোপাগাণ্ডা যন্ত্রও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল জাপান তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। জাপান প্রচার করতে থাকে যে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি নতুন স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী পরিবেশ (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য। এই প্রোপাগাণ্ডা এশিয়ার অনেক পরাধীন জাতির মনে রেখাপাত করে এবং তার ফলে সেই সব দেশে জাপানের পক্ষে মনোভাব গড়ে উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী প্রোপাগাণ্ডার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না, তবে জাপানী রেডিও বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তির পরাজয়ের কাহিনী প্রচার করার সাথে সাথে আমেরিকান সেনাদলের মনোবল নষ্ট করার জন্য তাদের মনে দেশে ফিরে যাবার আকুতি সৃষ্টি করতে বিশেষ চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোপাগাণ্ডা যন্ত্রও

বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে 1939 খৃষ্টাব্দে পয়লা সেপ্টেম্বর বৃটিশ পার্লামেন্ট Ministry of Information গঠন করে এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিকে নাৎসী জার্মানীর প্রবল আক্রমণের মুখে জাতীয় মনোবল রক্ষা করাই বৃটিশ প্রোপাগাণ্ডার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোপাগাণ্ডা পরিচালনার জন্য 1942 খৃষ্টাব্দে Office of War Information স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে রেডিও ষ্টেশন স্থাপন করে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় সংবাদ প্রচার করে শত্রু পক্ষের মনোবল ধ্বংস করার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বৃটেন সকলেই এই ধরণের অনেক রেডিও ষ্টেশন স্থাপন করে। যদিও এই সব রেডিওর সংবাদ শোনা আইনতঃ দণ্ডনীয় ছিল তবুও জার্মানদের মধ্যে এই সব রেডিওর সংবাদ শোনার আগ্রহ কম ছিল না। ষ্ট্যালিনগ্রাড যুদ্ধের পর জার্মান বাহিনীর যখন পরাজয় শুরু হয় তখন থেকে জার্মানীর অনেকেই জার্মান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করত না। রেডিওতে সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া বিভিন্ন ভাবে প্রচার পত্র বিতরণ করে শত্রুপক্ষের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা হয়। মিত্রপক্ষের প্রোপাগাণ্ডা জাপানের মনোবল ধ্বংস করার কাজেও বিশেষ সাফল্য লাভ করে। 1945 সালে রেডিও থেকে জাপানের কয়েকটি প্রধান প্রধান নগরের নাম উল্লেখ ক'রে বলা হ'ত যে এই সব নগরের মধ্যে একটি নগরকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করা হবে। জাপানের মত সুসংহত জাতিও এই ধরণের প্রোপাগাণ্ডায় যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা আমরা কয়েক বৎসর পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয় তখন প্রোপাগাণ্ডার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুইটি প্রধান শক্তি—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয়ই নিজেদের প্রচার কার্য জোরদার করতে আরম্ভ করে। রুশ-চীন বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচার কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিভিন্ন রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রদূতের অফিস, এবং বিভিন্ন মৈত্রী সংঘের মাধ্যমে এই প্রচার কার্য পরিচালিত হয়। নানা ধরণের পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকা অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ করে সোভিয়েত অর্থনীতি,

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতির পক্ষে বিভিন্ন দেশে জনমত সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ চেষ্টা শুরু হয়। সোভিয়েত প্রোপাগাণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী দেশ হিসেবে চিত্রিত করে সোভিয়েত নীতিকে সাম্রাজ্যবিরোধী এবং শান্তির সহায়ক রূপে প্রচার করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রুম্যান ডকট্রিন (Truman Doctrine), মার্শাল প্ল্যান (Marshall Plan) ইত্যাদি পরিকল্পনাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরোধী বলে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি প্রচার কার্য চালায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই সমান ভাবে প্রচার কার্য চালাতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রচার কার্যে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদির উপর জোর দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সাম্যবাদ, শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে প্রচার কার্য চালাতে আরম্ভ করে। বিদেশে প্রচার কার্য পরিচালনা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1953 খৃষ্টাব্দে United States Information Agency (USIA) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। বর্তমানে এই সংস্থা United States International Communication Agency নামে পরিচিত। এই সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অ-কম্যুনিষ্ট দেশে পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশ করে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে থাকে। লাইব্রেরী, সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রচার কার্য চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। Voice of America-র সাহায্যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিসহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবাদ এবং সংবাদের উপর নিজেদের মন্তব্য প্রচার করতে আরম্ভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের উন্নতির কাহিনী বিদেশে প্রচার করে তাদের কাছে নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। উভয় দেশই পারমাণবিক বিজ্ঞান ও চন্দ্র অভিযান তাদের সাফল্যকে প্রচার কার্যে ব্যবহার করে। অলিম্পিক খেলার মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা চলতে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদান করে তারা নিজেদের দেশের অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকে অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

প্রোপাগাণ্ডার আসল উদ্দেশ্য মানুষের মন জয় করা। অতএব যে দেশে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয় সেই দেশের জনসাধারণের আশা, আকাঙ্খা, ভয় এবং স্বার্থের সাথে যদি সম্যক পরিচয় না থাকে তবে কখনও প্রচার কার্য সাফল্য লাভ করতে পারে না। আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক উভয় ধরণের প্রোপাগাণ্ডা সম্বন্ধে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রোপাগাণ্ডায় যে মূল্যবোধ বা আদর্শের কথা বলা হয় তা সত্য কি মিথ্যা তার উপর প্রোপাগাণ্ডার সাফল্য বিশেষ নির্ভর করে না। এক সময় ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য, স্বাধীনতা এবং মৈত্রী"র বাণী ইউরোপের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী যুগে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের আদর্শে অনেকে অনুপ্রাণিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সব আদর্শের ভিত্তিতে প্রচার কার্য চালিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। এই সফলতা সেই সব মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। বিশেষ যুগে বিশেষ দেশের মানুষ এই সব মতবাদকে তাদের আশা আকাঙ্খা ও স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূল বলে মেনে নেয় এবং সেই কারণেই এই সব মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ফ্যাসিবাদের জাতিতত্ত্ব বা race theory দ্বারা জার্মানীর অধিকাংশ মানুষ এক সময় অনুপ্রাণিত হয়। এ তত্ত্বকে সত্য মনে করে তারা গ্রহণ করেছিল তা ঠিক নয়—পরাজিত এবং অপমানিত জার্মানী এই তত্ত্বের মধ্যে নিজেদের জাতীয় মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল এবং সেই কারণেই তারা এই তত্ত্বকে তখন গ্রহণ করে। যে দেশ দারিদ্র সমস্যায় জর্জরিত সেই দেশে কম্যুনিজম ও অর্থ নৈতিক সাম্যের প্রোপাগাণ্ডা সহজেই সাফল্য লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে অভ্যস্ত থাকায় সেই সব দেশের মানুষের পক্ষে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব সহজে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই একটি দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে প্রোপাগাণ্ডা সহজে সফলতা লাভ করতে পারে না।

বাজারে বিক্রেতা যে পদ্ধতিতে তার জিনিষের বিক্রী বাড়াতে চায় প্রোপাগাণ্ডাও অনেকটা সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। বিক্রেতা যেমন তার জিনিষের ভালোর দিকটাই প্রচার করে, ভাল মন্দ উভয় দিক বিচার করে না, প্রোপাগাণ্ডার বেলায়ও সেই নীতিই অবলম্বন করতে হয়। একটি ঘটনা বা অবস্থার সমস্ত দিক ব্যাখ্যা না করে নিজের সুবিধামত বিশেষ কোন দিকের উপর জোর দেওয়াই প্রোপাগাণ্ডার বিশেষত্ব। 1870 খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক Ems

টেলিগ্রামকে যে ভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা প্রোপাগাণ্ডায় অনেক সময় সত্য কি ভাবে বিকৃত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাশিয়াতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বেনেদেত্তি (Benedetti) Ems-এ (একটি জায়গার নাম) প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়মের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রাশিয়ার রাজবংশের (Hohenzollern dynasty) কোন লোক যাতে ভবিষ্যতে কখনও স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হয় সেই মর্মে এক প্রতিশ্রুতি দাবী করেন। প্রাশিয়ার রাজা সেই রকম কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন না। ব্যর্থ হ'লেও আলোচনা ভদ্র এবং শান্ত ভাবেই শেষ হয়। কোন পক্ষই অপরকে অপমান করার কোন চেষ্টা করে নি। প্রাশিয়ার রাজা চ্যান্সেলার বিসমার্ককে Ems এর এই আলোচনার খবর টেলিগ্রামে প্রেরণ করেন। বিসমার্ক এই ঘটনা সংবাদপত্রে এমন ভাবে প্রকাশ করেন যে ফরাসী জনসাধারণ মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রাশিয়ার রাজা অপমান করেছেন এবং প্রাশিয়ার জনসাধারণ মনে করে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব তাদের পক্ষে চরম অপমানকর। ফলে উভয় দেশের মধ্যে তীব্র বৈরী ভাবের সৃষ্টি হয় এবং শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। বিসমার্ক মনে করতেন যে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হ'লে ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য। তাই উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই তিনি স্বেচ্ছায় Ems টেলিগ্রামকে এমন বিকৃত করে প্রকাশ করেছিলেন। সত্যকে বিকৃত করে প্রোপাগাণ্ডা কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারে এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক যুগে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাদের প্রোপাগাণ্ডায় পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং তাদের নিজেদের দেশে শ্রমিক কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতির উপরই জোর দেয়। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ অন্যান্য দেশ যারা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বোধ ইত্যাদির উপরই জোর দিয়ে থাকে। ভাল মন্দ উভয় দিক নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য নয়।

একটি দেশ প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে যখন অন্য দেশের জনসাধারণের মন জয় করার চেষ্টা করে তখন উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের যোগসূত্রগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া যখন বল্কান অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে তখন রাশিয়া স্লাভ জাতি এবং গ্রীক চার্চের ভিত্তিতে বল্কান রাষ্ট্রগুলির সাথে নিজের ঐক্যবোধ দৃঢ়তর

করার নীতি অবলম্বন করে। বল্কান দেশগুলির মত রাশিয়াও স্লাভ জাতির অন্তর্ভূক্ত এবং গ্রীক চার্চের অনুগামী। তাই স্লাভ জাতি ও গ্রীক চার্চকে কেন্দ্র করে রাশিয়া বল্কান রাষ্ট্রগুলির সাথে গভীর একাত্মবোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তান তেমনি ভাবে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে তাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মন জয় করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বে জাপান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের নামে ম্যাক্সমুলার ভবন স্থাপন করে বর্তমানে জার্মানী ভারতীয় জনসাধারণের সাথে বন্ধুত্বের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করছে।

একটি দেশের সরকার বা কোন একটি দল নিজস্ব নীতির সপক্ষে স্বদেশে বা বিদেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য অনেক সময় বিশেষ স্লোগান বা প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করে। স্লোগান ও প্রতীক অনেক ক্ষেত্রে প্রোপাগাণ্ডাকে বিশেষ ফলপ্রসূ করে তোলে। রেডক্রসের প্রতীক চিহ্ন দেখা মাত্র মানুষের মনে সহানুভূতির ভাব জেগে উঠে। কংগ্রেসের পক্ষে ভারতীয় জনমত গড়ে তোলার জন্য মহাত্মা গান্ধী চরকার সাহায্য গ্রহণ করেন। 'স্বস্তিকা' হিটলারকে আভ্যন্তরীণ প্রোপাগাণ্ডায় বিশেষ সাহায্য করে। ভারতে 'বন্দেমাতরম', বাংলাদেশে 'জয় বাংলা' ইত্যাদি স্লোগানের অবদান অসামান্য। তেমনি ভাবে কাস্তে হাতুড়ী চিহ্নিত লাল পতাকা কম্যুনিষ্টদের প্রোপাগাণ্ডার কাজে বিশেষ সাহায্য করে। অতএব সঠিক ভাবে স্লোগান এবং প্রতীক সৃষ্টি করে তাকে জনপ্রিয় এবং বিশেষ চিন্তাধারার সাথে জড়িত করে তুলতে পারলে প্রোপাগাণ্ডা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। অনেক সময় অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা কোন বিশেষ আন্দোলন বা চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবে কাজ করেন। গান্ধী, লেনিন, হিটলার, মুজিবুর রহমান এঁরা এই ধরণের নেতা। এই ধরণের নেতার সাথে প্রোপাগাণ্ডাকে জড়িত করতে পারলে প্রোপাগাণ্ডা সহজেই সাফল্য লাভ করতে পারে।

৩. বৈরীমূলক রাজনৈতিক তৎপর

বৈরীমূলক রাজনৈতিক কার্যের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতিকে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ কূটনীতি ও প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। কূটনীতির সাহায্যে একটি সরকার বিদেশী সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে এবং বৈদেশিক প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য হ'ল নিজের আদর্শ ও নীতির সপক্ষে অন্য রাষ্ট্রের জনমতকে গড়ে তোলা। কূটনীতি বা প্রোপাগাণ্ডা বলতে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ বুঝায় না। প্রোপাগাণ্ডার কাজ প্রকাশ্যেই সংঘটিত হয় এবং কূটনৈতিক আলোচনা জনসাধারণ ও অন্যান্য সরকারের কাছে গোপন রাখা হ'লেও সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে গোপন রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু বৈরীমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা বা Political Warfare-এর কাজ সম্পূর্ণ গোপনে পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করাই সেই কার্যের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ ঘোষণা না করে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তার ক্ষতি সাধন করার চেষ্টাকেই Political Warfare বলে। একটি দেশ যদি পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে বা বিদেশী রাষ্ট্রের কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে সেই দেশে বিদ্রোহ বা অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় তবে সেই কাজ Political Warfare বলে বিবেচিত হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি দেশ অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারে—শত্রু রাষ্ট্রের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল করে তোলা, সরকার-বিরোধী দলকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত এবং সাহায্য করা, নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থা এবং শিল্পোৎপাদন ব্যহত করা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করা ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কোন রাষ্ট্রের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য যদি একটি দেশ সেই রাষ্ট্রে রপ্তানী বন্ধ করে দেয় তবে সেই কাজকে Political Warfare বলেই গণ্য করা উচিত।

ইতিহাসে Political Warfare-এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী তাদের গোপন অনুচরদের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হ'ত তা ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বহু বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে সমর্থ হয়। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বলশেভিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিপ্লববিরোধী বিভিন্ন দল ও উপদলকে সমস্ত রকম সাহায্য দিতে থাকে এবং নিজেরাও সৈন্য পাঠায়। ইতিহাসে এই ঘটনা রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে War of Intervention নামে পরিচিত। এই সব কার্য Political Warfare-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলশেভিকরা রাশিয়ায় ক্ষমতা লাভ করে কমিণ্টার্নের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সংগঠন করার জন্য যে আয়োজন করে তাও Political Warfare নামেই বিবেচিত হ'তে পারে। জেনারেল ফ্রাঙ্কের নেতৃত্বে স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন হিটলারের জার্মানী ও মুসোলিনীর ইতালী বিদ্রোহীদের সাহায্য করে স্পেনের সরকারের বিরুদ্ধে Political Warfare-এ লিপ্ত হয়। হিটলারের প্ররোচনায় ও সাহায্যে অষ্ট্রিয়ার নাৎসী পার্টি 1934 খৃষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কিন্তু 1938 খৃষ্টাব্দে তারা সফলতা লাভ করে। এই ঘটনা Political Warfare-এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের সময় বৈরীমূলক রাজনৈতিক কার্যের তৎপরতা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং অনেক সময় বৃদ্ধি পায়। 1940 খৃষ্টাব্দে জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্সের যে পরাজয় ঘটে তাতে পঞ্চম বাহিনীর এক বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মিত্রশক্তিও যুদ্ধের শেষ দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নাৎসী-বিরোধী শক্তিকে সাহায্য দিয়ে জার্মানীকে দুর্বল করে তুলতে সমর্থ হয়। একদল নাগার অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে চীন ও পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে Political Warfare আরম্ভ করে। তারা নাগাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষা দিয়ে ভারতের এক প্রান্তে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা আরম্ভ করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেখানকার কোন কোন সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Political Warfare-এ লিপ্ত হওয়ার অনেক নজীর আছে। অধুনা (1953) জেনারেল আগাষ্টো পিনোচেতের নেতৃত্বে চিলিতে আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাতে মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা অনেকেই সন্দেহ করেন। নিজের আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং শত্রু মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রকে দুর্বল

করে রাখার জন্য শক্তিশালী দেশগুলি প্রয়োজন হ'লে এবং সুযোগ পেলে Political Warfare আরম্ভ করতে কোন দ্বিধা বোধ করে না।

বৈরীমূলক রাজনৈতিক তৎপরতাকে কূটনীতি বা প্রোপাগাণ্ডার মত স্বাভাবিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এই ধরণের তৎপরতা একমাত্র শত্রুমনোভাবাপন্ন রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য এবং বৈরীমূলক রাজনৈতিক কাজের ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। শত্রুমনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রের কোন এক বিক্ষুব্ধ দল বা গোষ্ঠীর সাহায্য ব্যতীত এই ধরণের কার্য সংগঠন করা সম্ভব হয় না।

4. অর্থনৈতিক কার্য

একটি দেশের উন্নতি ও শক্তি অনেক পরিমাণে অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশকেই অন্য দেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে হয়। অনেক সময় একটি দেশ বা দেশের পুঁজিপতিরা সম্ভব হ'লে অন্য দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিকতর লাভ করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে অনেক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের নীতি অনুসরণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন কারণ এবং উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ যে প্রধান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অর্থনীতি দ্বারাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, এই সব ক্ষেত্রে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রীয় নীতি গড়ে উঠে। আবার কোন কোন সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়। যে দেশ শত্রুভাবাপন্ন তার ক্ষতি করার জন্য এবং বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের উদ্দেশ্য একটি রাষ্ট্র বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে পারে। অর্থনীতি দ্বারা একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি বৈদেশিক নীতিকে সার্থক করে তোলার উপায় হিসাবেও রাষ্ট্র অর্থনীতির সাহায্য গ্রহণ করে[1]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার নীতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছে। এইসব সাহায্য ও ঋণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন, এখানে অর্থনীতিকে প্রধানতঃ "tool of foreign policy" হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত চার ভাগে বিভক্ত করে এখানে আলোচনা করা হ'ল :

(1) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(2) বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ
(3) সাম্রাজ্যবাদ
(4) অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ প্রদান।

1. "It (অর্থাৎ অর্থনীতি) is not only a determinant of foreign policy but also a tool of foreign policy." Vernon Van Dyke, *International Politics.*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

এমন অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে যা কোন কোন দেশ একেবারেই উৎপাদন করতে পারে না। সেই সব জিনিষ হয়ত,অন্য কোন দেশ উৎপাদন করতে পারে কিন্তু তা উৎপাদন করতে গিয়ে খরচ অনেক বেশী পড়ে যায়। আবার এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সেই সব জিনিষ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর দেশকে সেই সব সামগ্রী অন্য দেশ থেকে আমদানী করতেই হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশও যদি সেই সব সামগ্রী নিজেরা উৎপাদন না করে তৃতীয় শ্রেণীর দেশ থেকে আমদানী করে তবে তা সস্তায় পাওয়া যায় এবং ফলে ক্রেতা হিসাবে দেশবাসী লাভবান হয়। এই ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠে। মাটি, আবহাওয়া, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সব দেশের এক রকম নয়। এই সব প্রকৃতিগত পার্থক্য ছাড়াও বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। শিল্প দক্ষতা সব দেশের সমান নয়। ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন দেশ বিশেষ শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠে, যেমন স্থইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, অতীতে ঢাকার মসলিন কাপড় ইত্যাদি। কোন কোন দেশে মজুরীর হার অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পোন্নত দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। বৃটেনকে অন্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতেই হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'লেও অনেক সামগ্রী —যেমন চা, কফি, রবার, পশম, টিন, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, তামা—বিদেশ থেকে তাকে আমদানী করতে হয়। যে সব জিনিষ উৎপন্ন করার সর্বাধিক যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে একটি দেশ যদি কেবল সেই জিনিষ উৎপাদন করে এবং পরে তা রপ্তানী করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্য দেশ থেকে আমদানী করার চেষ্টা করে তবে অর্থনৈতিক ভাবে প্রত্যেক দেশই লাভবান হয়[1]।

---

1. এইক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীর খরচের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিদেশের সস্তা সামগ্রী দেশে আনার এবং দেশের সামগ্রী বিদেশে পাঠাবার ব্যয় কোন কোন দেশেরপক্ষে যেমন নেপাল—অত্যধিক হয়ে পড়ে। তা ছাড়া একটি দেশ কোন এক বিশেষ সামগ্রীর উৎপাদন যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেই চলে তবে শেষ পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম (Law of Diminishing Return) অনুযায়ী উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। অধিকতর উৎপাদনের জন্য নতুন খনিতে কাজ করতে হ'তে পারে বা নতুন ফ্যাক্টরী স্থাপন করার প্রয়োজন হ'তে পারে ইত্যাদি।

এই নীতি অনেকটা শ্রমবিভাগ নীতির (Division of labour) সাথে তুলনীয়। শ্রমবিভাগ নীতি অনুসরণ করার ফলে একটি দেশের মোট উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ বিশেষ দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন সবচেয়ে বৃদ্ধি পাবে। বিদেশ থেকে মাল আমদানীর উপর কোন বাধা আরোপিত না হ'লে সব দেশের লোকই সস্তায় দ্রব্য সামগ্রী কেনার সুযোগ পাবে। এই ধরণের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য (free trade) বলে।

অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ নীতি

সমস্ত পৃথিবীকে একটি 'ইউনিট' এবং বিভিন্ন দেশকে সেই ইউনিটের অংশ ধরে নিয়ে এই অবাধ বাণিজ্যের নীতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পৃথিবী অনেকগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং নিজেদের জাতির স্বার্থ পরিপোষণ এবং পরিবর্ধন করাই প্রত্যেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কথা বলা যেতে পারে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বার্থই সুরক্ষিত হয়। কারণ প্রত্যেক দেশের লোকই সস্তায় দ্রব্য সামগ্রী কেনার সুযোগ পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয় এবং সস্তায় জিনিষ কেনার সুযোগ পেলেই একটি দেশের জাতীয় স্বার্থ সব বিষয়ে সুরক্ষিত হয় না। এমন অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনীতি প্রকৃতির নিয়মে একটি বা দুইটি জিনিষের উপর বেশী নির্ভরশীল। ব্রাজিল কফির উপরই বিশেষ নির্ভর করে, কিউবা চিনির উপর, মালয়েশিয়া রবার ও টিনের উপর, বাংলাদেশ পাটের উপর ইত্যাদি। কোন কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এই সব জিনিষের মূল্য যদি হ্রাস পায় তবে এই সব দেশ চরম অর্থনৈতিক দুর্গতির সম্মুখীন হবে। তাই নিজেদের স্বার্থের জন্য এই সব দেশ স্বভাবতঃই একটি বা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করে। যে সব জিনিষ উৎপাদন করার সুযোগ সুবিধা ও দক্ষতা অন্য দেশ অপেক্ষা কম সেই সব জিনিষও দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে উৎপাদন করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। শত্রু দেশের সাথে তখন ব্যবসায় করা সম্ভব নয় এবং অন্য দেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী আনাও অসুবিধাজনক হতে পারে। অতএব নিজের দেশে প্রয়োজনীর দ্রব্য সামগ্রী

যত বেশী উৎপাদন করা যায় সেই দিকে প্রত্যেক দেশের লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি যদি অবাধ বাণিজ্যের খাতিরে শিল্পোন্নতির চেষ্টা না করে তবে জাতীয় শক্তির (national power) দিক থেকে তারা সব সময়ই শিল্পোন্নত দেশগুলির পিছনে পড়ে থাকবে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সব রাষ্ট্র নিজেদের দেশকে উন্নত করে তুলতে চায় তাদের পক্ষে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক রীতিনীতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা সম্ভব নয়। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দেশের বহির্বাণিজ্যের উপরও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই প্রসারিত হয়। সকলের জন্য কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দেশে এমন শিল্প গড়ে তোলারও প্রয়োজন দেখা দেয় যে ক্ষেত্রে সেই দেশের কোন স্বাভাবিক দক্ষতা নেই। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রপ্তানীর উপর নির্ভর করে যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে তাতে খুব কম সংখ্যক নাগরিকেরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের নিয়ম ভঙ্গ করেও অন্য শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিদেশ থেকে সস্তায় জিনিষপত্র আমদানী করার সুযোগে থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থের জন্য অনেক সময় নিজের দেশের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) বিরুদ্ধে যাঁরা এই সব যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁরা সংরক্ষণ নীতির (Protection) পক্ষপাতী। তাঁরা অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা থেকে বিভিন্ন ধরণের জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করতে চান। প্রথমোক্ত দল (অবাধ বাণিজ্য) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক যুক্তির উপর তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় দলের (সংরক্ষণ) যুক্তি প্রধানতঃ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংরক্ষণ নীতিকে সাধারণতঃ economic nationalism অথবা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বলা হয় এবং অবাধ বাণিজ্যের নীতি economic internationalism বা অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদ নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠ করার সময় জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয়তাবাদের গুরুত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা উচিত নয়। কারণ তা হ'লে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হয়। এই কথা সত্য যে কোন দেশের

পক্ষেই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব নয় এবং তাই প্রত্যেক দেশকেই কমবেশী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তবে নাৎসী জার্মানীর মত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মনির্ভরশীল (জার্মানীর সেই নীতি 'Autarkie' বলে পরিচিত ছিল) হওয়ার নীতি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং সাধারণতঃ সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংরক্ষণবাদীরা তাঁদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাঁরা অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক তাঁরাও শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের স্বার্থের খাতিরেই সেই মতবাদ সমর্থন করেন কিনা সেই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। যে দেশ অর্থ নৈতিক ভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সেই দেশের স্বার্থ ই সবচেয়ে বেশী সুরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা। শিল্প বিপ্লবের পরে ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য সমর্থন করে। তখন ইংলণ্ডই ছিল অর্থ নৈতিক ভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, কারণ ইংলণ্ডেই প্রথম শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হয়। তখন অবাধ প্রতিযোগিতাই ছিল ইংলণ্ডের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল কোন দেশ কখনও অবাধ বাণিজ্যের নীতিকে সমর্থন করে নি। যাই হোক সংরক্ষণের সমর্থকরা কি ভাবে জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করতে চান এবং অবাধ বাণিজ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে সেই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

সংরক্ষণের উপায়

বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র অনেক সময় জাতীয় স্বার্থে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কূটনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিকে বাধা প্রদান করে। রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া অনেক সময় শিল্পপতিরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। যে সব পদ্ধতিতে সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হ'ল।

শুল্ক (tariff)

আমদানী বা রপ্তানীর উপর কর (duty বা tariff) স্থাপন করা হ'লে আমরা তাকে বাণিজ্য শুল্ক বলি। রপ্তানীর উপর কর বিশেষ কোথাও নেই। আমদানীর উপর দুই কারণে কর ধার্য করা যেতে পারে— রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। প্রথম উদ্দেশ্যে বাণিজ্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে রাজস্ব কর (revenue tariff) এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যে কর স্থাপন করা হয় তাকে সংরক্ষণ কর (protective tariff) বলে। দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়াতে দেশী জিনিষ যদি বিদেশী দ্রব্যের মত কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তখন অনেক সময় বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসান হয়ে থাকে। এই সংরক্ষণ শুল্ক বসাবার ফলে বিদেশী জিনিষের দাম বৃদ্ধি পায় এবং তখন দেশী জিনিষ বিক্রয় করা সম্ভব হয়। বিদেশী কোন দ্রব্যের উপর এই শুল্ক অধিক হারে ধার্য করে সেই জিনিষের আমদানী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। সংরক্ষণ কর সাধারণতঃ রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই বিদেশী দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয়। দেশীয় শিল্প যদি প্রসার লাভ করে তবে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক শক্তি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। বিলাস দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করার অথবা বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করতে পারে। এই শুল্ক স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক সময় নানা ধরণের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির শিল্পায়নের জন্য এই নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই সব দেশে একটি বিশেষ শিল্প গড়ে উঠার বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শক্তিমান বৈদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য তা অনেক সময় দাঁড়াতে পারে না। এই ক্ষেত্রে দেশীয় শিশু শিল্পকে শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য (infant industries argument)। কিন্তু এই কথাও মনে রাখা উচিত যে সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীকে অধিক দাম দিয়ে জিনিষপত্র ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে এমন জাতীয় শিল্পকেই সংরক্ষণ করা উচিত যা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হবে। উপরি-উক্ত যুক্তিকে সরল ও সুন্দর ভাবে বুঝাবার

জন্য বলা হয়—Nurse the baby, protect the child, free the adult. চিরদিনই যদি একটি শিল্পকে সংরক্ষণের জন্য বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বজায় রাখতে হয় তবে অন্ততঃ অর্থনীতির বিচারে তা কখনও সমর্থন করা যায় না। তবে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বলা যেতে পারে যে, যে সব শিল্প রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই সব ক্ষেত্রে ক্রেতা হিসেবে দেশবাসীর লাভ লোকসানের প্রশ্ন প্রধান বিচার্য বিষয় হ'তে পারে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে দেশের শিল্পপতিরা জাতীয় স্বার্থের নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই রাষ্ট্রের কাছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবী করে থাকে। সংরক্ষণ শুল্ক যদি চিরস্থায়ী হয়ে উঠে তবে জাতীয় শিল্প ধীরে ধীরে দক্ষতা অর্জন করে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার কোন চেষ্টাই করে না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন, বিশেষ শিল্পের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তত্ত্বগত ভাবে সংরক্ষণ নীতি ভাল কি খারাপ, সেই প্রশ্ন অনেকটা অবান্তর—সবই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক অবস্থা, দেশের অর্থনীতি ও বিশেষ শিল্পের গুরুত্বের উপর।

সরকারী সাহায্য (Subsidy)

সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন না করে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার আর একটি উপায় হ'ল সেই সব শিল্পকে সরকারী সাহায্য বা subsidy দেওয়া। বিদেশী জিনিষের দামে বিক্রয় করতে গেলে দেশীয় শিল্পের যে ক্ষতি হয় সেই অনুপাতে অর্থ যদি সরকার দেশীয় শিল্পকে সাহায্য বাবদ প্রদান করে তবে দেশীয় শিল্পের পক্ষে বিদেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থার ফলে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু দেশবাসীর উপর করের বোঝা বাড়তে বাধ্য, কারণ দেশবাসীর থেকে কর আদায় করেই রাষ্ট্র দেশীয় শিল্পকে অর্থ সাহায্য প্রদান করতে পারে। এমন কিছু শিল্প আছে যার প্রসার শুল্ক স্থাপন করে সম্ভব নয়, সরকারী সাহায্যেই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত (merchant marine) প্রসারের জন্য সরকারকে সাহায্য দিতে হয়েছে—শুল্ক স্থাপন করে তা সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ককে যদি আমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা মনে

করি তবে সরকারী সাহায্যকে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা যায়[1]। সরকারী সাহায্যের ফলে দেশীয় শিল্প বিদেশে সস্তায় জিনিষ পত্র বিক্রী করার সুযোগ পায়। এই নীতির চরম রূপকে ডাম্‌পিং (Dumping) বলা হয়।

ডাম্‌পিং (Dumping)

একটি জিনিষ স্বদেশে যে দামে বিক্রী করা হয় বিদেশে রপ্তানী করে সেখানে তার চেয়ে সস্তায় বিক্রী করার প্রথাকে dumping বলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয় এবং জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বড় বড় কোম্পানী এই ধরণের ব্যবসায় আরম্ভ করে। পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের কিছু সংখ্যক শিল্পপতিরাও এই পথ অবলম্বন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বহু দেশে এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হয়।

এই ধরণের ব্যবসায় করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কোন জিনিষের উৎপাদন যদি খুব বেশী হয়ে স্বদেশে গুদামজাত অবস্থায় পড়ে থাকে তবে বিদেশে রপ্তানী করে তা সস্তা দামে বিক্রী করা যেতে পারে। কোন একটি নতুন জিনিষকে বিদেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রথমদিকে তা খুব সস্তায় বিক্রী করার প্রয়োজন হ'তে পারে। তা ছাড়া বিদেশের বাজারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার জন্যও এই ধরণের ব্যবসায় অনেক ক্ষেত্রে আরম্ভ করা হয়েছে। যে দেশ এই ভাবে সস্তায় বিদেশে মাল রপ্তানী করে সেই দেশে স্বভাবতঃই উৎপাদন কার্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলে বেকার সমস্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে দেশে এই ভাবে রপ্তানী করা হয় সেই দেশের জনসাধারণ সস্তায় মাল পায় বটে কিন্তু দেশের অর্থনীতির দারুণ ক্ষতি হ'তে পারে। বিদেশ থেকে সস্তায় মাল আসাতে দেশীয় শিল্প তার সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না এবং সেই সব জিনিষ দেশের যে সকল কলকারখানায় প্রস্তুত হয় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোন দেশই সরকারের সাহায্য (subsidy) ছাড়া বেশী দিন ধরে dumping চালিয়ে যেতে পারে না।

---

1. "A subsidy may be thought of as a weapon of offense in international economic rivalry or warfare, whereas a protective tariff is a defensive weapon." Carroll and Marion Daugherty, *Principles of Political Economy* Vol.II

আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স প্রথা
(Quotas and Licenses)

সরকার প্রয়োজন মনে করলে প্রত্যক্ষ ভাবে আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে পারে। প্রত্যেক দেশ থেকে আমদানীর পরিমাণ পৃথক পৃথক ভাবে অথবা সমগ্র ভাবে আমদানীর পরিমাণ সরকার অনেক সময় সীমিত করে দেয়। আমদানীর পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে—জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে সমতা রক্ষা করা, বিদেশী মুদ্রা অধিক পরিমাণে অর্জন করা ইত্যাদি। লাইসেন্স প্রথা চালু করে সরকার আমদানীর উপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক আমদানীর জন্য সরকারের অনুমতি বা লাইসেন্স নিতে হয় এবং সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে লাইসেন্স প্রদান করে। যুদ্ধের সময় ছাড়া সাধারণতঃ কোন সরকার রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না। কোন নিরপেক্ষ দেশ অধিক আমদানী করে তা যাতে আবার শত্রু দেশের কাছে পাঠাতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় রপ্তানীর পরিমাণও অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শত্রুমনোভাবাপন্ন দেশের সাথে সরকার যে কোন সময় ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে পারে—কোন বিশেষ জিনিস বা সমস্ত রকম জিনিষের রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়া যায় (embargo) এবং সেই ভাবে আমদানীও নিষিদ্ধ করা যেতে পারে (boycott)। এই embargo এবং boycott সরকার ঘোষণা করতে পারে আবার অনেক সময় জনসাধারণ নিজেরাই সেই ধরণের আন্দোলন আরম্ভ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী বয়কট করার আন্দোলন আরম্ভ করে। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক অভিযান আরম্ভ করার পর চীনে জাপানের বিরুদ্ধে এই বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ জাপানী জিনিষ বয়কট করার পক্ষে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। যুদ্ধের পর কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য মার্কিন সরকার ও মার্কিন জোটের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন দেশ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

সরকারের ক্রয় নীতি অনেক সময় স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য এবং বিদেশী জিনিষকে আংশিক ভাবে এবং পরোক্ষ উপায়ে বয়কট করে। 1933 খৃষ্টাব্দে মার্কিন সরকার এক আইন পাশ করে স্থির করে যে কয়েকটি বিশেষ ব্যতিক্রম

ছাড়া সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত জিনিষপত্র ক্রয় করবেন। স্বদেশী জিনিষ ক্রয় করার এই নীতির (Buy American Policy) ফলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, মার্কিন শিল্পের সুবিধা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়েছে।[1]

বৈদেশিক মুদ্রার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। রপ্তানীর মাধ্যমে একটি দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং আমদানী করার সময় সেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা। বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে রাষ্ট্র একটি দেশের আমদানী নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেই অবস্থায় আমদানী করার সময় ব্যবসায়ীকে সরকারের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে হয় এবং সরকার বিশেষ জিনিষ নির্দিষ্ট পরিমাণে আমদানী করার জন্যই বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে থাকে। এই ভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে সরকার জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করতে পারে এবং দেশের পুঁজি যাতে বিদেশে চলে না যায় তার ব্যবস্থা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ

অনেক সময় সরকার নিজেই প্রত্যক্ষ ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে (State Trading)। সাধারণত: বিশেষ প্রয়োজনে এবং কয়েকটি বিশেষ জিনিষের ক্ষেত্রেই সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হয়। তখন সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ সহ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং প্রয়োজন হ'লে একটি দেশ তখন আমদানী-

1. এই নীতি সম্বন্ধে বৃটেনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ আল্ডরিচ (Winthrop W. Aldrich) আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। তিনি বলেন: "In my opinion there is one element in our policy that is clearly archaic. I am sure that it adds to the cost of our Government. It certainly decreases the opportunities for other countries to earn their way. It obviously runs counter to the principle of fair business competition. It is regularly cited abroad as one more indicanion that the Uuited States is not prepared to act as a good creditor. I am convinced that it is totally unnecessary as a support to American industry." এই বক্তৃতা আমেরিকার Department of State Bulletin (29 জুন 1953)-এ প্রকাশিত হয় এবং Norman J. Padelford কর্তৃক সম্পাদিত *Contemporary International Relation Readings Third Series*-এ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রপ্তানী নীতির মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অর্থনৈতিক মন্দা (economic depression) যখন প্রবল হয়ে উঠে এবং ভয়ংকর রূপ নেয় তখন অনেক দেশের সরকার বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের পরেও বিভিন্ন কারণে—বৈদেশিক মুদ্রার অল্পতা, উৎপাদন যন্ত্র ও মাল সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি, বিভিন্ন জিনিষের অভাব রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বজায় থাকে। কম্যুনিষ্ট দেশে রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়।

বিশেষ সামগ্রী সম্বন্ধে বিভিন্ন সকারের মধ্যে চুক্তি (Inter-governmental Commodity Agreement)

অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। একটি জিনিষের দাম বাজারে যাতে খুব কমে না যায় সেইদিকে ব্যবসায়ীরা স্বভাবতঃই নজর রাখে। যে সব দেশ একটি বা দুইটি বিশেষ দ্রব্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল (যেমন ব্রাজিল কফির উপর, কিউবা চিনির উপর, বাংলাদেশ পাটের উপর নির্ভরশীল) সেই সব দেশের পক্ষে এই সমস্যা খুবই গুরুতর। সেই বিশেষ জিনিষের মূল্য বাজারে খুব কমে গেলে সেই দেশ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যে সব জিনিষ বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হয় আন্তর্জাতিক বাজারে তার দাম একটি দেশের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। দাম বাড়াবার জন্য একটি দেশ যদি সেই জিনিষের রপ্তানী কমিয়ে দেয় বা উৎপাদন হ্রাস করে তবে অন্য দেশ হয়ত সেই জিনিষের উৎপাদন ও রপ্তানী বাড়িয়ে দেবে। সেই কারণে বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে একটি চুক্তির প্রয়োজন হয়। সেই চুক্তিতে একটি বিশেষ জিনিষ একটি দেশ কি পরিমাণ উৎপাদন করবে বা রপ্তানী করবে তা স্থির করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কোন দেশই যাতে একেবারে অপসারিত না হয়, প্রত্যেক দেশই যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের একটা বিশেষ অংশ লাভ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে চিনি, চা, কফি, টিন, রবার, গম ইত্যাদি জিনিষ সম্বন্ধে

বিভিন্ন সরকারের মধ্যে এই ধরণের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে এই রকম সরকারী চুক্তির কোন প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনীতি বিশেষ একটি বা দুইটি খনিজ বা কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণেই এই চুক্তি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর কোন দেশের অর্থনীতিই সেইভাবে একটি শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেই শিল্পপতির সংখ্যা কম থাকে এবং প্রয়োজন হ'লে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করে নিতে পারে (যমন কার্টেল—পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে) কিন্তু কৃষিকার্যে এত বেশী সংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকে যে তাদের পক্ষে সরকারের সাহায্য ছাড়া কোন চুক্তি করা সম্ভব নয়।

কোন বিশেষ সঙ্কট সময়ে এই ধরণের চুক্তি প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়, তবে এই সব চুক্তি যাতে চিরস্থায়ী রূপ না নেয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

শত্রুকে বঞ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ক্রয় (Pre-emptive Buying)

সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে বা শান্তির সময়েও শত্রুমনোভাবাপন্ন দেশের বিরুদ্ধে এই নীতি অবলম্বন করা হয়। শত্রু বা শত্রুমনোভাবাপন্ন দেশ যাতে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দেশগুলি থেকে সেই সমস্ত জিনিষ ক্রয় করে নিতে পারে। এই ক্রয়ের কোন ব্যবসায়গত উদ্দেশ্য নেই ; শত্রুকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করাই একমাত্র লক্ষ্য। তাই যুদ্ধ বা বিশেষ সঙ্কট ছাড়া এই নীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। এই নীতি অনুযায়ী ক্রয় করা আরম্ভ করলে সেই সব জিনিষ পত্রের দাম অনেক বেড়ে যায় কিন্তু শত্রুকে দুর্বল করার পক্ষে এই নীতি খুবই কার্যকরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পেন, পর্তুগাল ও বাল্টিক এবং বল্কান অঞ্চল থেকে জার্মানী এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্র খুব বেশী মূল্য দিয়েও কিনে নেয়। পরে অবশ্য মিত্রশক্তিও এই নীতি অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক কার্টেল (International Cartels)

একই ব্যবসায়ে বা একই ধরণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য কার্টেল সৃষ্টি করে

থাকে। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কার্টেলও স্থাপন করে। Charta (অর্থাৎ চুক্তি) কথাটি থেকে cartel শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। একই রকম ব্যবসায়ে পরস্পরের সাথে যারা প্রতিযোগিতা করে তাদের সকলের অথবা অধিকাংশের সম্মতি ছাড়া কার্টেল সৃষ্টি হতে পারে না। বাজারে নিজেদের একচেটিয়া প্রভাব স্থাপন করাই কার্টেলের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন ভাবে তারা নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে—কখনও জিনিষের মূল্য এবং কখনও উৎপাদনের পরিমাণ তারা নিজেরা স্থির করে নেয়। অনেক সময় নিজেদের ভিতর তারা বাজার ভাগ করে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

যদিও কার্টেলের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেক পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে তবুও আধুনিক কার্টেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মানীতেই প্রথম বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। বর্তমান যুগে সব দেশেই কার্টেলের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন যে কার্টেল স্থাপিত হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার সুযোগ পায়। কার্টেলের মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করা সহজ। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রমুখ দেশে কার্টেলের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হয়েছে।

বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ

একটি দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন অপরিহার্য। সেই মূলধন দেশবাসীর সঞ্চয় থেকে সৃষ্টি হতে পারে। আবার বিদেশ থেকেও আসতে পারে। পৃথিবীর সব দেশে শিল্প বিপ্লব এক সময়ে আরম্ভ হয় নি। প্রথমে বৃটেনে আরম্ভ হয় এবং পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। শিল্পে ও বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির পক্ষেই অধিক পরিমাণে মূলধন সৃষ্টি করা সম্ভব এবং সেই মূলধন তারা কেবল নিজেদের দেশে বিনিয়োগ করে নি, বিদেশে বিনিয়োগ করে অধিকতর মুনাফা লাভের চেষ্টাও করেছে। অনুন্নত দেশে শ্রমের মূল্য কম এবং তাই সেই সব দেশে মূলধন বিনিয়োগ করে অধিকতর লাভ করা সম্ভব। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রথাও আরম্ভ হয়। বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করার কাজে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে

এই বিষয়ে হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ড বিদেশে মূলধন নিয়োগের কাজে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় সেই সময় ইংলণ্ডের জাতীয় সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিদেশে বিনিয়োগ করা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বিদেশে মূলধন রপ্তানী করতে আরম্ভ করে।

ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশে উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষ ভাবে মূলধন বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করে, আবার কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশী সরকারকে ঋণ দেওয়ার নীতিও বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে। বৃটেন প্রত্যক্ষ ভাবে বিদেশে এমন সব উৎপাদন কার্যে মূলধন নিয়োগ করে যার ফলে বৃটেনের নিজের দেশের শিল্প সহজেই যথেষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহ করে প্রসার লাভ করতে সমর্থ হয়। ফ্রান্স বিদেশী সরকারকে ঋণ দেওয়ার নীতি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে এবং এই ধরণের বিনিয়োগের সাথে ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি অনেক সময় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রাশিয়াকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

বিদেশে মূলধন নিয়োগ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অধিকতর মুনাফা লাভ করা কিন্তু তার ফলে বিদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শি ও রেল রাস্তার দ্রুত উন্নতি ইউরোপীয় দেশের মূলধনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। পরে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগের ফলে কানাডা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির এবং মধ্য প্রাচ্যের তৈল শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাসে বৃটিশ মূলধনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট ও চা উৎপাদন, রেলরাস্তা নির্মাণ ও যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন পথঘাটের উন্নতি, বড় বড় ষ্টীমার ও জাহাজ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুত, ট্রাম ও গ্যাস কোম্পানী এবং বিভিন্ন শিল্পের বড় বড় কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ মূলধন ভারতের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক লাভের জন্য বিদেশে মূলধন নিয়োগ করার সাথে সাম্রাজ্যবাদের নিকট সম্পর্ক বর্তমান। একটি রাষ্ট্র বিদেশে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করে সেই দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। সুবিধা হ'লে সেই দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয় এবং তা সম্ভব না হ'লে সেই দেশের সরকারের নীতিকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ বৃটিশ

সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, কিন্তু চীনে একই সাথে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্র উপস্থিত থাকায় চীনের স্বাধীনতা আইনতঃ অক্ষুণ্ণ থাকে যদিও বৈদেশিক চাপে চীনের সার্বভৌমত্ব আসলে শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হয়। মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার মূলধন-বিনিয়োগ, পরে (রুশ-জাপান যুদ্ধের পর) সেই অঞ্চলে জাপানের মূলধন রপ্তানী, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বল্কান ও মধ্য প্রাচ্য অঞ্চলে জার্মানীর পুঁজি বিনিয়োগ—এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মূলধন বিনিয়োগের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক খুবই প্রকট। তবে মনে রাখা উচিত যে বিদেশে মূলধন নিয়োগের সাথে সাম্রাজ্যবাদের কার্যকারণ কোন সম্পর্ক নেই। সামরিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলেই একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। সেই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণ লাভ করে। কেবলমাত্র বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করার জন্যই একটি দেশ পরাধীন হয় না। অনেক শক্তিশালী ও স্বাধীন দেশও অর্থনৈতিক কারণে বিদেশ থেকে মূলধন আমদানী করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা বিদেশে মূলধন নিয়োগের পক্ষে যে রকম সহায়ক ছিল বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে মহাযুদ্ধের পর থেকে, তা আর নেই। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান না থাকার ফলে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিদেশে নিযুক্ত মূলধন থেকে প্রাপ্য মুনাফা দেশে নিয়ে আসাই এক সমস্যায় পরিণত হয়। তা ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ এবং শিল্প জাতীয়করণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ আর তেমন নিরাপদ থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে মর্যাদা ছিল বিংশ শতাব্দীতে তা আর নেই। 1953 খৃষ্টাব্দে পারস্য বৃটিশের তৈল কোম্পানী (Anglo-Iranian Oil Company) এবং 1956 খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে। বিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক কোম্পানী জাতীয়করণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রুশ বিপ্লবের পরে নতুন বলশেভিক সরকার পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের যুগে বিদেশে মূলধন নিয়োগ সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদের যুগও মোটামুটি ভাবে শেষ হয়ে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনের বৈদেশিক মূলধনের একটা বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে বৃটেন বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যায়। এই অর্থনৈতিক কারণে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যও দ্রুত ধ্বংস হয়ে হয়ে যায় এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু স্বাধীন দেশের উদ্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করার পক্ষে যে নিরাপদ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা শেষ হয়ে যায়। নতুন স্বাধীন দেশগুলির রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বৈদেশিক বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল নয়। তাই বিদেশের শিল্পপতিরা এই সব রাষ্ট্রে পুঁজি বিনিয়োগ করা নিরাপদ মনে করে না। এই সব রাষ্ট্রের সরকার এবং জনসাধারণও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের পক্ষপাতী নয়। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে এই সব নতুন রাষ্ট্র এই ধরণের বিনিয়োগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের কালোছায়া দেখতে পায়। তবে সরকারী পর্যায়ের বৈদেশিক ঋণ ও মূলধন গ্রহণ করা এই সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথম দিকে বিশেষ প্রয়োজন বলে সকলেই স্বীকার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নই এই ঋণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করতে সক্ষম। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি ছাড়া ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশগুলির পক্ষেও বিশ্বযুদ্ধের পর বৈদেশিক সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সরকারী পর্যায়ে বৈদেশিক ঋণ প্রদান ও গ্রহণের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়।

সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ কথাটি আমাদের খুবই পরিচিত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিজ্ঞান-সম্মত কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ওয়েবষ্টারের অভিধান অনুযায়ী সাম্রাজ্য-বাদের অর্থ হ'ল "the policy, practice or advocacy of seeking to extend the control, domination or empire of a nation." মোটা-মুটি ভাবে আমরা বলতে পারি যে একটি দেশ নিজের স্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশ বা সঙ্কুচিত করে তার উপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব যখন স্থাপন করার চেষ্টা করে তখনই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। একটি দেশ অন্য

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয় কিন্তু সেই প্রভাবের সাথে সাম্রাজ্যবাদের কোন সম্পর্ক নেই। অন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট বা সঙ্কুচিত করাই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। Charles Hodges তাঁর *The Background of International Relation* বইতে সাম্রাজ্যবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে "It involves the imposition of control—open or covert, direct or indirect—of one people by another." অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বলতে অন্য দেশের স্বাধীনতার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বুঝায়। ভারতের স্বাধীনতা বিনষ্ট করেই এখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠে। ভারতের মত চীন পরাধীন না হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নানাভাবে সঙ্কুচিত হয়। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অনুন্নত দেশের উপরই সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়ে থাকে। কিন্তু Parker T. Moon সাম্রাজ্যবাদকে যখন অ-ইউরোপীয় দেশের উপর ইউরোপীয় দেশের প্রভুত্ব বলে বর্ণনা করেন তখন তা মেনে নেওয়া কঠিন।[1] একমাত্র ইউরোপেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সীমাবদ্ধ তা মনে করার কোনই কারণ নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপানের নীতিকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর ইস্‌লামিক সাম্রাজ্য ইউরোপের এক অংশেও বিস্তার লাভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট ও সঙ্কুচিত করেই হিটলার তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। নানা পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করা চলে এবং সরকারের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও চেষ্টা ছাড়াও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হতে পারে। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিক কোম্পানীগুলি যখন প্রাচ্যে ব্যবসায় আরম্ভ করে তখন সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন পরিকল্পনা তাদের মধ্যে ছিল না। আবার সরকারের চেষ্টায় সুপরিকল্পিত ভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদাহরণও ইতিহাসে বহু পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এত পরস্পর বিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে যে কোন সংজ্ঞাই বোধ হয় সকলের স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হবে না। কোন

---

1 "Imperialism......means domination of Non-European native races by totally dissimilar European nations." Parker T. Moon, *Imperialism and World Politics.*

বিশেষ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টাই বিজ্ঞানসম্মত। পৃথিবীতে বহু যুগ ধরেই সাম্রাজ্য প্রচলিত আছে এবং এই সাম্রাজ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধরণের সাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেই সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা উচিত। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা যদি কোন বিশেষ যুগের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কেবলমাত্র প্রযোজ্য হয় তবে তাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করা যায় না। কোন পণ্ডিতের সংজ্ঞা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয় নি ; সাম্রাজ্যবাদের গতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা স্থির করতে হবে। এই সংজ্ঞা নির্ণয় করার সময় সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক বিচার করা অসঙ্গত। সাম্রাজ্যবাদ কথাটি শোনার সাথে সাথে আমাদের মনে এক ধরণের ঘৃণা ও আক্রোশের ভাব উদয় হয়। কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের সাথে উপনিবেশবাদের (colonialism) অনেক সময় পার্থক্য করা হয়। একটি দেশের লোক যখন অন্য দেশে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে এবং সেই দেশকে নিজেদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করে তখন সাধারণতঃ আমরা তাকে উপনিবেশ বলে থাকি। উপনিবেশের সাথে মাতৃভূমির সম্পর্ক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকে। উপনিবেশ অনেকটা নিজের দেশেরই স্বাভাবিক বিস্তার। Hobson-এর ভাষায় : "Colonialism, in its best sense, is a natural outflow of nationality." (J. A. Hobson. *Imperialism : A Study*) জনবিরল দেশে সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই উপনিবেশ স্থাপন করা যায়। উপনিবেশ বলতে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন বোঝায়—ইংরাজরা যেমন অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য আরও অনেক ব্যাপক এবং তা সামরিক অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে অনেক বেশী জড়িত।[1] সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেই পার্থক্যের বিশেষ কোন মূল্য নেই। ইংরেজীতে imperialism এবং colonialism

---

1 সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পার্থক্য করতে গিয়ে Winslow বলেন যে "Imperialism quite properly suggests something more organized, more military, more self-consciously aggressive......" E. M. Winslow. *The Pattern of Imperialism.*

অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে আজকাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন জনশূন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করা হয় নি। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ইংরাজরা যখন উপনিবেশ স্থাপন করে তখন সেই সব দেশের আদিম অধিবাসীদের পক্ষে তা সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উপনিবেশ ও মাতৃভূমির সম্পর্ক যে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামই (13টি উপনিবেশ সেই সংগ্রাম আরম্ভ করে) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অধীনস্থ সাম্রাজ্যে অনেক সময় একটি দেশের বহু সংখ্যক লোক গিয়ে বসবাস করে তাকে উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করে। চীন দেশের বহু লোক তিব্বতে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজা রামমোহন রায় ইংরাজদের ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী রূপে বসবাস করে এই দেশকে উপনিবেশ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অতএব সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে খুব পরিষ্কার ভাবে কোন পার্থক্য রেখা টানা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য

পৃথিবীর কোন দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় নি। বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং মনোভাব একই সাথে সক্রিয় থাকে। আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যের প্রভাবকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পরে আলোচনা করে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি প্রথম উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের নিকট সম্পর্ক অনেকেই স্বীকার করেছেন। সাম্রাজ্য স্থাপন করে নিজের দেশের মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রবণতা জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিহিত আছে। নিজের দেশের পতাকা বিদেশে স্থাপন করে, নিজের দেশের ভাষা, সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রসারিত করে জাতীয়তাবাদী মন অনেক সময়ই সন্তোষ লাভ করে। তাই দেখা যায় যে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। Hans Kohn তাঁর *Nationalism and Imperialism in the Hither East* বইতে লিখেছেন: "The imperialism and nationalism are interlocked." উগ্র জাতীয়তাবাদ বা racialism সহজেই সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করে।

জার্মানীর নাৎসী দল তথাকথিত দুর্বল জাতির উপর জার্মানীর প্রভুত্ব স্থাপন করার স্বাভাবিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিল। অনেক দেশই মনে করে যে বিশ্বে তার একটি 'মিশন' আছে এবং সেই 'মিশন' অনেক সময়ই সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)-এর জীবন সংগ্রাম (struggle for existence), জীবন সংগ্রামে শক্তিশালীর জয়লাভ (survival of the fittest) ইত্যাদি ধারণাগুলি অনেকে মানব সমাজ এবং ইতিহাসে প্রয়োগ করে প্রচার করতে থাকে যে দুর্বল জাতির উপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভুত্ব স্থাপনই প্রগতির স্বাভাবিক নিয়ম।[1] জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনায় দেশের গরীব জনসাধারণও অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে অর্থনৈতিক ভাবে দেশের ধনিক ও শাসক শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই বিশেষ সুবিধা লাভ করে কিন্তুআপামর জনসাধারণ জাতীয়তাবাদের প্রভাবে তা সক্রিয় ভাবে সমর্থন করে চলে। গণতন্ত্র প্রসারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারকে তারা অনেক সময় সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়। Raymond L. Buell তাঁর *International Relations* পুস্তকে লিখেছেন যে "pure nationalism has forced governments into the path of imperialism." কোন কোন লেখক গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টাও করেছেন। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী দেশের নাগরিক হয়ে জাতীয়তাবাদী মন বিশেষ তৃপ্তি লাভ করে। জাতির মর্যাদায় জাতীয়তাবাদীরাও গর্বিত হয়ে উঠে।

এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পূর্বেই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আলেকজেণ্ডারের মত রাজা তাঁর শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইসলাম জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়েই অতি দ্রুততার সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। প্রাচীন যুগে রোমান সাম্রাজ্যের মত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অতএব জাতীয়তাবাদ ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয় না সেই কথা মনে করার কোন কারণ নেই।

(খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস ছাড়া দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যও অনেক সময় একটি রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়।

1. ডারউইন নিজে কখনও তাঁর মতবাদকে এ ভাবে প্রয়োগ করেন নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড দাবী করে। এই ভূখণ্ডে জার্মানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাই এই দাবীকে সাম্রাজ্যবাদী দাবী বলে আখ্যায়িত করা অসঙ্গত নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি অনুযায়ী মিত্র শক্তি অবশ্য এই দাবী অগ্রাহ্য করে। যাই হোক ফ্রান্স যে তার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই এই দাবী করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। জাপানের কুরাইল (Kurile) রুকু (Ryukyu) প্রভৃতি দ্বীপ অধিকারের পিছনেও আত্মরক্ষার তাগিদই প্রধান। দেশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডের কিয়দংশ অধিকার করে। ক্যারিবিয়ান (Caribbean) অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও এই যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বৃটেন তার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য জিব্রল্টার, মাল্টা, সাইপ্রাস, এডেন প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে।

(গ) জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি

প্রত্যেক রাষ্ট্রই জাতীয় স্বার্থের খাতিরে—জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য, দেশবাসীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাবার জন্য—জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। সাম্রাজ্য স্থাপন করা এই জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায়। সামরিক অথবা অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে একটি দেশ তার শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি করতে পারে। সাম্রাজ্য থেকে কাঁচামাল এবং বিভিন্ন উপকরণ জোগাড় করে একটি ক্ষুদ্র দেশও কি ভাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে পারে বৃটেনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাম্রাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। আধুনিক যুগে যুদ্ধপদ্ধতি ও রণকৌশল সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এই ধরণের সেনাবাহিনীর মূল্য হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের এই সামরিক মূল্য যথেষ্ট ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে সাম্রাজ্য স্থাপন না করে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা বা world power-এর মর্যাদা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স world power হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী কালে জার্মানীও বিশ্ব রাজনীতিতে মর্যাদার আসন লাভের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সময় এই নীতি অত্যন্ত উগ্র রূপ ধারণ করে এবং ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। একটি দেশ সাম্রাজ্য বিস্তার করলে অন্য দেশও শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এই ভাবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টার সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

(ঘ) ধর্ম ও সভ্যতা প্রচার

ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের আকাঙ্খাকেও সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটি কারণ বলে মনে করা হয়। পাশ্চাত্য দেশের অনেকে প্রচার করতেন যে খৃষ্ট ধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা তাদের পরম কর্তব্য কর্ম। অনেকে এই কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন। পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের খৃষ্টান মিশনারীরা আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জনসাধারণের ভিতর জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করে তাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা জয়ের পিছনে এই ধর্মীয় মনোভাব খুবই সক্রিয় ছিল। স্পেন ও পর্তুগালের ক্যাথলিক সম্রাটরা দেশ জয়ের মত ধর্ম প্রচারের দিকেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং এই দুই দেশ থেকে হাজার হাজার 'জেসুইট' ও অন্যান্য খৃষ্টান পুরোহিত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অজানা দেশে গিয়ে উপস্থিত হন। ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যের ভেতর ফরাসী সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মীয় নেতাদের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাদের ধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ী শ্রেণী ও সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে। কেবল ধর্মযাজকরাই নন, অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারাও ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের নামে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1898 খৃষ্টাব্দে স্পেনকে পরাজিত করে যখন ফিলিপাইনস্ অধিকার করে নেয় তখন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে (Mckinley) খৃষ্টধর্ম ও মানবতার নামেই তা সমর্থন করেন।[1] মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বলেন যে ফিলিপাইনসের জনসাধারণের ভিতর খৃষ্টধর্ম

1. এ বিষয়ে T. A. Baileyর *A Diplomatic History of the American People* বই দ্রষ্টব্য।

প্রচার করে তাদেরকে শিক্ষিত ও সুসভ্য করে তোলার জন্য ভগবানের আদেশ তিনি লাভ করেছেন। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সদস্য আলবার্ট বেভেরিজ (Albart J. Beveridge) বলেন সে অসভ্য ও দুর্বল দেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যই ভগবান মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রকে সরকার পরিচালনা কার্যে এত পারদর্শী করে গড়ে তুলেছেন। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড আফ্রিকার কঙ্গোতে নিজের সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় বলেছিলেন যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে সভ্যতার আলোতে নিয়ে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য[1]। কিন্তু কঙ্গোতে বেলজিয়ামের শাসন ছিল বড়ই নির্মম ও কঠোর। যাই হোক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচারের আকাঙ্খা সর্বক্ষেত্রে আন্তরিক না হলেও অনেক ধর্মযাজক যে আন্তরিক ভাবেই সেই কাজ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য তাঁরা নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করেন। পূর্ববর্তী যুগে ইসলামিক সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের আকাঙ্খা ছিল খুবই প্রবল।

এখানে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপলিং (Rudyard Kipling-এর Whiteman's burden[2] এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নীতির ফলে পাশ্চাত্য দেশের লোকের মনে ধারণা হয় যে এশিয়া ও আফ্রিকাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করা উচিত। আসলে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ সভ্যতার জগতে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে অনেকখানি এগিয়ে যায় এবং তার ফলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

---

1. তিনি বলেন: "To open to civilization the only part of our globe where it has not yet penetrated, to pierce the darkness which envelops whole populations, is a crusade, if I may say so, a crusade worthy of this century of progress."

2. পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সাধারণতঃ নিজেদের whiteman এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীগণকে black man বা coloured man বলে অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীর কোন দেশের লোকের শরীরের রং সাদা বা white নয়। তা ছাড়া কালো কোন রং নয়; রং-এর অভাবকেই আমরা কালো বলি। তাই কালো আদমী বা black people কে coloured people বলে অভিহিত করার কোন যুক্তি নেই। সাদা একটি বিশেষ রং এবং তাই whitemanকেই coloured man বলা হয়।

(ঙ) উদ্বৃত্ত লোক সংখ্যা

অনেক সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাদের উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যার বসবাসের জন্য সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ প্রয়োজন, এই যুক্তি দিয়ে থাকে। জাপান, জার্মানী, ইতালী প্রমুখ প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশই এই ধরণের যুক্তি প্রদর্শন করেছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপের লোক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে লোক সংখ্যার চাপ বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ফ্রান্সের উদ্বৃত্ত লোক সংখ্যার কোন সমস্যা ছিল না। বহু সংখ্যক ইংরাজ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিবেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছে কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার নীতি তারা গ্রহণ করে নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে রাজা রামমোহন রায় ইংরাজদের ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। ইউরোপের অধিবাসীরা পশ্চিম গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে অনেক সংখ্যায় চলে যায় কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে বসবাস করে নি। ইতালী তার জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই উদ্বৃত্ত লোক সংখ্যার চাপের অজুহাতে আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করে, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন দেখা যায় যে আফ্রিকাতে ইতালীয় সাম্রাজ্যে ইতালীয়ানদের সংখ্যা প্রায় মাত্র 8 হাজার। মুসোলিনী একদিকে লোক সংখ্যার চাপ হ্রাস করার জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং অপর দিকে একই সময়ে লোক সংখ্যা বাড়াবার নীতি গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বের দশ বৎসর (অর্থাৎ 1904-1913) জার্মানী তার সাম্রাজ্যে প্রতি বৎসর গড়ে মাত্র 30 জন করে লোক পাঠায়। জাপান সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ সম্বন্ধেই বলা যায় যে লোক সংখ্যার চাপ সাম্রাজ্য স্থাপন করার একটি অজুহাত মাত্র।[1]

---

1. Norman Hill তাঁর *International Relations : Documents and Readings* বইতে মন্তব্য করেন : "...the surplus—population argument has been used for propaganda purposes. Apparently it is not so much that population pressure leads to expansion. Rather certain peoples have been led to believe that they are suffering from population pressure and need to expand."

(চ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য

আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পে বিপ্লবের পরে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের শিল্পপতিরা কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য এবং উদ্‌বৃত্ত মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে। ব্যবসায় বাণিজ্য করেই তারা সন্তুষ্ট হয় না—নিজেদের বাজারকে অন্য দেশের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্য সেই বাজারের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করাও প্রয়োজন মনে করে। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে এবং সেই কারণে তারাও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক হয়ে উঠে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে হবসন (John A. Hobson)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত বই *Imperialism—A Study* 1902 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকে তিনি বলেন যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী মজুরী হিসেবে খুব কম অর্থ পেয়ে থাকে এবং বেশীর ভাগ অর্থ মালিক শ্রেণীর হাতেই জমা হয়। শ্রমিক শ্রেণীই সংখ্যায় বেশী, কিন্তু তারা দরিদ্র থাকায় উৎপাদিত ধনসম্পদ বেশী ক্রয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই মালিক শ্রেণীর কাছে ধন সম্পদ উৎপাদন করে তা বিক্রী করার এক সমস্যা দেখা দেয়। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য মালিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রী করে এবং উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিকতর লাভ করাই হ'ল উদ্দেশ্য। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী বলে হবসন মনে করেন নি। তাঁর মতে পুঁজিবাদের বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই ("false economy of distribution") সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার করে যদি এই বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় তবে হবসনের মতে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হবে না। অর্থনৈতিক সংস্কার করে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হবে না। সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হবসন অর্থনীতির উপরই বেশী জোর দিয়েছেন যদিও অন্যান্য কারণগুলিও একেবারে উপেক্ষা করেন নি।

এই প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কেইন্‌স্ (John Maynard Keynes)-এর সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর *The General Theory of Employment, Interest and Money* বইতে তিনি বলেছেন যে কোন পুঁজিবাদী দেশের পক্ষেই বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ ভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অপর দিকে আমদানী হ্রাস করতে হবে। একটি দেশ রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করলে অন্য দেশের উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং সেই দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হবে। দীর্ঘ দিন ধরে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য সাম্রাজ্য স্থাপন করে সেই দেশে রপ্তানী বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়।

লেনিন মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। সমাজ বিবর্তনের একটি অবশ্যম্ভাবী স্তর হিসেবেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* বইতে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে 'the monopoly stage of capitalism' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত থাকায় তাদের পক্ষে বেশী জিনিষপত্র ক্রয় করা সম্ভব নয়। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উন্নত স্তরে মালিক শ্রেণী উৎপাদিত জিনিষ পত্র দেশে বিক্রী করার সুযোগ পায় না (এই সমস্যাকে তথাকথিত অতি-উৎপাদন বা over-production বলে) এবং দেশে উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় সাম্রাজ্য স্থাপন করে সেখানে জিনিষ পত্র বিক্রী এবং উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করাই পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। লেনিনের মতবাদের সাথে হবসনের ব্যাখ্যার অনেক মিল থাকলেও মৌলিক পার্থক্যও আছে। হবসনের মতে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংস্কার করে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরীর হার যদি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় তবে সাম্রাজ্যবাদের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মার্কসের মতবাদ অনুসরণ করে লেনিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে মালিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা করার যন্ত্র হিসেবেই বর্ণনা করেন। অতএব এই মালিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। অতএব পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য এবং বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সাম্রাজ্য

স্থাপনের চেষ্টা করায় তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। হবসনের মতবাদের মধ্যে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (welfare state) বীজ নিহিত আছে কিন্তু লেনিনের মতে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভিন্ন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। মার্কসীয় নীতি অনুযায়ী লেনিন মুলতঃ একমাত্র অর্থনীতির সাহায্যেই সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসের মতে যে সব উপকরণ দ্বারা সমাজ বিবর্তন পরিচালিত হয় তা সবই শেষ পর্যন্ত মুলতঃ অর্থনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। লেনিনের মতে একটি দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যথেষ্ট উন্নত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তা সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেই। কিন্তু পুঁজিবাদ উদ্ভবের পূর্বে এবং পুঁজিবাদের তথাকথিত over production সঙ্কটের পূর্বে যে সব সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তা লেনিনের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও বৃটেন পুঁজিবাদের over production সঙ্কটের পূর্বেই বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে। যে মতবাদ দ্বারা সমস্ত যুগের বিভিন্ন ধরণের সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা করা যায় না তা অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া অনেকে মনে করেন যে অর্থনীতি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য কারণও আছে। সেইগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। লেনিনের মার্কসীয় ব্যাখ্যায় সেই সব সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত। প্রত্যেক যুগের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ হয়ত নিহিত আছে কিন্তু তা কেবলমাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। অর্থনীতি ছাড়া জাতীয় মর্যাদা, ধর্মীয় প্রচার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা, ক্ষমতার মোহ ইত্যাদির ভূমিকা অস্বীকার করা অনেকে ইতিহাস-সম্মত মনে করেন না। আলেকজেণ্ডারের সাম্রাজ্য, ইসলামিক সাম্রাজ্য, হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে গেলে অর্থনীতি ছাড়া অন্যান্য কারণের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের ব্যাখ্যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতি আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টা হয় নি। সমস্ত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী দোপর রাষ্ট্র মালিক-শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে একমাত্র তাদের শ্রেণী স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, একথাও অনেকে স্বীকার করেন না। গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন শ্রেণীই ক্ষমতা লাভ করার সুযোগ পায়—বৃটেনে লেবার পার্টি বহুবার ক্ষমতায় আসতে সক্ষম

হয়েছে। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে রাষ্ট্রের নীতি জাতীয় স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপন বা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করে না। তা ছাড়া অনেকে এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি বা প্রয়োজন হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সব দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বজায় আছে। অতএব সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে করার কোন কারণ নেই।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কারণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদে সেই কারণই প্রধান, তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পাই এবং কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য দ্বারা সমস্ত যুগের সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত

ইতিহাসের প্রাচীন কালেই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। ব্যাবিলন, মিশর, পারস্য, ম্যাসিডোনিয়া (আলেকজেণ্ডার), রোম, কার্থেজ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ প্রাচীন যুগে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করা যায়। পর্তুগালের প্রিন্স হেনরী (Prince Henry the Navigator)-কে (1314-1460) এই ভৌগোলিক অভিযানের পথিকৃৎ হিসেবে ধরা যেতে পারে। তাঁর অনুপ্রেরণায় একদল পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার অজানা পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আফ্রিকার উপকূল দিয়ে শেষ পর্যন্ত 1498 খৃষ্টাব্দে ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন। 1492 খৃষ্টাব্দে স্পেন সরকারের সহায়তায় কলাম্বাস (Columbus) আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সেবাষ্টিয়নে কেবট (Sebastian Cabot) নামে একজন ইতালীয়ান নাবিক ইংলণ্ডের সহায়তায় 1497 খৃষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশে উপনীত হন। পর্তুগাল, স্পেন, বৃটেন প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের উপকূলবর্তী দেশের দুঃসাহসিক নাবিকেরা আবিষ্কারের উন্মাদনায় বিভিন্ন দিকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং এই ভৌগোলিক আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপনে পরিণতি লাভ করল। বিভিন্ন দেশের নাবিকেরা তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে

এবং এইভাবে বৃটেন, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডস্ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। রেনেসাঁস আন্দোলন, মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান, জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, বারুদের আবিষ্কার, নৌ-বিদ্যার অগ্রগতি ইত্যাদির ফলেই এই বৈপ্লবিক ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। বেশীর ভাগ সাম্রাজ্য এই সময় আমেরিকাতেই স্থাপিত হয় তবে এশিয়া (ভারতবর্ষ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া) ও আফ্রিকাও বাদ যায় নি। সাম্রাজ্য স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হয়। ল্যাটিন আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগাল, ভারতবর্ষে বৃটেন এবং সামান্য পরিমাণে ফ্রান্স ও পর্তুগাল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নেদারল্যাণ্ডস্ এবং উত্তর আমেরিকায় ফ্রান্স ও বৃটেন বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (1756-1763) ফলে উত্তর আমেরিকায় ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বৃটেনের করতলগত হয়।

এরপর থেকে এক শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ভাটা পড়ে আমেরিকার 13টি উপনিবেশ বৃটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করল। তারপর ফ্রান্সের বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্স ইউরোপে এক নতুন ধরণের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য স্থাপন করার নেপোলিয়নের স্বপ্ন ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সাথেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইউরোপের সমস্ত শক্তি তখন নেপোলিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই ব্যস্ত ছিল। সেই সময় 1810-1825 খৃষ্টাব্দের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকাতে স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে এবং 1822 খৃষ্টাব্দে ব্রাজিল পর্তুগালের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়। এই সব কারণে সাম্রাজ্য বিস্তার সেই সময়ে বিশেষ সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া সেই সময় শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলি নিজের দেশের বাজারে জিনিসপত্র বিক্রী করার দিকেই বেশী নজর দেয়। তবে সেই সময় সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল তা নয়। ফ্রান্স আলজেরিয়া জয় করে, ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে—কখনও যুদ্ধ করে, কখনও কূটনীতির সাহায্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে—ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে। সেই সময় রাশিয়াও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য এবং সাইবেরিয়াতে

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছিল নিজস্ব ভূখণ্ডের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। শেষ পর্যন্ত এই সব বিজিত দেশ সাম্রাজ্যে পরিণত না হয়ে বিজয়ী দেশের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তবে দুই ক্ষেত্রেই এই একাত্মবোধ সমান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

এক শতাব্দীকাল বিরতির পর উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল জোয়ার আবার আরম্ভ হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র তখন শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ করে এবং ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক হলেও অন্যান্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেছে। কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রী, উদ্‌বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগ ইত্যাদি কারণে বৈদেশিক বাজার দখলের জন্য শিল্পোন্নত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনীতি চলতে থাকে। ইংলণ্ডের ডিসরেলী (Disraeli) ছিলেন এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূর্ত প্রতীক। আফ্রিকার এক বিশাল অঞ্চলে বৃটেন সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং অন্যত্রও—বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়—এই ব্যাপারে কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত হ'ল। ইংলণ্ডের ডিসরেলীর মত ফ্রান্সের জুলেস ফেরী (Jules Ferry) পূর্ণোদ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীনে ফ্রান্স তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ফরাসী সাম্রাজ্যই ছিল তখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনীতিতে জার্মানী ও ইতালীও তখন যোগ দেয়। বিসমার্ক এই নীতির বিশেষ সমর্থক না হ'লেও ছয় বৎসরের মধ্যে (1884-1890) আফ্রিকাতে তোগোল্যাণ্ড, ক্যামারুণ, জার্মাণ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তা ছাড়া সুদূর প্রাচ্যে চীনের সানটুং (Shantung) অঞ্চলে জার্মানী বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে জার্মানীর অধিকার স্থাপিত হয়। জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী তার সমস্ত সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ইতালি আফ্রিকাতে ইরিত্রিয়া, ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড এবং

লিবিয়া অধিকার করে। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া অধিকার করতে গিয়ে 1896 খৃষ্টাব্দে আডুয়া (Aduwa)-র যুদ্ধে ইতালী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। বেলজিয়াম আফ্রিকায় কঙ্গো অঞ্চলে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই অঞ্চল প্রথমে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং পরে 1908 খৃষ্টাব্দে কঙ্গো বেলজিয়ামের সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এশিয়াতে জাপানও ইউরোপীয় শক্তিগুলির মতই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি চীনের দিকেই প্রসারিত হয় এবং 1894 খৃষ্টাব্দে চীনকে পরাজিত করে জাপান ফরমোসা এবং আরও কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করে নেয়। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হয় এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে (1904-5) রাশিয়াকে পরাজিত করে জাপান দক্ষিণ সাখালিন অধিকার করে এবং লিওটাং উপদ্বীপের (Liantung Peninsula) পোর্ট আর্থার নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে চীন থেকে নানা ধরণের সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই (Hawaii)-তে সরকার বিরোধী দলকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে শেষ পর্যন্ত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নেয়। 1898 খৃষ্টাব্দে স্পেনকে যুদ্ধে পরাজিত করে মার্কিন সরকার পোর্টারিকো (Puerto Rico), গুয়াম (Guam) এবং ফিলিপাইনস্ (The Philippines) অধিকার করে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপের উপর মার্কিন কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়। আমেরিকার নিরাপত্তা রক্ষা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পানামা খাল খনন করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলের ভূখণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকার করে। 1823 খৃষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে মনরো নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা করেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের হস্তক্ষেপ থেকে সমস্ত আমেরিকাকে রক্ষা করা। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির স্বার্থও এই নীতির দ্বারা রক্ষিত হয় কিন্তু পরে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এই নীতির মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত দেখতে পায়। আমেরিকাকে ইউরোপের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখার নীতি নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির প্রধান অভিযোগ হল যে এই নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে নি। অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থে

ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার ক'রে এবং বন্ধুমনোভাবাপন্ন সরকারকে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। নিজের স্বার্থ বুঝে মার্কিন সরকার ল্যাটিন আমেরিকার অনেক সরকারকে এবং প্রয়োজন বোধে সরকার বিরোধী দলকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে মার্কিন সরকারের এই নীতিকে আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ বলা যায় না সত্য কিন্তু কোন কোন খ্যাতনামা লেখক এই নীতিকে "পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ" বলে অভিহিত করেছেন।[1] ক্যারিবিয়ান (Caribbean) অঞ্চলে মার্কিন নীতিকেও অনেকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চলে মার্কিন নীতি হ'ল যে দেশের নিরাপত্তার জন্য এখানে যে কোন ব্যবস্থা—তার ফলে ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব হলেও—গ্রহণ করা যেতে পারে। 1901 খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলের কিউবাতে মার্কিন প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন নীতিকে Palmer and Perkins তাঁদের *International Relations* বইতে 'defensive imperialism' বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্য ভূখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দখল না করে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী দেশ অন্য দুর্বল রাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা আদায় করে নিত। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান প্রত্যেকেই চীনের নিকট হ'তে এই ভাবে নানা ধরণের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিশেষ সুবিধা আদায় করে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সেখানে সমস্ত দেশের জন্য বাণিজ্যের সমান অধিকার নীতি (Open Door Policy) গ্রহণ করে চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার চেষ্টাই করে। অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশেষ অঞ্চলকে নিজের প্রভাবাধীন অঞ্চলে (Sphere of Influence) পরিণত করে সেখানে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা ভোগ করতে থাকে। বৃটেন ও রাশিয়া পারস্য বা ইরাণকে নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করে নেয়। আফ্রিকাতে

1. Normal Hill তাঁর *International Relations Decumonts and Readings* বইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন: "No doubt such actions are imperialistic in the strict sense. Because the control exerted is less direct than that employed in dependencies, the domination exercised throurh puppet regimes, recognition policies, shipment of arms, and the like has been referred to as indirect imperialism."

অনেক সময় প্রথমে প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপন করে পরে তা সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও তুরস্ক নিজেদের সমস্ত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জার্মানী ও তুরস্কের সাম্রাজ্য মিত্রপক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেরা দখল না করে তা জাতিসংঘের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্র সেই সব অঞ্চল শাসন করে এবং জাতিসংঘের কাছে প্রতি বৎসর রিপোর্ট পেশ করতে তারা বাধ্য থাকে। এই ম্যাণ্ডেট নীতি সাম্রাজ্যবাদের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নীতিগত ভাবে সাম্রাজ্যবাদকে মিত্রশক্তি সমর্থন করতে পারে নি বলেই তাঁরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই সব দেশকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য উপযুক্ত করে তোলার নীতিও জাতিসংঘে গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ভিত্তি যে শিথিল হয়ে গিয়েছিল ম্যাণ্ডেট নীতিই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই নীতির অনুকরণেই অছি পরিষদ গঠিত হয়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

1930 খৃষ্টাব্দের পরে জাপান, ইতালী ও জার্মানী জাতিসংঘের নিয়ম অস্বীকার করে সামরিক শক্তির সাহায্যে নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করতে থাকে। জাপান মাঞ্চুরিয়া ও চীন আক্রমণ করে, ইতালী 1936 খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়া দখল করে নেয় এবং নাৎসী জার্মানী ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধেই প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় জাপান, ইতালী ও জার্মানী তাদের সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও সামরিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে সাম্রাজ্য রক্ষা করার মত শক্তি বৃটেনের আর থাকে না। তা ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে তা দমন করা দুর্বল বৃটেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৃটেন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষ (এখানে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্র গঠিত হয়), বার্মা, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। 1946 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনসের

স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। ফ্রান্স বৃটেনের মত সহজ ভাবে নতুন অবস্থাকে গ্রহণ করতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। 1945 খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। সেই সময় ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় এবং ফ্রান্স ইন্দোচীন থেকে বিতাড়িত হলেও সেখানে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। টিউনিসিয়া, মরোক্কো, আলজেরিয়া প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল থেকে ফরাসী শাসনের অবসান ঘটে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নেদারল্যাণ্ডস্ চেষ্টা করেও সাম্রাজ্য বজায় রাখতে পারে না এবং ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে এ কথা বলা না গেলেও পুরাতন যুগের সাম্রাজ্যবাদী নীতি শেষ হ'তে চলেছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে বলা চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে দুই ধরণের সাম্রাজ্যবাদের কথা শোনা যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ ঋণ হিসেবে দান করে। অর্থ সাহায্যের ফলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণে আসা স্বাভাবিক কিন্তু কোন রাষ্ট্র মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরোক্ষ ভাবে নানা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করে চলেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাধারণ ভাবে সেই ধরণের রাজনীতিকে সাম্রাজ্যবাদ বলা যায় না। সোভিয়েত-বিরোধী পক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ প্রায়ই এনে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, এই তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র অধিকার করে এবং ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করে সামরিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থান দখল করে নেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতিতে প্রথমতঃ আংশিক ভাবে এবং পরে সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। চেকোস্লোভাকিয়াতেও শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

এই সব কম্যুনিষ্ট দেশের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট চীনের সাথেও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সোভিয়েত বিরোধী পক্ষের যুক্তি হল যে এই সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। অন্য পক্ষের যুক্তি হল যে স্বেচ্ছায় পূর্ব ইউরোপের কম্যনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি স্থাপন করেছে এবং তার ফলে তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণই রয়েছে এবং তাদের উপর কোন ভাবেই সোভিয়েত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে ব্রেজনেভ নীতি (Brezhnev Doctrine) সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নীতির মূল কথা এই যে, যে সব দেশে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে সেই সব দেশে যাতে আবার ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত না হতে পারে সেই দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদাই লক্ষ্য রাখবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিতে এই নীতির অর্থ হ'ল সমাজতন্ত্র রক্ষা করা, আর সোভিয়েত বিরোধী পক্ষের দৃষ্টিতে এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হ'ল সেই সব দেশে জোর করে কম্যুনিষ্ট শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত প্রাধান্য বজায় রাখা। যাই হোক, এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই নিজেদের স্বার্থে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নানা চাপ সৃষ্টি করে তাদের নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অন্য দেশের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ ভাবে বিনষ্ট বা সঙ্কুচিত না করে পরোক্ষ ভাবে চাপ সৃষ্টি করে তার নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ না হলেও তা সাম্রাজ্যবাদ থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আধুনিক 'সুপার পাওয়ার' (super power)-এর যুগে নতুন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের মূল্যায়ন

সাম্রাজ্যবাদ কথাটি আজকাল অনেক সময় এত নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করা হয় যে এর প্রকৃত মূল্যায়ন করা খুব কঠিন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা বিচার করেই তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন করার সময় আমাদের আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কথাই মনে রাখা উচিত।

বহু বৎসর ধরে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ থাকায় তাদের অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়েছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থেই সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করেছে, তবে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমেই এই সব দেশ আধুনিক যুগের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে আসার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এক রেনেসাঁস আন্দোলন আরম্ভ হয়। পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষে এক নব যুগের সৃষ্টি করে। রেলপথ, ডাক, টেলিগ্রাফ, স্কুলকলেজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি স্থাপিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অধীনেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করে বিভিন্ন শিল্পও কিছু পরিমাণে গড়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং স্বায়ত্বশাসনমূলক কিছু প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে আধুনিক যুগের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বিচার করা উচিত নয়। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ বা বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি অনেক বেশী নির্মম ও কঠোর।

সাম্রাজ্য স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কতখানি লাভ হয়েছে? এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যের জোরে বিশ্বরাজনীতিতে মুখ্য আসন লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। পশ্চিমের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শিল্পপতিদের যথেষ্ট অর্থ নৈতিক লাভ হয়েছে তাও সত্য। কিন্তু Hobson, Clark প্রমুখ অনেকে মনে করেন যে জাতির সমস্ত শ্রেণীর কথা যদি মনে রাখা যায় তবে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির খুব বেশী অর্থ নৈতিক লাভ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদকে হবসন (Hobson) "irrational from the standpoint of the whole nation." বলে অভিহিত করেছেন, যদিও স্বীকার করেছেন যে "it is rational enough from the standpoint of certain classes in the nation," সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশকেও অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে কিন্তু সাম্রাজ্য থেকে লাভের প্রধান অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতেই চলে যায়। Grover Clarkও তাঁর *The Balance Sheets of Imperialism* বইতে দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ থেকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে লাভবান হলেও জাতিগত ভাবে

দেশের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও ব্যবসায় বাণিজ্য করে একটি দেশ অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে। আধুনিক কালে এই মতবাদই বেশী প্রচলিত।

অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ প্রদান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত বা বে-সরকারী পর্যায়ে বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করার প্রথা বর্তমানে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এই কথা ঠিক যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বে-সরকারী আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এখনও যথেষ্ট আছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এমন কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয় এবং মার্কিন সরকারের ভয় হয় যে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সেই সব দেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে পারে। সেই অবস্থায় পশ্চিম ইউরোপে রিলিফ, পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বহু অর্থ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বিনিয়োগের ফলে শীঘ্র এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক মুনাফার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক কারণে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বে অর্থনৈতিক লাভের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মুখ্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হয়। পূর্বেও এই রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু এত ব্যাপক ভাবে তা তখনও ব্যবহৃত হয় নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কেবল পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহকেই অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ প্রদান করেছে তা নয়; এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির প্রতিও একই নীতি অনুসরণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ঋণ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। এই অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ প্রদান ঠাণ্ডা লড়াই-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপেই দেখা দেয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশগুলিও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ, চীন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশও তাদের বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ

দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বৈদেশিক নীতিকে সার্থক করে তোলার একটি প্রধান উপায় হিসেবেই অর্থনীতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকাল অনেক দেশই পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রেই সেই সব পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত উন্নতশীল রাষ্ট্র সেই সব দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় এবং তাদের নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ তার কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। তবে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের আধুনিক নীতির প্রথম প্রকাশ Lend-Lease Act-এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। 1941 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কংগ্রেস এই আইন পাশ করে এবং এই আইনের দ্বারা নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মিত্রশক্তিকে যে কোন ভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টকে প্রদান করা হয়। এই আইনের ফলে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পায় গ্রেট বৃটেন এবং তার পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 1945 খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই আইন বাতিল করে দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ যুদ্ধের পরে মার্কিন সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়াই স্থির করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হওয়ায় মার্কিন সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে আবার সাহায্য প্রদান করতে আরম্ভ করে। আমেরিকা United Nations Relief and Rehabilitation Administration-এর মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রচুর অর্থ গ্রেট বৃটেন, চীন, ফিলিপাইনস্, তুরস্ক, গ্রীস এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশকে প্রদান করে। Export Import Bank-এর মাধ্যমেও অনেক অর্থ ঋণ দেওয়া হয়। পরে মার্শাল প্ল্যান (Marshall plan অনুযায়ী সুপরিকল্পিত-ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া আরম্ভ হয়। 1948 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান (President Truman) বৈদেশিক সাহায্য আইন বা Foreign Assistance Act-এ স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং এই আইন দ্বারা মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে European

Recovry Programme (ERP) অনুযায়ী প্রচুর অর্থ ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়। তা ছাড়া গ্রীস, তুরস্ক এবং চীনকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কম্যুনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করাই ছিল মার্শাল প্ল্যানের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে 1949 খৃষ্টাব্দে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি (North Atlantic Treaty) স্বাক্ষরিত হয় এবং তখন থেকে সামরিক প্রস্তুতির দিকেই মার্কিন সাহায্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই সময় পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহায়তার যে কার্যসূচী (Mutual Defence Assistance Programme) গ্রহণ করা হয় তাতে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত না হলেও সামরিক প্রস্তুতির দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়। 1950 খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে উক্ত প্রোগ্রামে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থসাহায্য দিতে আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের Point Four Programme বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 1949 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অনুন্নত দেশগুলিকে কারিগরী সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কথা তিনি 4 নং পয়েণ্ট উল্লেখ করেন বলে এই নীতি Point Four Programme নামে খ্যাতি লাভ করে। মার্শাল প্ল্যানের মত অর্থ বা মূলধন দিয়ে সাহায্য করার কোন প্রস্তাব এখানে করা হয় নি—কেবলমাত্র কারিগরী সাহায্য দিয়ে অনুন্নত দেশগুলির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার কথা বলা হয়। এই প্রোগ্রামের নীতি অনুযায়ী Act for International Development পাশ করা হ'ল এবং একটি International Development Advisory Board গঠন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত সামরিক সাহায্যের উপরই বেশী জোর দেয় এবং Point Four Programme-এর উপর বেশী গুরুত্ব দিতে রাজী হয় না। যাই হোক, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশকে নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে। পশ্চিম গোলার্ধের উন্নতির জন্য ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে 1959 খৃষ্টাব্দে Inter-American Development Bank গঠন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশানুযায়ী 1951 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন (Mutual Security Act) পাশ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী Mutual Security Agency (MSA) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল। European Recovery Programme (ERP), Mutual Defence Assistance Programme (MDAP), Point Four Programme ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ছাড়া Mutual Security Agency-র নতুন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পরে 1953 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে Mutual Security Agency-র সাথে আরও কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে Foreign Operations Administration (FOA) গঠন করা হয়। 1955 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে FOA-র পরিবর্তে International Co-operation Administration (ICA) নামে একটি নতুন সংস্থার উপর বৈদেশিক অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের সমস্ত প্রোগ্রামের দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ল। FOA-র কার্যকাল 22 মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় 8·7 বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের খাতে ব্যয় করে এবং তার মধ্যে 6·3 বিলিয়ন ডলারই সামরিক সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়। 1951 খৃষ্টাব্দে ICA-এর সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব Agency for International Development (AID)-এর উপর দেওয়া হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈদেশিক সাহায্য দেওয়ার প্রোগ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ দুইই নিহিত আছে। কোন রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়ার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশে ডলার পাঠায় না—ঋণের সমান দ্রব্যসামগ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করতে হয়। ফলে ঋণের মাধ্যমে মার্কিন শিল্প তার জিনিষপত্র বিক্রী করার জন্য নতুন বাজার লাভ করে। তা ছাড়া, মার্কিন সাহায্য বা ঋণের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হয় সাধারণতঃ তার অন্ততঃ শতকরা 50 ভাগ আমেরিকার জাহাজে আনা বাধ্যতামূলক। ফলে জাহাজ কোম্পানীও লাভবান হয়। আমেরিকার আর্থিক সাহায্য নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি হ'লে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার সাথে তাদের স্বাভাবিক ব্যবসায় বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ প্রদানের

প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হ'ল কম্যুনিজমকে রোধ করা। অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অস্বচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিজম প্রসার লাভ করে। অতএব দেশের আর্থিক উন্নতি হ'লে কম্যুনিজম প্রসার বন্ধ হতে পারে। এই ধারণা পশ্চিম ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে অনেকাংশে সত্য হ'লেও এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে্ প্রযোজ্য কি না সন্দেহজনক। এই সব দেশে অল্প সময়ের মধ্যে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

অন্য দেশকে আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য প্রদান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দেয়। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নও এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির প্রতি এই নীতি অবলম্বন করে। প্রথম দিকে এই সব দেশ সম্বন্ধে সোভিয়েতের নীতি ছিল অন্য রকম। তখন এই সব দেশের জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট দলের সশস্ত্র বিদ্রোহ সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করে। বার্মা, মালয়, ফিলিপাইনস্, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ শুরু হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সব দেশের সরকারের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের কোন চেষ্টা করে না। কিন্তু ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে সোভিয়েত নীতির পরিবর্তন ঘটে এবং আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান সহ বিভিন্ন ভাবে সোভিয়েত সরকার এই সব দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সোভিয়েত বিরোধী জোট থেকে এই সব রাষ্ট্রবর্গকে বিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে কলম্বো পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য 1950 খৃষ্টাব্দে কলোম্বোতে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে একটি Consultative Committee গঠন করা হয় এবং এই কমিটির এশিয়ান সদস্যরা উন্নয়নমূলক যে পরিকল্পনা তৈরী করে তা 1951 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরে অপর কয়েকটি দেশও এই পরিকল্পনায় যোগদান করে।

বিশ্বব্যাঙ্ক বা International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) অনেক রাষ্ট্রকে অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য ঋণ দিয়ে

সাহায্য করেছে। 1944 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে মিত্রপক্ষীয় অনেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ব্রেটন উডস্ (Bretton Woods)-এ মিলিত হয়ে এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। সদস্য রাষ্ট্ররা শেয়ার ক্রয় করে এই ব্যাঙ্কের মূলধন সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তাদের শেয়ার অনুযায়ী এই ব্যাঙ্কের Board of Governors-এ ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক কার্য-নির্বাহক সমিতি (Board of Directors) দ্বারা এই ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালিত হয় এবং এই সমিতিকে সাহায্য করার জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনা ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বিশেষ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্যরাষ্ট্রের সরকারকে অথবা সংশ্লিষ্ট সরকার দায়িত্ব নিলে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকেও ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক নিরাপদ ক্ষেত্রেই অর্থ নিয়োগ করতে চেষ্টা করে—বিশেষ ঝুঁকি বা risk নেওয়া কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই এই ব্যাঙ্কের ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশকে যে পরিমাণ অর্থ নৈতিক সাহায্য প্রদান করেছে তার তুলনায় এই ব্যাঙ্কের সাহায্য খুবই সামান্য। তবুও ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশ এই ব্যাঙ্ক থেকে যে সাহায্য লাভ করেছে তার মূল্য কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিশেষ সংস্থা গঠন করে (যেমন Economic Commission for Asia and Far Fast—ECAFE) সেই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই একটি রাষ্ট্র অন্য দেশকে অর্থ নৈতিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। তার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরস্পরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। রাজনীতি ও অর্থনীতির এই নিকট সম্পর্ক আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।[1] বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হয়ে আসায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ নৈতিক সাহায্য দানের গুরুত্বও সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে।

1. "The world will not soon return to a condition in which international economics and international politics are generally separated." Padelford and Lincoln, *International Politics.*

5. যুদ্ধ

জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির শেষ উপায় হ'ল যুদ্ধ। যখন কূটনীতি এবং অন্যান্য সমস্ত উপায় ব্যর্থ হয় তখন একটি রাষ্ট্র যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে। অন্ততঃপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ দেশের ভূখণ্ড এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার যে অধিকার আছে তা আজও স্বীকৃত।

যুদ্ধ বলতে আমরা কি বুঝি? বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে যুদ্ধের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ দুইটি রাষ্ট্রের সরকার যখন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের বিরোধ মিটাবার চেষ্টা করে সেই অবস্থাকেই আমরা যুদ্ধ বলে থাকি। যুদ্ধ হ'ল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সেই অবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক বিবদমান রাষ্ট্রকে সামরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পরস্পরের বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।[1] যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিশেষ রূপ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। একটি রাষ্ট্র নিজের বৈদেশিক নীতিকে সার্থক করে তোলার জন্য বিভিন্ন উপায়ে (যেমন কূটনৈতিক আলোচনা ও চুক্তি, বাণিজ্য সম্পর্ক, অর্থ নৈতিক সাহায্য ইত্যাদি) অন্য রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে যখন একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের সাথে তাঁর প্রয়োজন মত সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে তখন সেই পদ্ধতিকে আমরা যুদ্ধ বলি। Clausewitz-এর ভাষায় "war is nothing but a continuation of political intercourse with an admixture of other means." একটি দেশের সরকারের বিরুদ্ধে যদি সেই দেশের কোন দল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তবে তাকে গৃহযুদ্ধ বলা হয়। যেমন স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের গৃহযুদ্ধ, ইত্যাদি।

---

1. যুদ্ধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুইন্সি রাইট বলেছেন যে যুদ্ধ হল "the *legal condition* which equally permits two or more *hostile groups* to carry on a *conflict* by *armed* force." Quincy Wright, *A Study of War*, Vol. II

যুদ্ধের সমস্যা ও কারণ

যুদ্ধের বিভীষিকা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেক দেশের মানুষই আজ সচেতন। যুদ্ধের ফলে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ যে নিহত হয়েছে, কত নগর নগরী যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানাবিধ শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে যুদ্ধ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে রাজা, শাসক শ্রেণী ও তাদের সেনাদলের মধ্যেই যুদ্ধ মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ নাগরিক যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রায় উদাসীনই থাকত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাবে আজকাল একটি দেশের সমস্ত মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধের সাথে জড়িত থাকে। সামরিক ও বে-সামরিক নাগরিকের মধ্যে বর্তমানে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যুদ্ধের সময় দেশের সমস্ত জনবল ও অর্থবল যুদ্ধের কাজেই নিয়োজিত হয় এবং এই ধরণের যুদ্ধ Total War নামে পরিচিত। যুদ্ধে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হ'লে পৃথিবী থেকে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়েও যেতে পারে। আধুনিক যুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য প্রত্যেক দেশকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। সেই অর্থ যদি দেশে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা সম্ভব হ'ত তবে মানুষ অনেক সমস্যার হাত থেকে সহজেই মুক্তিলাভ করে উন্নততর জীবন যাপন করতে সক্ষম হ'ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের মত ভয়াবহ সমস্যা আর নেই। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মানব সভ্যতাকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে অনেকে নানাভাবে চিন্তা করেছেন। অবশ্য এমন চিন্তাধারাও আছে যেখানে যুদ্ধকে মানবপ্রগতির সহায়ক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের সময় মানুষ নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে গিয়ে জাতির সম্মান রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার এবং প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। যুদ্ধ মানুষের অন্তর্নিহিত শৌর্যবীর্য জাগিয়ে তোলে এবং তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে শেখে। পৃথিবীর অনেক অর্থ নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি যুদ্ধের ফলেই সম্ভব হয়েছে। দুর্বল ও ভীরু জাতিকে পরাজিত বা উচ্ছেদ করে যুদ্ধই পৃথিবীতে শক্তিশালী জাতির কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং তার ফলেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি সম্ভব হয়। আধুনিক যুগের যুদ্ধ এতই ভয়াবহ যে এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা বিরল। কিন্তু যুদ্ধকে বর্জন করা মানুষের পক্ষে

আজও সম্ভব হয় নি। মানুষের ইতিহাস অনেকাংশেই যুদ্ধের ইতিহাস। মানব সমাজে এমন অনেক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে (যেমন ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজার স্বৈরতন্ত্র, দাসপ্রথা, আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথা) যা ধীরে ধীরে মানুষের চেষ্টায় লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে আসছে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মানুষের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধকে কোন যুগেই বর্জন করা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধের যদি কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা না থাকে তবে মানব ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে এত যুদ্ধ বিগ্রহ হওয়ার কারণ কি? আসলে যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে লাভ করার পদ্ধতি মাত্র।[1] এবং সেই উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রে অন্যায় নাও হতে পারে। যুদ্ধ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সরকার স্থাপন করে যুদ্ধের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সামরিক বল প্রয়োগ করেই ভারতবর্ষ পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে গোয়াকে মুক্ত করতে পেরেছে। অতএব এই কথা আমরা বলতে পারি না যে যুদ্ধ দ্বারা জগতের কোন সমস্যারই কোন সমাধান হয় না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য মহৎ ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে আবার অন্যায় এবং সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যেও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে সশস্ত্র শ্রেণীযুদ্ধ ব্যতীত শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যুদ্ধ অনিবার্য এবং শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ স্থাপন করতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত করতেই হবে। অনেকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ'কে সমর্থন করেন। পদ্ধতি হিসেবে যুদ্ধকে সমর্থন না করলেও অনেক সময় দেখা যায় যে যুদ্ধ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। যুদ্ধকে পরিহার করতে গিয়ে অন্যায় অত্যাচার এবং পরাধীনতা মেনে নেওয়া কি সম্ভব? যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি প্রয়োজনীয় এবং ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন ঘটানো যায় তবেই যুদ্ধকে পরিহার করা সম্ভব। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধের সমস্যা খুবই জটিল এবং এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

---

1. "War is a method of activing purposes." Clyde Eagleton, *Analysis of the Problems of War.*

কি কি কারণে যুদ্ধ হয়ে থাকে তা নিয়ে অনেকে গভীর ভাবে গবেষণা করেছেন। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা সকলে এক মত হতে পারেন নি। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কারণের উপর জোর দিয়েছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কারণগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়:

মনস্তাত্ত্বিক কারণ,
সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত কারণ,
অর্থনৈতিক কারণ,
রাজনৈতিক কারণ এবং
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অভাব।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

মানব প্রকৃতির মধ্যেই যুদ্ধের কারণ নিহিত আছে যাঁরা মনে করেন তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড (Sigmund Freud) অন্যতম। তিনি মনে করতেন যে মানুষের প্রকৃতির ভিতর একটা আক্রমণাত্মক প্রবণতা (aggressive instinct) রয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সেই প্রবণতার প্রকাশ।[1] কিন্তু আধুনিক যুগের বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা ফ্রয়েডের এই মতবাদ সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। যুদ্ধ করার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে নিহিত আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। Malinowski, Clyde Kluckhohn প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে মানুষ যখন তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার পথে বাধা পায় তখনই তার মনে আক্রমণাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তার নিরাপত্তা বা স্বাভাবিক যৌথ জীবন যখন কোন কারণে ব্যাহত হয় তখনই তার মনে সংগ্রাম স্পৃহা বা আক্রমণাত্মক প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব তাঁরা মনে করেন যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়—পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মনে এই ধরনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

1. "Men are not gentle, friendly creatures wishing for love, who simply defend themselves if they are attacked……… A powerful measure of desire for aggression has to be reckoned as part of their instinctual endowment………Civilized society is perpetually menaced with disintegration through this primary hostility of men towards one another." Sigmund Freud, *Civilization and its Discontents.*

কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে যুদ্ধ করার কোন স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের না থাকলেও অন্যের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। আলফ্রেড এ্যাডলার (Alfred Adler) বলেন যে অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় করে তোলার প্রবৃত্তি (longing for superiority) মানুষের মধ্যে খুব প্রবল এবং এই প্রবৃত্তি দ্বারা তার আচরণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কারেন হর্নে (Karen Horney) এ্যাডলারের এই কথা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে যারা বাল্যকালে অবহেলিত হয় এবং বিশেষ কোন মর্যাদা পায় না তাদের মনে এক ধরণের হীনমন্যতা ভাব জাগরিত হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে যেভাবেই হোক এবং যে পথেই হোক কৃতকার্যতা লাভ করে এবং অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে অতীত জীবনের ব্যর্থতা ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়। লাস্‌ওয়েল (Harold D. Lasswell) রাজনৈতিক সমস্যার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে সমাজে যারা নিজেদেরকে অবহেলিত এবং যোগ্য মূল্য ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত মনে করে তাদের কারও কারও মধ্যে উদগ্র ক্ষমতাস্পৃহা দেখা দেয় এবং জনস্বার্থের নামে তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা লাভ করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে এবং তার সাহায্যে তারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকে ভুলতে চায়। এই ধরণের মানুষকে লাস্‌ওয়েল 'political type' বলে বর্ণনা করেছেন (এই বিষয়ে লাস্‌ওয়েলের মতবাদের জন্য তাঁর লেখা *Power and Personality* এবং Harold D. Lasswell ও Abraham Kaplan, এর লেখা *Power and Society* বই দ্রষ্টব্য)। অনেক মনস্তত্ত্ববিদের ধারণা যে জীবন সংগ্রামে ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিফলতার ফলে যে নৈরাশ্যের (frustration) উদয় হয় তা কোন কোন সময় মানুষের মনে এক ধ্বংসাত্মক ও আগ্রাসী (aggressive) মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং সেই আক্রমণাত্মক মনোভাব যে কোন মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে। এই কথা জাতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিফলতা এবং ভার্সাই-এর অপমানের পর জার্মানীতে যে নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি হয় তা হিটলারের নেতৃত্বে এক চরম আগ্রাসী মনোভাবের রূপ নেয়। এই কথা ঠিক যে এ্যাডলার বা হর্নে কখনও বলেননি যে নিজেকে বড় করে তোলার বা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করার প্রবৃত্তি একমাত্র রাজনৈতিক পথেই চরিতার্থ করা

সম্ভব। মানুষ স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী প্রভৃতির উপর বিভিন্ন ভাবে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। হর্নে এই কথাই বলেছেন যে প্রথম জীবনের গ্লানি ও ব্যর্থতার ফলে একজন মানুষ যে কোন ক্ষেত্রে—চিন্তার ক্ষেত্রে, ধর্ম বা শিল্পের ক্ষেত্রে, সামাজিক কাজে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইত্যাদি– কৃতকার্যতা অর্জন করার চেষ্টা করতে পারে। সমস্যা হল যে যদি এই ধরনের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করে তবে তার ব্যক্তিত্বের জটিলতার জন্য নানারকম রাজনৈতিক সমস্যা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হতে পারে। লাস্‌ওয়েল যাদের 'political type' বলে বর্ণনা করেছেন অথবা বিফলতা ও পরাজয়ের ফলে যাদের মন ধ্বংসাত্মক ও আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে তারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একই সমস্যা দেখা দেয়। যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রীয় নেতাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের (personality structure) উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার অনেক সমস্যা আছে। সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে মানুষের মনে নানাবিধ অস্বস্তি, উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই ধরনের মানুষ অনেক সময় অপরিচিত লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। এই রকম অস্বাভাবিক মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তারা অনেক সময় যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী মনে করে নেয় এবং যুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তোলে। অনেক যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতাদের অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্ততঃপক্ষে আংশিকভাবে দায়ী করা চলে। নাৎসী জার্মানীর কার্যকলাপ আলোচনা করতে গেলে হিটলারের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন। হিটলার সম্বন্ধে কারেন হর্নে (Karen Horney) লিখেছেন যে প্রথম জীবনে তাঁকে অনেক অপমান ও গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে এবং তারপর বহু লোকের উপর নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে তিনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন।[1] সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনে খ্রুশ্চেভ (Khrushchev) ষ্ট্যালিনের অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর 'mania for greatness' এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে এমন অনেক অস্বাভাবিক

1. "Among recent historical figures Hitler is a good illustration of a person who went through humiliating experiences and gave his whole life to a fanatic desire to triumph over an ever-increasing mass o f people.".

ক্ষমতাপ্রিয় নেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা নিজেদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য দেশকে যুদ্ধের পথে পরিচালিত করেছেন। প্রাশিয়ার বিখ্যাত রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Frederick the Great) বলেছেন যে তাঁর যৌবন, উচ্ছ্বাস, গৌরব অর্জনের দুর্নিবার আকর্ষণ, কৌতূহল এবং এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাঁকে শান্তির পথ থেকে দূরে টেনে এনেছে। তিনি বলেন যে পত্রিকাতে নাম উঠবে এবং শেষে ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে এই আনন্দ তাঁকে যুদ্ধে পরিচালিত করেছে।[1]

1948 খৃষ্টাব্দে UNESCOর উদ্যোগে প্যারিসে যুদ্ধ সমস্যা নিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্যানট্রিল (Professor Cantril)-এর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন। এই সব আলোচনা Cantril-এর সম্পাদনায় *Tensions that Cause Wars* নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনায় যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনিবার্য ফল হিসেবে যুদ্ধকে মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না, তবে পরোক্ষ ভাবে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নেতাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় যুদ্ধের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।[2]

সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত কারণ

সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাতকেও যুদ্ধের কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ফলে একটি দেশের পক্ষে অন্য দেশকে ভাল করে বোঝা কঠিন হয় এবং তার ফলে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। তবে আধুনিক যুগে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কোন নজীর নেই। প্রাচীন কালে একটি দেশ যখন অন্য দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তখন তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য যুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। গ্রীকরা সমস্ত বিদেশীকে বর্বর (barbarian) মনে করত এবং ফলে গ্রীক ও বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন ছিল। ধর্ম ও যুদ্ধের মধ্যে নিকট সম্পর্কের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সময়ে যে

1 "My youth, the fire of passions, the desire for glory, yes, to be frank, even curiosity, finally a secret instinct has torn me away from the delights of tranquility. The satisfaction of seeing my name in the papers and later in history has seduced me."

2 "The greatest menace to the world to-day are leaders in office who regard war as inevitable."

ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্য অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ক্রুসেডের যুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় যুদ্ধ রূপে বর্ণনা করা যায় না সত্য কিন্তু সেখানে ধর্মের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মীয় পার্থক্য কি ভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে (1618-1648) এই ধর্মীয় পার্থক্যের ভূমিকা যথেষ্ট। আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সাথে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্ম প্রচারের সঙ্কল্প বিশেষভাবে জড়িত। আরব-ইজরাইল সম্পর্ক, ভারতবর্ষের প্রতি পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্তমান যুগেও ধর্মীয় পার্থক্য রাজনৈতিক সম্পর্ককে বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর রাজনৈতিক মতবাদের (Ideologies) প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ অনেক যুদ্ধকে রাজনৈতিক মতবাদের যুদ্ধ রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ফরাসী বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তাকে অনেক সময় 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'র সাথে রক্ষণশীল ফিউডাল প্রথার যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে ফ্যাসীবাদ বিরোধী যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের ঠাণ্ডা লড়াইকে (যদিও এই ঠাণ্ডা লড়াইকে যুদ্ধ বলে গণ্য করা যায় না) কম্যুনিজমের সাথে গণতন্ত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি ভাবে আমরা চিন্তা করে থাকি। এইসব যুদ্ধের জন্য মতাদর্শের পার্থক্যই একমাত্র দায়ী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতবাদের ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধকে অনেকটা অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) সাথে যুদ্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে ধারণা ছিল যে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। মেকিয়াভেলী (Machiavelli) বলেন যে যুদ্ধ এবং সেই সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া রাজার অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বা লেখাপড়া করা উচিত নয়।[1] যুদ্ধের মত হিংস্র এবং বর্বরোচিত ব্যবস্থা

1 "A prince should, therefore, have no other aim or thought, nor take up any other thing for his study, but war and its organization and discipline, for that is the only art that is necessary to one who commands... "

মানবসভ্যতায় যে এখনও প্রচলিত আছে তা খুবই আশ্চর্যের কথা। বিভিন্ন দেশেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মতবাদ গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু তবুও যুদ্ধকে বৈদেশিক নীতি রূপায়নের একটি পন্থারূপে আজও সব দেশ ব্যবহার করে থাকে। প্রাচীন যুগে মানুষ ও পশুর মধ্যে যখন খুব বেশী পার্থক্য ছিল না তখন বেঁচে থাকার জন্যই মানুষকে যুদ্ধ করতে হ'ত কিন্তু বর্তমান সভ্যতার যুগেও যুদ্ধের প্রয়োজন হয় এটাই আশ্চর্য।

এই বিষয়ে স্থম্পেটারের (Joseph A. Schumpeter) মতবাদ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে অতীতে দেশের বিশেষ স্বার্থের ('concrete interest') খাতিরে রাষ্ট্রকে যুদ্ধ করতে হ'ত এবং সেই কারণে রাষ্ট্র সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের বিভিন্ন সরঞ্জাম গড়ে তোলে। কিন্তু পরে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় না। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম থেকে যায় এবং যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে তাও অপরিবর্তিত থাকে। স্থম্পেটার (Schumpeter) বলেন যে পূর্বে যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু পরে সেনাবাহিনী এবং সামরিক সংগঠনের প্রয়োজনে যুদ্ধ চলতে থাকে।[1] স্থম্পেটার এই রকম যুদ্ধকেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে যে সব যুদ্ধের সাথে দেশের বিশেষ স্বার্থ ('concrete interest') জড়িত থাকে তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তিনি 'objectless' বা উদ্দেশ্যহীন বলে বর্ণনা করেছেন। স্থম্পেটারের মতে পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধই এই রকম উদ্দেশ্যবিহীন, অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয়। স্থদূর অতীতে সংগ্রাম করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে মানুষের মনে যে সব ধারণার সৃষ্টি হয় তার প্রভাবেই আজ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে আসছে। বর্তমান যুগেও একদল শ্রেণী যুদ্ধের ফলে লাভবান হয় এবং স্থম্পেটার মনে করেন যে তাদের

1. "And history, in truth, shows us nation and classes—most nations furnish an example at some time or other—that seek expansion for the sake of expanding, war for the sake of fighting, victory for the sake of winning, dominion for the sake of ruling." Joseph A. Schumpeter, *Imperialism and Social Classes.*

চেষ্টাতেই যুদ্ধের মনোভাব এবং সামরিক সংগঠন আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে।[1]

সুম্পেটারের এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা যে মতামতই পোষণ করি না কেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আধুনিক সভ্য যুগে যুদ্ধকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া খুবই বিস্ময়কর। যুদ্ধকে কেবল স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া হয় না, গৌরবের জিনিষ বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইতিহাসে সামরিক নেতারাই সাধারণতঃ বীর আখ্যা পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক দেশ তার অতীতের বীর সামরিক নেতা এবং তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান সম্বন্ধে গর্ব বোধ করে। বিদেশের সামরিক নেতারাও আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ন সামরিক নেতা হিসেবেই বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে থাকেন—অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কথা আমাদের মনে তেমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political culture) যুদ্ধের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই ধারাকে বিশেষ ভাবে পরিপোষণ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যুক্তিবাদ ও গণতন্ত্রের যুগেও জাতীয়তাবাদের জঙ্গী মনোভাব খুবই প্রবল। এই প্রসঙ্গে এরিক ফ্রোম (Erich Fromm)-এর স্বাধীনতার ভয় বা fear of freedom সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে অনেক মানুষ নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, অসহায় এবং অক্ষম মনে করে—জীবন উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ এবং একঘেয়ে মনে হয়। স্বাধীনতা তখন একটা বোঝায় (burden) পরিণত হয় এবং সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মানুষ পরিত্রাণ পেতে চায়। তখন কোন বৃহৎ এক সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে

1. সুম্পেটার মনে করেন যে আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতন্ত্র এবং যুক্তিবাদের ফলে ধীরে ধীরে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে। পুঁজিবাদের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ সৃষ্টি হয় তা তিনি বিশ্বাস করেন না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অন্যান্য বাধা এবং তার ফলে জিনিষপত্র বিক্রী করার জন্য বাজার নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় তার ফলে যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধে তা তিনি অস্বীকার করেন না, তবে তিনি মনে করেন যে অবাধ বাণিজ্যের পথে এই সব অন্তরায়ের জন্য পুঁজিবাদকে দায়ী করা চলে না—প্রাক্-পুঁজিবাদ যুগের সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাধারাই তার জন্য দায়ী।

স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দায়িত্ব থেকে সে মুক্তিলাভ করে। সেই বৃহৎ সত্তার সাথে নিজেকে একাত্ম করে সে নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং জীবনকে সার্থক মনে করে। জাতি বা রাষ্ট্রই সেই বৃহৎ সত্তা হিসেবে দেখা দেয় (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেণী বা দলও হতে পারে) এবং জাতির গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে ব্যক্তিমানুষ নিজের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চায়। জাতি বা রাষ্ট্রের বৃহত্তর সত্তায় নিজেকে বিলীন করে দিয়ে মানুষ জাতি ও রাষ্ট্রের নামে এমন সব বীভৎস কাজ করতে পারে যা ব্যক্তি হিসেবে তার পক্ষে করা মোটেই স্বাভাবিক নয়। জার্মানীর নাৎসীরা তথাকথিত জাতীয় স্বার্থে ইহুদীদের উপর যে অত্যাচার করেছে ব্যক্তি হিসেবে কোন জার্মানের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের উত্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়েই এরিক ফ্রোম (Erich Fromm) তাঁর বিখ্যাত বই *Escape From Freedom*-এ উক্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। পৃথিবীর সব দেশেই জাতির নামে যুদ্ধ করা গৌরবের, যদিও ব্যক্তি মানুষের পক্ষে অন্য মানুষকে হত্যা করা চরম অপরাধ। যুদ্ধে জয়লাভ করাকে প্রত্যেক দেশই জাতীয় গৌরব বলে মনে করে। জাতীয়তাবাদের এই ধারাকে যুদ্ধের একটি কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

জাতীয়তাবাদের এই মনোভাব কোন কোন ক্ষেত্রে উগ্র রূপ ধারণ করে প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের ইন্ধন যোগায়। মুসোলিনী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁর ফ্যাসীবাদ শান্তির আদর্শে বিশ্বাস করে না। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে যুদ্ধের সময়ই মানুষের শক্তি এবং তার শৌর্যবীর্য চরমে উঠে এবং যে জাতির যুদ্ধ করার সাহস আছে সেই জাতিই মহত্ত্ব লাভ করতে পারে। বিশ্বে চিরদিনের জন্য শান্তি স্থাপন করা মুসোলিনী সম্ভব মনে করেন না এবং তার কোন প্রয়োজন আছে বলেও তিনি স্বীকার করেন না। মুসোলিনীর কাছে শান্তি কাপুরুষতারই নামান্তর।[1] জার্মানীর জেনারেল বার্নহার্ডি (General Friedrich Von Bernhardi) 1914 সালে প্রকাশিত *Germany and the Next War* পুস্তকে বলেন যে শান্তির আকাঙ্খা সভ্য

"Fascism...believes neither in the possibility nor the utility of perpetual peace. It thus repudiates the doctrine of Pacifism—born of a renunciation of the struggle—as an act of cowardice in the face of sacrifice. War alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the peoples who have the courage to meet it."

জাতিগুলিকে দুর্বল করে তুলেছে। মানবজাতির উন্নতির জন্য যুদ্ধকে তিনি একটি জৈব (biological) প্রয়োজন বলে মনে করেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার ফলে মানবজাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে অনেক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[1] কোন দেশের রাজনৈতিক মতবাদে এই ধরনের চিন্তা যদি স্থান পায় তবে তা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করেন তুলবে। যুদ্ধ কোন কোন সময় প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু যুদ্ধের মহিমা কীর্তন করে তাকে সভ্যতা ও প্রগতির বাহন রূপে বর্ণনা করা খুবই অস্বাভাবিক। তবে এই ধরনের জঙ্গীবাদী মনোভাবকে জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য মনে করা উচিত নয়। এটা হ'ল জাতীয়তাবাদের উগ্ররূপ।

অর্থনৈতিক কারণ

যুদ্ধের অর্থ নৈতিক কারণের উপর অনেকেই জোর দিয়েছেন কিন্তু অর্থনীতি কি ভাবে যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে সেই সম্বন্ধে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মাঞ্চুরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে নিজেদের দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য জাপান 1931 খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। সাম্রাজ্যবাদ এবং পররাজ্য গ্রাসের পিছনে এই অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে সক্রিয় থাকে। নিজের দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করা সব রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিরই একটি প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু যুদ্ধই সে উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় তা মনে করার কোন কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমেও একটি রাষ্ট্র নিজের দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে। এই সম্পর্কে Sir Norman Angell-এর অভিমত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত বই *The Great Illusion*-এ তিনি বলেছেন যে আধুনিক যুগে একটি রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করার জন্য যুদ্ধে অন্য দেশকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য বিস্তার করার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন যুগে বিজিত দেশের অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং

1. "The desire for peace has rendered most civilized nations anæmic... War is a biological necessity of the first importance, a regulative element in the life of mankind which cannot be dispensed with, since without it an unhealthy development will follow... Wars, begun at the right moment with manly resolution, have effected the happiests results both politically and socially."

তাদের সঞ্চিত ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে একটি দেশ অর্থ নৈতিক ভাবে লাভবান হ'তে পারত। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা আজ আর নেই এবং আধুনিক যুগে অন্য দেশের সঞ্চিত সম্পদ আত্মসাৎ করেও একটি রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। নিয়মিত ভাবে সম্পদ উৎপাদন ও তা বিনিময় করেই আধুনিক যুগে একটি দেশ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে। উৎপাদিত সম্পদ বিনিময়ের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন হয় না, অন্য স্বাধীন দেশের সাথে বিনিময় করেও অর্থনৈতিক ভাবে একটি রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে। তা ছাড়া, বর্তমান যুগে যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। অতএব Norman Angell এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "wars do not pay", অর্থাৎ যুদ্ধ করে কোন অর্থ নৈতিক লাভ হয় না। তিনি বলেন যে আধুনিক যুগেও অনেকের ধারণা আছে যে যুদ্ধ করে একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। এই ধারণাকেই তিনি "Great Illusion" বা অবাস্তব কল্পনা বলে অভিহিত করেছেন। এই অসম্ভব কল্পনার বশবর্তী হয়ে আজও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক লাভের আশায় যুদ্ধ করা যে সম্ভব তা Norman Angell স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন যে দেশের বৈদেশিক নীতি যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা যতদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবেন না যে "Wars do not pay" অর্থাৎ অর্থনৈতিক লাভের জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক লাভের আশায় যুদ্ধ চলতে থাকবে।

আধুনিক যুগের বিশ্বযুদ্ধ এতই ব্যয়বহুল যে এই ধরণের যুদ্ধের ফলে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব তা কেউ আর চিন্তা করে না। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশ যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তা যদি গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা যেত তবে দেশের অর্থনীতির অনেক উন্নতি সম্ভব হ'ত। অতএব দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী নেই। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ উন্নয়নশীল জাতি তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কই কামনা করে। যুদ্ধের ফলে তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে—এই তাদের ভয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের পিছনে অর্থ নৈতিক লাভের আশা সক্রিয় ছিল।

অনেকের ধারণা আছে যে বড় বড় ব্যাঙ্কমালিক এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য

চেষ্টা করে থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে এই ধরনের ব্যবসায়ীরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি অস্ত্র উৎপাদনের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। বিদেশে অস্ত্র রপ্তানী করতে না পারলে মার্কিন অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই অস্ত্র রপ্তানীর প্রবণতা যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টির সহায়ক, কারণ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা যদি না থাকে তবে অস্ত্র রপ্তানীর সম্ভাবনা স্বভাবতঃই হ্রাস পাবে। নাৎসী জার্মানী বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অস্ত্র উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং তার ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একমাত্র অস্ত্র ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিনা তা খুবই সন্দেহজনক।

উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উদারনৈতিক চিন্তাধারায় (Liberalism) যাঁদের বিশ্বাস ছিল তাঁরা আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের পথে বাধা নিষেধগুলিকেই যুদ্ধের প্রধান কারণ বলে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদিত সম্পদ স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে তবেই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখনই এই অবাধ বাণিজ্যের ধারাকে বাধা দেবার জন্য উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক ধার্য করে তখনই আন্তর্জাতিক বিবাদ ও সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং অনেক সময় তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। তাঁরা মনে করতেন যে আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ধীরে ধীরে যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে পৃথিবী মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগের অভাবকেই যুদ্ধের একমাত্র বা প্রধান কারণ মনে করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে নানা ধরনের সংঘর্ষ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিরই সুবিধা হবে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সংরক্ষণ নীতি প্রয়োজন। জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার সুযোগ যদি না থাকে তবে অনুন্নত দেশগুলির সাথে উন্নত দেশগুলির সহযোগিতা কখনও সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশই যথাসম্ভব স্বনির্ভরতা অর্জন করার চেষ্টা করে—যুদ্ধের

ভয় অনেক সময় এই স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রবণতাকে দৃঢ়তর করে। স্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্যই অনেক সময় অবাধ বাণিজ্যের পথকে রোধ করতে হয়। সংরক্ষণ নীতি এবং স্বনির্ভরতার আদর্শ জাতীয়তাবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বর্তমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা সফল হ'তে পারে না।

মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করে থাকেন। পুঁজিবাদে উৎপাদন ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল মুনাফা এবং তাই শিল্পপতিরা অধিকতর মুনাফা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের যথাসম্ভব অল্প মজুরী প্রদান করে। ফলে শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা খুব সীমিত থাকে। অপর দিকে প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পপতিদের সংখ্যাও হ্রাস পায়। শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের দারিদ্র্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্যের জন্য শ্রমিকরা দেশে উৎপাদিত জিনিষপত্র বেশী ক্রয় করতে পারে না এবং তখন তথাকথিত অতি-উৎপাদনের (over-production) সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পপতিরা যখন বিদেশে তাদের উৎপাদিত জিনিষপত্র বিক্রী এবং উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করার চেষ্টাও করে। বিদেশের বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে থাকে এবং এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিরাই নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে. কিন্তু পৃথিবীতে সাম্রাজ্য স্থাপনের মত জায়গা খুবই সীমাবদ্ধ। তাই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে (মার্কসবাদীদের মতে শিল্পপতিরাই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পরিচালনা করে) যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং শ্রেণী স্বার্থকেই মার্কসবাদীরা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করে থাকেন।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও ত বহু যুদ্ধ হয়েছে। মার্কসবাদ সেই সব যুদ্ধের কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে না। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে যুদ্ধ হয় না, এই কথাও অনেকে স্বীকার করতে রাজী নন। প্রায়ই দেখা যায় যে একটি যুদ্ধের পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য একই সাথে বর্তমান থাকে। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করতে গিয়েই ইংলণ্ডের হ্যারল্ড লাস্কী (Harold Laski) স্বীকার করেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে অনেক যুদ্ধের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক

কারণ ছাড়া রাজনৈতিক, ধর্মীয়, রাজবংশের মর্যাদা ইত্যাদি অন্যান্য কারণও জড়িত ছিল। তিনি বলেন যে যুদ্ধের সাথে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি লাভের উদ্দেশ্য সব সময়ই যুক্ত থাকে—কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে এবং কখনও অন্য উদ্দেশ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে। লাস্কী (Laski) মনে করেন যে যুদ্ধকে তার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে না পারলে সেই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।[1] যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণ কেউ অস্বীকার করে নি তবে অর্থনৈতিক কারণকে একমাত্র কারণ বলে মেনে নিতে অনেকে রাজী নন। তা ছাড়া মনে রাখা উচিত যে অর্থ নৈতিক কারণ বলতে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটকেই বুঝায় না। Jacob Viner এবং Eugene Staley 1880 খৃষ্টাব্দ থেকে 1914 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে না। Jacob Viner বলেন যে একটি দেশের সরকার অপেক্ষা সেই দেশের ব্যাঙ্কাররা (bankers) সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি অনেক বেশী পরিমাণে কামনা করে। তাঁরা সরকারী নীতি নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে তিনি একেবারেই মনে করেন না। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির জন্য তিনি সরকারকেই বেশী দায়ী করেন। Eugene Staley তাঁর *War and the Private Investor* বইতে বলেন

1. "There are, no doubt many wars before the nineteenth century in which non-economic motives, dynastic, religious, political, were of great significance. But, even in those wars a careful scrutiny of their purpose always leaves the economic contest a relevant one. The drive to war is never divorced from the search by the state after economic power. The search may be indirect, as when a state seeks for a strategic frontier ; or it may be mixed, as in the French desire to recover Alsace-Lorraine, where sentiment born of historic tradition and the interest of French heavy industry were united in perhaps fairiy equal proportions. But the explanation of war is never adequate where it fails to find an economic perspective to its occurrence." Harold. J. Laski, *The State in Theory and Practice.*
যুদ্ধের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য কেবল উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। আলসাস্-লোরেন (Alsace-Lorraine) সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক লাস্কী অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই সমস্যা উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীরই সমস্যা।

যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনীতি অপেক্ষা রাজনৈতিক স্বার্থের প্রভাব অনেক বেশী। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য যারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে বা বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করে কেবলমাত্র তাদের স্বার্থের জন্য কোন বড় রকমের আন্তর্জাতিক বিরোধ উপস্থিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *A Study of war*-এ বলেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ স্থাপিত হওয়ার পরে যুদ্ধের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে।

রাজনৈতিক কারণ

যুদ্ধের নানাবিধ রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য অথবা অর্জন করার জন্য অনেক দেশ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। সাম্রাজ্য স্থাপন এবং জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ যাতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেক রাষ্ট্র যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। 1866 খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া যখন সাত সপ্তাহের মধ্যে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তখন ইউরোপের শক্তিসাম্য হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইউরোপে প্রাশিয়ার শক্তি খুব বৃদ্ধি পায় এবং তাই তুলনামূলক বিচারে ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস পেল। ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় (সেই যুদ্ধে অবশ্য ফ্রান্স পরাজিত হয়েছিল)। অনেক সময় যুদ্ধই যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[1] অর্থাৎ একটি যুদ্ধের মধ্যেই অন্য যুদ্ধের বীজ নিহিত থাকে। পরাজিত দেশ তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অনেক সময় পরবর্তীকালে যুদ্ধ আরম্ভ করে। 1870 খৃষ্টাব্দে জার্মানী কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ফ্রান্স প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় জার্মানীর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে এবং ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 1896 খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার কাছে ইতালী পরাজিত হয়। তাই 1935 খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী সমস্ত ইথিওপিয়া অধিকার করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের বিভিন্ন মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে মতবিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে।

1. "The principal cause of war is war itself." R. G. Hawtrey, *Economic Aspects of Sovereignty.*

প্রথম মহাযুদ্ধে জয়ী হলেও ইতালী প্যারিস শান্তিচুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় না এবং শেষ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। একটি দেশ যুদ্ধ আরম্ভ করলে অন্য দেশও যুদ্ধ আরম্ভ করতে সাহসী হয়। 1931 খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং জতিসংঘের ব্যর্থতা মুসোলিনীকে ইথিওপিয়া আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। কয়েকটি শক্তি একদিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলে অপরদিকে অন্য শক্তি যুদ্ধ আরম্ভ করার সুযোগ পায়। পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পেল। এই সব উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে একটি যুদ্ধ অন্য যুদ্ধের কারণ হ'তে পারে। তবে এই কথা কখনও মনে করা উচিত নয় যে একটি যুদ্ধের ফলেই অন্য একটি যুদ্ধ এবং আর অন্য কোন কারণ থাকে না। তা ছাড়া উপরে যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হ'ল তার মধ্যে কার্যকারণ কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ বিজিত দেশ যে বিজয়ী দেশের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করবেই তার কোন যুক্তি নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাজিত জার্মানী বিজয়ী শক্তিবর্গের বন্ধু হিসেবেই রয়েছে।

অনেক সময় একটি দেশ তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। যুদ্ধের সময় একটি জাতি যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় অন্য সময় তা হয় না। তাই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বা দেশের ঐক্য বজায় রাখার জন্য অনেক সময় যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিসমার্কের যুদ্ধ ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্র-সমূহকে উত্তর জার্মান কন্‌ফেডারেশনের (North German Confederation) সথে একত্র করা। পাকিস্তান নিজের দেশের ঐক্য বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের কাছে ভারতবর্ষকে জাতীয় শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার নীতি গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় সরকারকে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধের কোন সাধারণ কারণ দেখানো সম্ভব নয়। একমাত্র এই কথা বলা যায় যে একটি রাষ্ট্র যদি অপর রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই রাষ্ট্র যুদ্ধ করবে। তা ছাড়া এমন কিছু বলা যায় না যার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে একটি দেশ যে সব সময় যুদ্ধ করে তাও ঠিক নয়। হিটলার যুদ্ধ না করে অষ্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করে। একটি

বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ আরম্ভ হবে কিনা তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-গুলির শক্তি, নীতি এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার উপর। আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূল না থাকায় দুর্বল চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূলে থাকায় পোল্যাণ্ড তার দুর্বলতা সত্ত্বেও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অভাব

অনেকেই স্বীকার করবেন যে সমস্ত যুদ্ধের একটি সাধারণ কোন কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই সমস্ত কারণগুলো বিদ্যমান থাকে কিন্তু তবু (গৃহযুদ্ধ ছাড়া) একটি দেশের মানুষ মোটামুটি ভাবে শান্তিতে বসবাস করে। একটি দেশে বিভিন্ন মানুষ বা দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে যতই মতবিরোধ বা স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হোক না কেন তা যুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে না। এর প্রধান কারণ হ'ল দেশে সরকারের আইন এবং সেই আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করার মত সরকারের ক্ষমতা। সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে একটি দেশের বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবের ফলেই আন্তর্জাতিক বিরোধ অনেক সময় যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিরোধ ও স্বার্থের সংঘাত থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধকে পরিহার করা সম্ভব হবে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবকেই অনেক যুদ্ধের প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা বিচার করলে এই মতবাদ অনেকটা যথার্থই মনে হয়। নিজ দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা সমষ্টিগত নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থার উপর কোন রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে বসে থাকতে পারে না। সাধ অনুসারে এবং প্রয়োজন মত প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত অথবা সংগ্রহ করতেই হয়। নিরাপত্তার জন্য বহু রাষ্ট্রের সাথে অনেক সময় নানা রকমের চুক্তি স্থাপন করতে হয়। একটি দেশের

সামরিক প্রস্তুতি (তা যদি সম্পূর্ণরূপে নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও হয়) অন্য দেশের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার করে। ফলে অন্য দেশও সামরিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করে। এই ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বাড়াবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনেক সময় একটি দেশ অন্য রাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য এবং নীতি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না বলে তার মনে অতিমাত্রায় সন্দেহ ও ভয় জাগরিত হয় এবং অনেকে মনে করেন যে অন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই অনেক সময় যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ভয়, সন্দেহ, অস্ত্রসজ্জা—এ সমস্তই যুদ্ধের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা করার কোন কার্যকরী উপায় না থাকায় অনেক সময় বল প্রয়োগ করে যুদ্ধের মাধ্যমেই সেই বিরোধ মীমাংসা করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই বোঝা গেল যে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ যতদিন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকবে, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যতদিন পর্যন্ত নিজেদের প্রস্তুতির উপরই নির্ভর করতে হবে, কোন আন্তর্জাতিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে একত্র করা যাবে না ততদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সরকার ব্যতীত কোন দেশের পক্ষে অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আন্তর্জাতিক সরকার ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনও অসম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবই যুদ্ধের কারণ।

যুদ্ধ সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

যুদ্ধের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে যে রক্ষা করা উচিত সেই বিষয়ে বর্তমানে প্রায় সকলেই একমত। প্রত্যেক দেশেই শান্তির জন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেক সরকারই নিজের নীতিকে শান্তির পক্ষে সহায়ক রূপ বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি সেই সম্বন্ধে কোন ঐক্যমত গড়ে উঠে নি। এই বিষয়ে যে সব বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল। যুদ্ধের কারণ যেখানে আলোচনা করা হয়েছে সেখানেই সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। যুদ্ধের কারণগুলি দূর করতে পারলেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল: সেই কারণগুলি কি ভাবে দূর করা সম্ভব?

একদল মনে করেন যে বিশ্বরাষ্ট্র (World Government অথবা World Federation) স্থাপন করাই যুদ্ধ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। বিশ্বরাষ্ট্রের অধীনে বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং বিশ্বরাষ্ট্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দল মনে করে যে আন্তর্জাতিক আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা না করতে পারলে বিশ্বশান্তির আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আইনকে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করার জন্যই তাঁরা বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেছেন।

অপর একদল মনে করেন যে আইন করে বা কোন কৃত্রিম ও যান্ত্রিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। মানুষের মন থেকে যুদ্ধের মনোভাব দূর করা প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু সেই অনুসারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য তাঁরা শিক্ষার উপরই জোর দেন। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা প্রধানতঃ তার শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। তাই মানুষকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভুলে গিয়ে বিশ্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমানে জাতির প্রতি আনুগত্য মানুষকে নানাভাবে শেখানো হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব যাতে মানুষ সমস্ত পৃথিবীর সাথে নিজেকে একাত্ম করে ভাবতে শিখবে।[1] UNESCOর উদ্দেশ্য অনেকটা এই রকমের। এই সংগঠনের সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা আছে যে মানুষের মনেই যুদ্ধের উৎপত্তি হয় এবং তাই মানুষের মনেই শান্তির দুর্গ গড়ে তুলতে হবে।[2] বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবই নয়। তাই তাঁরা শিক্ষার উপরই জোর দেন।

---

1. "Identification with the nation and loyalty to it are among the thing learned. There is nothing in the nature of man which precludes identification with larger entities, up to and including the world as a whole" Vernon Van Dyke, *International Politics*.
2. "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed."

গান্ধীজী অহিংসার উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচলিত যুদ্ধ নীতির এক অহিংস বিকল্প দেওয়ার চেষ্টা করে ছিলেন। গান্ধীজী যুদ্ধের ঠিক বিরুদ্ধে নয়। তিনি বলেন যে অহিংস পদ্ধতিতে যদি যুদ্ধ পরিচালনা করা যায় তবে তা আরও বেশী কার্যকরী হয় এবং প্রচলিত যুদ্ধের কুফল থেকে তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। গান্ধীজীর মতে অহিংসার অর্থ ভীরুতা নয়—ভীরুতার চেয়ে তিনি হিংসাকেই ভাল মনে করেন কিন্তু হিংসা থেকে অহিংসা আরও ভাল। অহিংসা নীতির উপর ভিত্তি করে গান্ধীজী রণ কৌশলের যে পদ্ধতি গঠন করেন তা সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে ইউরোপের শান্তিবাদী আন্দোলন বা Pacifism-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের সাথে যাঁরা জড়িত আছেন তাঁরা যুদ্ধের বিরোধী। এঁদের মধ্যেও বিভিন্ন মত আছে—কেউ বিশেষ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, আবার অনেকে কোন কারণেই যুদ্ধকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নন, একদল কেবল যুদ্ধের নয় সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধী। অনেকে খৃষ্টধর্মের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধের বিরোধিতা করেন (এই গোষ্ঠিকে সাধারণতঃ Quaker বলা হয়), আবার অনেকে ধর্মীয় যুক্তি না দিয়ে সম্পূর্ণ মানবতার নামে যুদ্ধকে বর্জন করা প্রয়োজন মনে করেন। যাই হোক Pacifist-দের সাথে গান্ধীবাদের অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় এক রকম।

যুদ্ধকে যাঁরা সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা স্বভাবতঃই যুদ্ধের অর্থ নৈতিক সমাধান দিয়ে থাকেন। মার্কসবাদীদের বিশ্বাস যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে সমস্ত পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে পারলেই যুদ্ধ সমস্যার সমাধান সম্ভব। যুদ্ধ সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ধারণা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে আধুনিক যুগের যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের ফলেই সংঘটিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন—বিভিন্ন দেশের শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। তাই পৃথিবীর সব দেশে শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে যুদ্ধের আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

শক্তিসাম্যের নীতি মাধ্যমেও যুদ্ধ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা বহুদিন ধরে চলে আসছে। এই নীতি যুদ্ধের কারণগুলিকে দূর করে যুদ্ধ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে না—বরং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত থেকে বিরোধী

পক্ষ যাতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহস না পায় সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে চায়। এই পারমাণবিক যুগেও এই নীতি মোটামুটি ভাবে প্রচলিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই এমন ভাবে সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করে যে কেউ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না। এই নীতি অস্ত্র সজ্জার মাধ্যমেই শান্তি বজায় রাখা সম্ভব বলে মনে করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেকে এই মত পোষণ করেন যে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জাই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সমস্যা সমাধান করে দিতে সক্ষম হবে। বর্তমান পৃথিবীর বৃহৎ দুইটি শক্তির কোনটিই প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হলে উভয়ের ধ্বংসই সুনিশ্চিত। এই অবস্থায় কোন পক্ষই যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারে না। তাই বলা হয় যে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জাই যুদ্ধ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা উপরিউক্ত সমাধানগুলির মধ্যে শেষটি ছাড়া আর কোনটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। সমাধানের যৌক্তিকতা তার বাস্তবতার উপরই নির্ভর করে। আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান যদি বাস্তবসম্মত না হয় তবে তার মূল্য খুবই সীমিত। বিশ্বরাষ্ট্র যদি স্থাপন করা যায় তবে যুদ্ধের সমস্যা সমাধান হতে পারে, কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করা সম্ভব কি? অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে কোন আন্তর্জাতিক সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নেবে তা মনে করার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক সমস্যার কোন সমাধানই বর্তমান অবস্থায় কার্যকরী হতে পারে না। তা ছাড়া এই মতবাদের সমালোচনা করে বলা যায় যে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সব সময় যে শান্তি রক্ষায় সমর্থ হয় তা মনে করার কোন কারণ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে গৃহযুদ্ধের উদাহরণ প্রচুর। একটি দেশের দুইটি বৃহৎ ও শক্তিশালী গোষ্ঠির স্বার্থ যদি পরস্পরবিরোধী হয় তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ শান্তি রক্ষায় অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক এই সমস্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আন্তর্জাতিক সরকারের পক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। শিক্ষার ফলে মানুষের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর

পরিবর্তন হবে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা মানব প্রকৃতিকে অত্যন্ত সরলভাবে বিচার করে থাকেন। মানবতাবাদী শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত একটা সময়ের মধ্যে তা সমস্ত দেশের মানুষকে বিশ্বমুখীন করে তুলতে পারবে, এই রকম আশাবাদী হওয়ার কোন কারণ নেই। গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুগামীরাই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। নিরস্ত্র দেশ রণকৌশল হিসেবে গান্ধীজীর নীতি অনুসরণ করতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করে চলবে তা কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। অর্থ নৈতিক কারণ ছাড়া যুদ্ধের আরও অন্য কারণ আছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষে মার্কসীয় সমাধানকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সম্পর্ক অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্ক মার্কসীয় সমাধানকে সমর্থন করে না। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পেলেও পুরাতন পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা কিছুই কমে নি। বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা হয়ত হ্রাস পেয়েছে কিন্তু আঞ্চলিক যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পায় নি। তা ছাড়া পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই যদি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয় তবে ভবিষ্যতে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এই অবস্থায় যুদ্ধ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা না করে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে হ্রাস করার চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদির সাহায্যেই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে হ্রাস করা এবং যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ

1. শক্তিসাম্যের নীতি
2. সমষ্টিগত নিরাপত্তা
3. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূরীকরণ
4. নিরস্ত্রীকরণ
5. আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিবোধ
6. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

সূচনা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন ও সার্বভৌম। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে। অতএব এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা থাকা সম্ভব নয়—প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যেমন খুশী তেমন ভাবে চলতে পারে। কিন্তু আসলে বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে অরাজকতার ক্ষেত্র নয়। এখানেও নিয়মশৃঙ্খলা আছে, যদিও সেই নিয়মশৃঙ্খলা সব সময় সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় তা বলা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনও সার্বভৌম হ'লেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আধুনিক যুগে সেই নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় শক্তির উপর নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণগুলিই প্রধান :

(1) শক্তিসাম্যের নীতি,

(2) সমষ্টিগত নিরাপত্তার চেষ্টা,

(3) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার চেষ্টা,

(4) নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস,

(5) আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিবোধ,

(6) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

1. শক্তিসাম্যের নীতি

শক্তিসাম্যের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

শক্তিসাম্যের নীতি মানুষের একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি রাষ্ট্র বা কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্র একত্র হয়ে যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে তবে সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমষ্টি অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। অতএব কোন রাষ্ট্রকে বা কোন রাষ্ট্রজোটকে অন্য রাষ্ট্রজোটের তুলনায় বেশী শক্তিশালী হ'তে দেওয়া উচিত নয়। একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার প্রবণতা তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পায়। একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে যে অন্য কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট তার আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম নয় তখন তার মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সমক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি বর্তমান থাকে তবে কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটই অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটকে সহজে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না। তার ফলে সমস্ত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অধিকতর নিরাপদ হয়ে উঠে। একটি দাড়িপাল্লার উভয় দিকে যখন সমান ওজনের জিনিষ দেওয়া যায় তখন সেই দাড়িপাল্লার সমতা বা equilibrium আসে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের সমক্ষমতাসম্পন্ন অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি থাকে তবেই শক্তিসাম্য বা equilibrium সৃষ্টি হতে পারে। আর এই শক্তিসাম্য বা equilibrium সৃষ্টি হ'লেই একটি রাষ্ট্র সহজে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না। শক্তিসাম্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ফে (Prof. Sidney B. Fay) *Encyclopaedia of the Social Sciences*এ বলেছেন: "It means such a 'just equilibrium' in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the others."

শক্তিসাম্যের নীতি আঞ্চলিক ভিত্তিতে অথবা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শক্তিসাম্যের রাজনীতি প্রধানতঃ ইউরোপের শক্তিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যাতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শক্তিসাম্যের রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। অবশ্য জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেই শক্তিসাম্য গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে শক্তিসাম্যের রাজনীতিতে সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই শক্তি দুইটি রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। বিশ্বরাজনীতিতে এই শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা ছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলেও শক্তি-সাম্য রক্ষা করার চেষ্টা চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই এই আঞ্চলিক শক্তিসাম্য রক্ষার পক্ষপাতী। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে এই নীতি কি ভাবে এবং কতখানি পরিবর্তিত হ'তে পারে তা এখনও পরিষ্কার নয়), মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্র সমূহ ও ইসরাইলের মধ্যে এই ধরণের শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। বর্তমান যুগের এই আঞ্চলিক শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা বিশ্ব রাজনীতি অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিসাম্য রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

শক্তিসাম্যের রাজনীতি কখনও সরল (simple) আবার কখনও জটিল (complex) রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে বা পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চলে যদি কেবলমাত্র দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিশালী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট থাকে তবে সেই দুইটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটকে কেন্দ্র করেই শক্তিসাম্যের রাজনীতি গড়ে উঠে। এই ধরণের অবস্থাকে সরল শক্তিসাম্য বলা হয়। কিন্তু যদি কয়েকটি প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে তবে সেই অবস্থাকে জটিল শক্তিসাম্য বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে দুইটি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি হওয়ার ফলে পৃথিবীতে সরল শক্তিসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক নতুন রাষ্ট্র নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করায় কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হ'লেও মূল কাঠামোর

কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীর রাজনীতিকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করা আর সম্ভব নয়। শক্তিসাম্যের রাজনীতি তাই অনেক পরিমাণে জটিল রূপ ধারণ করেছে।

সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন শিবির বা জোটে বিভক্ত হয়ে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই জোটগুলি সুপরিবর্তনীয় (flexible) বা দুষ্পরিবর্তনীয় (rigid) হতে পারে। প্রয়োজন হ'লেই একটি রাষ্ট্র যখন সহজে তার নীতি এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক পরিবর্তন করতে পারে তখন এই জোটগুলিকে সুপরিবর্তনীয় বা flexible বলা হয়। কিন্তু যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন তিক্ত হয়ে উঠে যে প্রয়োজন হ'লেও তারা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে না তখন সেই সম্পর্ককে দুষ্পরিবর্তনীয় বা rigid বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত দুইটি শিবিরের সম্পর্ক দুষ্পরিবর্তনীয় রূপ ধারণ করে। কিন্তু পরে সেই অনমনীয় মনোভাব অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জোট পরিবর্তনের মনোভাবও দেখা দেয়। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিবিরে যোগ দিলেও চীনের সাথে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়।

শক্তিসাম্য নীতি বজায় রাখতে হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির কয়েকটি নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। Norman J. Padelford এবং George A. Lincoln তাঁদের বই *International Politics*-এ এই রকম ছয়টি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি রাষ্ট্রকে শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক পরিবর্তন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব বা শত্রুতা থাকতে পারে না। ইংলণ্ডের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 1848 খৃষ্টাব্দে লর্ড পামারষ্টোন বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের কোন চিরস্থায়ী বন্ধু বা চিরস্থায়ী শত্রু নেই, কিন্তু ইংলণ্ডের স্বার্থ হল বৃটিশ নীতির স্থায়ী ভিত্তি (no perpetual friends or natural enemies but eternal interests)। একটি দেশ তার স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব

স্থাপন বা বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বৎসর পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট চীনের বিরোধিতা করে, কিন্তু পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সেই রাষ্ট্রের সাথে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, শক্তিসাম্য বজায় রাখতে হলে কোন রাষ্ট্রই যাতে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিজেকে বিশেষভাবে দুর্বল করে রাখাও বিপদজনক, কারণ তার ফলে অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়তঃ কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করে অন্য রাষ্ট্রের উপর হামলা শুরু করে তবে প্রয়োজন হ'লে বলপ্রয়োগ করে তা রোধ করার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রস্তুত থাকা উচিত। হিটলারের পররাজ্যগ্রাস করার নীতিকে প্রথম হ'তে বাধা না দেওয়ার ফলেই শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। চতুর্থতঃ, দুটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের মধ্যে সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে তাদের মধ্যে যে কোন সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে তবে শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রদের উচিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষকে সমর্থন করা। তা হ'লে যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। পঞ্চমতঃ, যুদ্ধের পর একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে যাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন বিশেষ রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে যুদ্ধের পরে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ষষ্ঠতঃ, আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি সর্বদা এক রকম থাকে না—প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে। সেই সব পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করেই শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

শক্তিসাম্যের রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিগুলিই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অথবা তাদের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রজোটগুলির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করাই এই নীতির উদ্দেশ্য। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব কোন ভূমিকা এখানে সম্ভব নয়। তারা যদি একত্র হ'তে না পারে তবে ভারসাম্য রাজনীতিতে তাদের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না।

এই ধরণের রাজনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং কোন রকম পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করতে

পারে না। যে সব রাষ্ট্র স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট তারা সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত রকম পরিবর্তনকেই শক্তিসাম্যের প্রতি বিঘ্ন মনে করে। স্থিতাবস্থাতেই যাদের জাতীয় স্বার্থ নিহিত তারা শক্তিসাম্য ও বিশ্বশান্তির নামে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। একটি রাষ্ট্রের শক্তি কখনও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কও পরিবর্তনশীল। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব কঠিন। ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে কি না তা বুঝাও দুষ্কর। একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের পক্ষে অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের শক্তির সঠিক পরিমাণ করা প্রায় অসম্ভব। একটি দেশের শক্তি বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে এবং তার মধ্যে অনেকগুলিই পরিমাপযোগ্য নয়। একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, লোকসংখ্যা এবং অস্ত্রসম্ভার পরিমাপযোগ্য হ'লেও তা দিয়ে একটি রাষ্ট্রের শক্তি বোঝা যায় না। ভূখণ্ড বা লোকসখ্যার পরিমাণের উপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে না। একটি রাষ্ট্রের অস্ত্রসজ্জার সঠিক খবর অন্য দেশের পক্ষে সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। একটি দেশের জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মনোবল, সরকারের দক্ষতা, রাষ্ট্রনেতাদের সাহস, চাতুর্য ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য ইত্যাদি বহু উপাদান পরিমাপযোগ্য নয়। একটি রাষ্ট্রের শক্তি যদি পরিমাপযোগ্য না হয় তবে শক্তিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা কি করে নির্ণয় করা সম্ভব? তা ছাড়া একটি রাষ্ট্র কেবল মাত্র তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে না—অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের সাহায্যও অনেক সময় লাভ করে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দেশের সাহায্য একটি রাষ্ট্র লাভ করতে সমর্থ হবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অনেক চুক্তিই গোপন রাখা হ'ত। একটি রাষ্ট্র যে সর্বদা চুক্তি (সে চুক্তি গোপন বা প্রকাশ্য যাই হোক না কেন) মেনে চলবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইতালী তার বন্ধুরাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সাহায্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত ইতালী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সব কারণে একটি বিশেষ সময়ে শক্তিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে কি না তা স্থির করা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র যুদ্ধেই শক্তির আসল পরীক্ষা সম্ভব কিন্তু যুদ্ধকে পরিহার করাই শক্তিসাম্য নীতির উদ্দেশ্য।

প্রতিপক্ষের শক্তি পরিমাপ করা সম্ভব নয় বলে প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। আসলে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই প্রতিপক্ষের সমান শক্তি অর্জন করে সন্তুষ্ট থাকে না। প্রতিপক্ষ থেকে অধিকতর শক্তিশালী হওয়াই তাদের লক্ষ্য। Spykman তাঁর *America's Strategy in World Politics* বইতে লিখেছেন: "The truth of the matter is that states are interested only in a balance of power which is in their interest. Not an equilibrium, but a generous margin is their objective." প্রতিপক্ষের শক্তি সঠিক ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয় বলে সামরিক প্রস্তুতিরও কোন শেষ থাকে না। তাই শক্তিসাম্য বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হ'তে পারে না। Morgenthau ঠিকই বলেছেন: "The balance of power thus assumes a reality and a function that it really does not possess."

শক্তিসাম্য নীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ধরণের যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এই নীতির সমর্থনে বলা হয় যে এই নীতি অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুদ্ধের পথ পরিহার করতে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয়ত: বলা হয়ে থাকে যে শক্তিসাম্য নীতির ফলে ছোট ছোট বহু রাষ্ট্র নিজেদের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ যদি না থাকত তবে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট বহু দুর্বল দেশের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করত। তৃতীয়তঃ, এই নীতির জন্য কোন শক্তিশালী বা রাষ্ট্রজোট সমস্ত পৃথিবীতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। তার ফলেই বহু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠার সুযোগ পেয়েছে।

পৃথিবী যখন থেকে অনেকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল তখন থেকেও শক্তিসাম্যের নীতি মোটামুটি ভাবে অনুসৃত হতে আরম্ভ করে। এই নীতির ফলে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্যান্য সমস্ত স্বাধীন দেশগুলিকে অধিকার করে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু যুদ্ধ করেই সমস্ত বিশ্বে এই আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টাকে বাধা দিতে হয়েছে। শক্তিসাম্যের নীতি যুদ্ধকে পরিহার করতে পারে নি—যুদ্ধের মাধ্যমেই এই নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। অনেক সময় শক্তিসাম্যের নীতিই যুদ্ধকে অপরিহার্য করে তুলেছে। ভবিষ্যতে যাতে প্রতিপক্ষ অধিকতর শক্তিশালী

হয়ে উঠতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেক সময় একটি দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। 1870 খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হওয়ার পর ফ্রান্স যে দ্রুততার সাথে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে তাতে ভীত হয়ে বিসমার্ক ফ্রান্সকে পুনরায় আক্রমণ করে তার শক্তি খর্ব করার জন্য পরিকল্পনা করেন। অর্থাৎ 1870 খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান শক্তির অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে যে শক্তিসাম্য সৃষ্টি হ'ল তাকে রক্ষা করার জন্যই বিসমার্ক পুনরায় ফ্রান্সকে আক্রমণ করার সঙ্কল্প করেন। অবশ্য ইংলণ্ড ও রাশিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে বিসমার্কের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। কিন্তু একটি দেশ একটি বিশেষ সময়ের শক্তিসাম্যকে রক্ষা করার জন্য অন্য দেশকে যে আক্রমণ করা প্রয়োজন মনে করে তা বিসমার্কের এই পরিকল্পনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। যে কূটনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তাতেও শক্তিসাম্য নীতির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। বল্কান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু বৎসর ধরেই চলে আসছিল। রাশিয়া তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করায় অষ্ট্রিয়া কালবিলম্ব না করে সার্বিয়াকে আক্রমণ করা প্রয়োজন মনে করে। অষ্ট্রিয়ার ভয় ছিল যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বল্কান অঞ্চলের শক্তিসাম্য রাশিয়ার পক্ষে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য সার্বিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে বল্কানে অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সেই অঞ্চলের শক্তিসাম্য অষ্ট্রিয়ার পক্ষে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে রাশিয়া যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়েও সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়াকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শক্তিসাম্য নীতি স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। যে সব দেশ আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থার পরিবর্তন কামনা করে তাদের সাথে স্থিতাবস্থার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্থিতাবস্থার সমর্থক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থায় মোটামুটি সন্তুষ্ট থেকে শান্তির নীতি অবলম্বন করে চলে। যে সব রাষ্ট্র স্থিতাবস্থায় অসন্তুষ্ট তারা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত দ্রুত সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে এবং স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলি তাদের সাথে সমান হারে সমর সজ্জা বৃদ্ধি করতে পারে না। 1933 খৃষ্টাব্দ থেকে 1939 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর (স্থিতাবস্থায় অসন্তুষ্ট রাষ্ট্র) সামরিক প্রস্তুতির সাথে বৃটেন ও ফ্রান্সের (স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট) সামরিক প্রস্তুতির তুলনা করলেই এই কথা স্পষ্ট বুঝা

যায়। স্থিতাবস্থায় অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলির শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলি শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাদের (স্থিতাবস্থায় অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলির) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। 1939 খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও ফ্রান্স এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

শক্তিসাম্য নীতির ফলে কয়েকটি যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতির অভাবে আরও কত সংখ্যক যুদ্ধ সংঘটিত হ'ত তার কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। তবে অনেক যুদ্ধই যে শক্তিসাম্য নীতি রক্ষার সাথে জড়িত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লেও এ কথা মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন বিরোধী পক্ষ যদি বর্তমান থাকে তবে সহজে কোন রাষ্ট্র যুদ্ধের পথ গ্রহণ করতে সাহসী হয় না।

শক্তিসাম্যের রাজনীতিতে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সব সময় তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে তিনবার পোল্যাণ্ডকে ভাগ করে নেয়। শক্তিসাম্য বজায় রাখার নামেই এই ভাগ বাটোয়ারা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে পোল্যাণ্ডকে আবার জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগ করে নেয় এবং শক্তিসাম্যের নীতি দ্বারাই এই কাজকে ব্যাখ্যা করা চলে।

যাঁরা আদর্শবাদী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবর্তে চিরস্থায়ী ভাবে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী তাঁরা অনেকেই শক্তিসাম্য নীতির বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে এই নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে বাঁচিয়ে রাখে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের জোটকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করে। এই প্রতিযোগিতার ফলেই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং শক্তিসাম্যের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন (Woodrow Wilson) এই মতের সমর্থক ছিলেন এবং তিনি বলতেন যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজন হল "not a balance of power, but a community of power, not

organized rivalries but an organized common peace.” ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহেরুও উক্ত মতের সমর্থক ছিলেন এবং শক্তিসাম্যের রাজনীতি বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হবে তা তিনি মনে করতেন না। শক্তিসাম্য নীতির উপর বিশ্বাস ছিল না বলেই তিনি (অন্যান্য কারণও আছে) নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেন। অপর পক্ষে অনেকে মনে করেন যে আধুনিক জাতীয়তাবাদের যুগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি স্থাপনের চেষ্টা কখনও সার্থক হতে পারে না। অনেক দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা শক্তিসাম্য নীতিকেই আধুনিক যুগের উপযোগী বলে মনে করেন।

এই কথা মনে রাখা উচিত যে শক্তিসাম্য রাজনীতির অন্তর্নিহিত এমন কোন ক্ষমতা নেই যার সাহায্যে এই নীতি আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির নীতির উপর আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভর করে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এমন সব রাজনৈতিক নেতার উদ্ভব হয়ে থাকে যাঁরা সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পররাজ্য আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ থাকেন। বিরুদ্ধ পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এই কথা জেনেও তাঁরা তাঁদের নীতি থেকে বিরত হন না। সেক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতি কার্যকরী হয় না।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতি

শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য মোটামুটি ভাবে যে সব পদ্ধতি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা হয় সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হ’ল।

(1) অন্য দেশের সাথে মিত্রতা স্থাপন (Alliances),

অন্য দেশের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। ইউরোপে যখনই কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এবং আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছে তখনই অন্যান্য রাষ্ট্র ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্য সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। 1882 খৃষ্টাব্দে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালী যখন Triple Alliance নামক মৈত্রীবন্ধনে একত্র হ’ল তখন ইউরোপের শক্তিসাম্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়ে পড়ে। তার ফলে রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেন ধীরে ধীরে নিজেদের ভেতর সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিয়ে Triple Entente নামক এক

মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলে। ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে বৃটেনের অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধ বর্তমান ছিল কিন্তু Triple Alliance গঠিত হওয়ার পরে বৃটেন সেই সমস্ত বিরোধ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে একত্র হয়ে Triple Entente গড়ে তোলে। ইউরোপে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই Triple Entente সৃষ্টি হয়। যদিও এই ভারসাম্যের নীতি ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয় নি তবুও Triple Allianceএর আক্রমণাত্মক নীতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রতিহত করতে পেরেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে পারে (যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী বা Axis) আবার অনেক সময় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্র হয়ে একটি জোট সৃষ্টি করে তোলে। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এই সব মৈত্রীবন্ধনের সাথে ভারসাম্যের নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি সার্থক এবং কার্যকরী মৈত্রী সংস্থা তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিমান হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই সব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ মোটামুটি ভাবে অভিন্ন হওয়া অথবা একের স্বার্থ অপরের পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন। দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ যদি সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় তবে কোন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন না করেও তারা বন্ধুভাবে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে পারে। Morgenthau মনে করেন যে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বহু বৎসর ধরে এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ইউরোপে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং যখনই (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে) কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এবং আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এই ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছে তখনই ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। ইউরোপীয় রাজনীতিতে অভিন্ন স্বার্থ থাকায় কোন বিশেষ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন না হ'লেও তাদের মধ্যে মৈত্রী সম্ভব যদি একের স্বার্থ অপরের পরিপূরক হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রজোটে পাকিস্তান যোগ দিয়েছিল নিজেকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী

করে তোলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে নিজের প্রভাব বিস্তার করে সোভিয়েত রাশিয়াকে সংযত রাখা। যদিও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শক্তিসাম্য সৃষ্টি করাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তবুও পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল তা বলা যায় না। তবুও একের স্বার্থ অপরের পরিপূরক হওয়ায় তাদের মধ্যে মৈত্রী সম্ভব হয়েছিল। দুইটি বা ততোধিক রাষ্ট্রের স্বার্থ যখন সম্পূর্ণ অভিন্ন না হয়েও পরস্পরের পরিপূরক হয় তখন যে সব ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব। সেই মৈত্রীচুক্তি সামগ্রিক ভাবে না হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সব রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মধ্যে ঐক্য আনয়ন করতে পারে। সেই সব দেশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের আংশিক মিল যতদিন পর্যন্ত বজায় থাকে ততদিন পর্যন্ত মৈত্রীচুক্তিও কার্যকরী হয়। একটি মৈত্রীচুক্তি বহু বৎসরের জন্য সম্পাদিত হতে পারে কিন্তু সেই চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতিতে উদ্দেশ্যগত এবং পদ্ধতিগত মিল যদি না থাকে তবে তা কখনও কার্যকরী হতে পারে না। 1942 খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি এই কারণে যুদ্ধের পর কার্যকরী হয় নি। 1935 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাও প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই ফলপ্রসূ হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের সাথে সার্থক ভাবে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের সময় এই তিন দেশের আশু উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল—যুদ্ধে জয়লাভ করা। জাতীয় স্বার্থের অন্যান্য দিক এবং বৈদেশিক নীতির অন্যান্য উদ্দেশ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে তখন চাপা পড়ে যায়। অতএব যুদ্ধের সময় এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সার্বিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই ধরণের সার্বিক মৈত্রী যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থাতেই গড়ে উঠে এবং যুদ্ধের পর তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতবাদের ঐক্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনকে দৃঢ়তর করতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে বা মহৎ মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ঐক্য বা মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। এই প্রসঙ্গে 1928 খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত প্যারিসের চুক্তি (Pact of Paris অথবা Briand-Kellog Pact) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতির

মাধ্যম বা instrument হিসেবে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই ঘোষণার কোন মূল্যই ছিল না। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের পরে রুশ সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে একমাত্র নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে Holy Alliance স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাও বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের বাস্তব স্বার্থের সাথে রাজনৈতিক মতবাদ বা নৈতিক মূল্যবোধ যদি জড়িত থাকে তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। নৈতিক মূল্য জড়িত থাকায় সেই সব মৈত্রীচুক্তি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে গঠিত উভয় রাষ্ট্রজোটই রাজনৈতিক মতবাদ বা নৈতিক মূল্যবোধের সাহায্যে তাদের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রজোট প্রচার করে যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাদের উদ্দেশ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রজোট তাদের নীতিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শোষিত জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির সহায়ক রূপে বর্ণনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতবাদ বা নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা এই সব রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের নীতি ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল।

একটি মৈত্রীবন্ধনে যখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র যুক্ত হয় তখন সেই মৈত্রী থেকে যদি প্রত্যেকেই সমপরিমাণ সুবিধা লাভ করতে পারে তবে তা দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রায় সমান ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে মৈত্রী স্থাপিত হয় তাতে একে অপরের নীতিকে পরিচালিত বা প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা করে না এবং সেই ক্ষেত্রেই মৈত্রী বন্ধন থেকে সকল রাষ্ট্রের সম পরিমাণ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সাথে যদি অন্য কোন দুর্বল রাষ্ট্রের মৈত্রী স্থাপিত হয় তবে অনেক সময় বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশেই দুর্বল রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে এবং এই ধরনের মৈত্রীর ফলে শক্তিশালী রাষ্ট্রই বেশী সুবিধা ভোগ করে থাকে। সেই কারণেই মেকিয়াভ্যালী বলেছেন যে বিশেষ প্রয়োজন না হলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। তবে কতগুলি বিশেষ সুবিধা থাকার জন্য অনেক সময় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তৈল সরবরাহের ক্ষমতা থাকায় মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে তাদের শক্তির তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

(2) ক্ষতিপূরণের নীতি (Compensations)

ক্ষতিপূরণের নীতি দ্বারা শক্তিসাম্য বজায় রাখার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। যদি কোন কারণে একটি রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে অপর রাষ্ট্রেরও সমপরিমাণ শক্তি বৃদ্ধির অধিকার আছে, কারণ অন্যথায় শক্তিসাম্য ব্যাহত হবে—এই হল ক্ষতিপূরণ নীতির মূল কথা। 1713 খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরে যে ইউট্রেক্ট সন্ধি হয় (Treaty of Utrecht) তাতে পরিষ্কার ভাবে ক্ষতিপূরণ নীতির মাধ্যমে শক্তিসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়। 1772, 1793 এবং 1795 খৃষ্টাব্দে তিন বার পোল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পোল্যাণ্ডর এই তিনটি বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রত্যেকবারই পোল্যাণ্ডকে এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় যাতে প্রত্যেকের শক্তি প্রায় সমান ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শক্তিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছিল। 1866 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া যখন উত্তর জার্মান কন্‌ফেডারেশন স্থাপন করে তখন ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, কারণ এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের শক্তিসাম্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল এবং প্রাশিয়ার শক্তি অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন বিসমার্কের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন কিন্তু বিসমার্ক ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করায় শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় ইউরোপের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে আফ্রিকা ও চীনে এমন ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং "প্রভাবিত অঞ্চল" (sphere of influence) স্থাপন করার চেষ্টা করে যাতে শক্তিসাম্য মোটামুটি ভাবে বজায় থাকে। 1906 খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী ইথিওপিয়াকে নিজেদের মধ্যে তিনটি 'প্রভাবিত অঞ্চল' এমন ভাবে বিভক্ত করে নেয় যাতে সেই অঞ্চলে শক্তিসাম্য ব্যাহত না হয়। 1907 খৃষ্টাব্দে সেই ভাবে ইংলণ্ড ও রাশিয়া পারস্যকে নিজেদের মধ্যে 'প্রভাবিত অঞ্চলে' বিভক্ত করে নেয়। শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য ক্ষতিপূরণের নীতি কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্য নয়। একটি রাষ্ট্র কখনও অন্য রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ সুবিধা দিতে রাজী হবে না যদি তার পরিবর্তে সে নিজে সমপরিমাণ সুবিধা আদায় করতে না পারে।

(3) প্রতিপক্ষকে বিভক্ত রেখে নিজের সুবিধা আদায়ের নীতি (Divide and Rule)

এই নীতি কেবলমাত্র যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। অনেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই নীতি গ্রহণ করে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন যুগের রোমান সাম্রাজ্য এবং আধুনিক যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্য আংশিক ভাবে এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যও এই নীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দিয়ে তাকে দুর্বল রেখে শক্তিসাম্য বজায় রাখাই এই নীতির উদ্দেশ্য। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে খণ্ড বিখণ্ড করে রাখা। ইউরোপীয় দেশগুলিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত রেখে ইংলণ্ড নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার এবং ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের অনুকূলে শক্তিসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও চেষ্টা করেছে যাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি না হয়।

(4) অস্ত্রসজ্জা (Armaments) ও নিরস্ত্রীকরণের (Disarmament) প্রচেষ্টা।

সামরিক প্রস্তুতি ও অস্ত্রসজ্জা দ্বারাই সাধারণতঃ শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রই অস্ত্রসজ্জায় তার প্রতিপক্ষের সমান এবং সম্ভব হলে অধিকতর শক্তিশালী হতে চায়। সমস্ত শক্তিমান রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করার ফলে কোন স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যুদ্ধপ্রস্তুতি ক্রমশঃ বাড়িয়ে যায় বলে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং তা যুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়াই সৃষ্টি করে। তাই এই কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে শান্তির জন্য প্রয়োজন নিরস্ত্রীকরণ। নিরস্ত্রীকরণের বহু চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু একমাত্র 1922 খৃষ্টাব্দের ওয়াশিংটন নৌচুক্তি ছাড়া কোন চেষ্টাই বিশেষ সার্থকতা লাভ করে

নি। নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি সমান হারে নিরস্ত্রীকরণে রাজী হয় তবে তার ফলে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং যুদ্ধের আবহাওয়া দূর করা দুইই সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে সম্যক হিসাব সংগ্রহ করা, বাস্তবে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব প্রত্যেক রাষ্ট্র মেনে চলছে কিনা তার অনুসন্ধান করা, একটি রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তার রণসম্ভার প্রস্তুত করার ক্ষমতা বিচার করা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার ফলে নিরস্ত্রীকরণ নীতি আজ পর্যন্ত বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

(5) বাফার রাষ্ট্র (Buffer states)

দুইটি শক্তিশালী দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিসাম্য বজায় রাখতে অনেক সময় বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। দুইটি বৃহৎ ও পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে যদি একটি ছোট রাষ্ট্র বর্তমান থাকে তবে বৃহৎ দুইটি রাষ্ট্রের বৈরীভাব সহজে যুদ্ধের রূপ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু একই সীমানার দুই পার্শ্বে যদি দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্র অবস্থিত থাকে তবে তাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তান অবস্থিত থাকায় সেই অঞ্চলে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। চীন ও ভারতের মধ্যে স্বাধীন তিব্বতের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হলে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পেত।

(6) অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ (Intervention)

কোন কোন সময় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বৃহৎ শক্তিগুলি শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কম্যুনিষ্ট চীনের শক্তিকে সংহত রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামে হস্তক্ষেপ করে। 1950 সালে দক্ষিণ কোরিয়া যখন উত্তর কোরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সেখানে হস্তক্ষেপ করার বা না করার নীতি অবলম্বন করে।[1] সেই ক্ষেত্রেও বৃহৎ শক্তিগুলির কার্যকলাপ

1. ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ তালেরাঁ (Talleyrand) বলেন: "Non-intervention is a political term meaning virtually the same thing as intervention."

শক্তিসাম্য নীতি দ্বারাই প্রভাবিত হয়। স্পেনে কম্যুনিষ্টদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব যাতে বিস্তৃত হতে না পারে সেই উদ্দেশ্য জার্মানী ও ইতালী স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে শক্তিসাম্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কতগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হয় যার ফলে শক্তিসাম্য নীতির কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। প্রথমতঃ, যে সব বৃহৎ রাষ্ট্রের নীতির উপর শক্তিসাম্য নির্ভর করে তাদের সংখ্যা মাত্র দুইটিতে দাঁড়ায়—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা এই দুই বৃহৎ শক্তির তুলনায় এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি কয়েকটি প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ রাষ্ট্র থাকে এবং যুদ্ধের সময় কোন্ রাষ্ট্র কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে সেই বিষয়ে যদি অনিশ্চয়তা থাকে তবেই শক্তিসাম্য নীতি কার্যকরী ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার কাজে সহায়তা করতে পারে। সেই অবস্থায় একটি দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্যান্য সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। দুই একটি বৃহৎ রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিলে যুদ্ধজয়ের আশা প্রায় আর থাকে না। এই অনিশ্চয়তা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার ভয়ই একটি রাষ্ট্রকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত করতে পারে। আধুনিক যুগের ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়েই আমরা একই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ শক্তির অবস্থান দেখতে পাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের পরে ইউরোপে পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্র বর্তমান ছিল—অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। (নেপোলিয়নিক যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্স একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে) ধীরে ধীরে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল এবং ইউরোপে ইতালি ও ইউরোপের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় পৃথিবীর রাজনীতিতে আটটি বৃহৎ শক্তি বর্তমান ছিল—অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, ইংলণ্ড, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন ছাড়া অষ্ট্রিয়া ছাড়া উপরের আর সমস্ত রাষ্ট্রই বৃহৎ শক্তিরূপে পরিচিত ছিল। কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র

মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেও সেই বন্ধুত্বের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব ছিল না এবং অপর বৃহৎ শক্তিগুলির মনোভাব সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকায় একটি রাষ্ট্র সহজে অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে সাহসী হ'ত না। যখন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত তখনও অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়েই সে সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত। 1914 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া যখন সার্বিয়াকে আক্রমণ করে তখন অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী মনে করেছিল যে রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্য করার জন্য হয়ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না।[1] অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর এই ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকিও আর থাকে না। এখন পৃথিবীতে মাত্র দুইটি বৃহৎ শক্তি বা super power বর্তমান থাকায় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মনোভাবের বিশেষ কোন মূল্যই নেই। এই রাষ্ট্রগুলির অনেকেই হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে এবং স্বার্থের খাতিরে যুক্ত হয়ে আছে। কোন বিশেষ রাষ্ট্র যদি এক রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করে চলেও যায় (যেমন 1947 সালে যুগোস্লাভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করে) তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তির মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য সৃষ্টি হবে না। কেবলমাত্র যে সব রাষ্ট্র বর্তমান যুগের ঠাণ্ডা লড়াইতে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে চলেছে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্যে কিছুটা অনিশ্চয়তা এখনও সৃষ্টি করতে পারে। তবে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে তারা দুর্বল থাকায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের মূল্যও সেই পরিমাণে সীমিত।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ড ইউরোপে (তখন বিশ্বরাজনীতি ইউরোপেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল) শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তী যুগে তার পক্ষে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষেও তা পালন করা সম্ভব নয়। ইউরোপের রাজনীতিতে ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ ছিল না এবং ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখাই ছিল ইউরোপীয় রাজনীতিতে বৃটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ যখনই কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠার ফলে ইউরোপের

1. 1914 খৃষ্টাব্দের 30 জুলাই জার্মানীতে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারকে জানান যে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া সরকার মনে করে যে সার্বিয়াকে রক্ষা করার জন্য রাশিয়া যুদ্ধ যোগ দেবে না।

শক্তিসাম্য বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই ইংলণ্ড তার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগদান করে শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালী Triple Allianceএ মিলিত হয়ে ইউরোপের শক্তিসাম্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয় এবং জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার নীতিতে ভীত হয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল। তখন ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী Triple Allianceএর বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয় এবং তার ফলে Tripie Entente-এর সৃষ্টি হয়। নেপোলিয়নের সাথে যখন সংগ্রাম শুরু হয় তখনও ইংলণ্ড এই ধরনের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ ইংলণ্ড ইউরোপের কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে যে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অপেক্ষাকৃত দুর্বল তার পক্ষ অবলম্বন করে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করত। কয়েকটি বিশেষ কারণে ইংলণ্ডের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ, ইউরোপের রাজনীতিতে ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ ছিল না—তার প্রধান স্বার্থ ছিল ইউরোপের বাইরে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলিশ প্রণালী দ্বারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং সমুদ্রের উপর ইংলণ্ডের একাধিপত্য বজায় থাকায় ইউরোপের কোন শক্তির পক্ষে ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড যথেষ্ট বলশালী (বিশেষ করে অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান) থাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির পক্ষ অবলম্বন করে শক্তিসাম্য বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের পক্ষে সেই ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের পর ইংলণ্ড আজ একটি ইউরোপীয় শক্তিতেই পরিণত হয়েছে এবং তাই ইউরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ইংলণ্ড European Common Marketএ যোগদান করতে বাধ্য হয়েছে এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বার্থের সাথে ইংলণ্ডের স্বার্থ আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড আর ইংলিশ প্রণালীর উপর নির্ভর করতে পারে না এবং সমুদ্রের উপর একাধিপত্যও ইংলণ্ড আজ হারিয়েছে। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় ইংলণ্ড আজ খুবই দুর্বল। তাই দুর্বল জোটে যোগ দিয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করার কোন চেষ্টাই আজ আর সম্ভব নয়। কেবল ইংলণ্ড নয়, অন্য কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের পক্ষেও এই ভূমিকা পালন করা অসম্ভব।

বর্তমানের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এত দুর্বল যে তাদের পক্ষে ইংলণ্ডের অনুরূপ কোন ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জেনারেল দ্য গল (General De Gaulle) মনে করতেন যে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত উভয় রাষ্ট্রজোট হতে দূরে থেকে বর্তমান অবস্থাতেও ইংলণ্ডের অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু আসলে তা একেবারেই সম্ভব নয়। ভৌগোলিক ভাবে ইংলণ্ড ইউরোপ থেকে যে ভাবে বিচ্ছিন্ন ফ্রান্স বা অন্য কোন দেশের সেই অবস্থা নয়। ইউরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রান্স ও পশ্চিমের অন্যান্য রাষ্ট্র উদাসীন থাকতে পারে না। ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার দিনও আর নেই। তাই পূর্বে ইংলণ্ড দুর্বল পক্ষকে সমর্থন করে ইউরোপে যে ভাবে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে সেই ভূমিকা অন্য কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের পক্ষে পালন করা আধুনিক যুগে আর সম্ভব নয়। কেহ কেহ এমন আশা পোষণ করতেন যে শক্তিসাম্য রক্ষায় ইংলণ্ডের ভূমিকা হয়ত বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ কমনওয়েলথ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O.) পালন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সেই আশাও বৃথা। বৃটেনের বর্তমান অবস্থার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং কমনওয়েলথের ঐক্য এমন দৃঢ় নয় এবং তার সম্মিলিত ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় এতই সীমিত যে তার পক্ষে শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি তৃতীয় শক্তির ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন শক্তি নেই এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য জাতিপুঞ্জকে অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলির উপরই নির্ভর করতে হয়। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য বজায় রাখার রাজনীতিতে বিশেষ কোন স্বাধীন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এশিয়া বা আফ্রিকাতে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব ছিল। এক পক্ষ অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠলে অন্য পক্ষ আফ্রিকা বা এশিয়াতে উপনিবেশ বিস্তার করে শক্তিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করত, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করায় অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। শক্তিসাম্য বজায় রাখার একটি সহজ পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এই সব কারণে পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতি যে ভূমিকা পালন করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে তা আশা করা যায় না। পারমাণবিক অস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শক্তিসাম্যের পরিবর্তে ত্রাসের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে জোট-নিরপেক্ষ দেশ এবং চীনের স্বাধীন নীতির ফলে শক্তিসাম্য রাজনীতির বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে এখনও বজায় আছে।

আণবিক যুগ ও ত্রাসের সাম্য

শক্তিসাম্য নীতির উদ্দেশ্য হ'ল শান্তি রক্ষা করা—যুদ্ধ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। একটি দেশ যদি অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠে তবে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে অন্য দেশকে আক্রমণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তখন অন্য দেশগুলি একত্র হয়ে বা তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে শক্তিসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করে। অপর পক্ষ যদি প্রায় সমান শক্তিশালী হয় তবে আক্রমণ করার প্রবণতা স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। কিন্তু বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতা অন্যান্য দেশের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। একমাত্র এই দুই দেশই এখন super power নামে পরিচিত। অন্যান্য দেশ একত্র হয়েও এই দুই দেশের কোন একটির সমকক্ষ হতে পারে না। অতএব বিশ্বশান্তির রক্ষায় এই সব শক্তির ভূমিকা খুবই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই আজ এত বেশী ক্ষমতাশীল যে অপর পক্ষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা উভয়েরই আছে। এই অবস্থায় অপর পক্ষ দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয়েই একটি super power অন্য super power-কে আক্রমণ করতে সাহসী হবে না বলে আশা করা যায়। এই অবস্থাকেই ত্রাসের সাম্য বা Balance of Terror বলা হয়।

পারমাণবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আজকাল প্রায়ই nuclear deterrence নামে অভিহিত করা হয়। এই ব্যবস্থার মূল অর্থ খুবই সহজ এবং মোটেই নতুন নয়। Deterrenceএর অর্থ হ'ল নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে অন্য দেশকে সেই শক্তির ভয় দেখিয়ে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা। যতদিন পর্যন্ত একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী ছিল ততদিন পর্যন্ত সেই শক্তির ভয় দেখিয়ে সোভিয়েত

ইউনিয়নকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব ছিল। এই নীতিকে unilateral deterrence বলা হ'ত। সোভিয়েত ইউনিয়নও যখন পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় তখন থেকে mutual deterrence কথাটির প্রচলন আরম্ভ হ'ল। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পারমাণবিক শক্তির ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন দেশের পক্ষেই অন্যকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে আক্রমণ করে তবে আক্রান্ত দেশ পাল্টা আক্রমণ দ্বারা আক্রমণকারী দেশের দারুণ ক্ষতি সাধন করতে পারে। বর্তমান যুগের সামগ্রিক যুদ্ধের অর্থ হ'ল সামগ্রিক ধ্বংস —দুই পক্ষেরই সমান ক্ষতি। সেই অবস্থায় nuclear deterrence-এর নীতি গ্রহণ করা এবং তা ব্যর্থ হ'লে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকাই যুক্তিসঙ্গত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়।

এই nuclear deterrence নীতিকে (বর্তমানে কেবল মাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব) সার্থক ভাবে অনুসরণ করতে হ'লে দুই পক্ষেরই পাল্টা আক্রমণের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে পাল্টা আক্রমণের জন্য মানসিক প্রস্তুতিও থাকা চাই। তৃতীয়তঃ পাল্টা আক্রমণের জন্য সামরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যে রয়েছে সেই বিষয়ে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রাখাও আবশ্যক। পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে সামরিক গোপনীয়তার চেয়ে প্রতিপক্ষকে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই বেশী প্রয়োজন তা ছাড়া অন্য পক্ষ থেকে প্রথমে পারমাণবিক আক্রমণের সম্ভাবনা যে নেই সেই বিষয়ে প্রতিপক্ষের বিশ্বাস সৃষ্টি করাও দরকার। সেই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে না পারলে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য পারমাণবিক আক্রমণের ভয়ে এক পক্ষ প্রথমেই পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ করে দিতে পারে।

অনেকেই মনে করেন যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এত ব্যাপক যে উভয় পক্ষই যদি সমান ভাবে শক্তিশালী হয় তবে বাস্তব ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা বেশী থাকে না। এই ধারণা অনেকাংশে সত্য, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে রাষ্ট্রনায়করা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অযৌক্তিক ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসলে এই nuclear deterrence কার্যকরী নাও হতে পারে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা কখনও এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধ হঠাৎ করে আরম্ভ

হয়ে যাওয়া মোটেই আশ্চর্যের ছিল না।[1] যত বেশী দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবে এই ভয় ততই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয় দেখাতে গিয়ে এই ধরনের যুদ্ধ অনিবার্যরূপে আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। অন্য দেশ থেকে পারমাণবিক আক্রমণের আশঙ্কায় একটি দেশ প্রথমেই প্রতিপক্ষকে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করতে পারে। পারমাণবিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বদাই নানাধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এক পক্ষ যদি পারমাণবিক আক্রমণ বা প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে অন্য পক্ষ থেকে বেশ উন্নতি লাভ করতে পারে তবে সেই অবস্থায় nuclear deterrence-এর বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। তা ছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিচালিত আঞ্চলিক যুদ্ধকে nuclear derterrence দিয়ে বন্ধ করা যায় না, কিন্তু কোন এক আঞ্চলিক যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই যে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হবে না, সেই সম্বন্ধে কখনও নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক প্রকৃতির কোন ব্যক্তি (psychopathic individual) যদি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে নিযুক্ত হন তবে পারমাণবিক যুদ্ধকে আত্মহত্যার সামিল জেনেও তিনি হয়ত এই ধরনের যুদ্ধ আরম্ভ করে দিতে পারেন। অতএব পারমাণবিক যুদ্ধ রোধ করার উপায় হিসাবে nuclear deterrence-এর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়। তা ছাড়া, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত থাকার জন্য উভয় পক্ষকেই যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তাও কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে যে শান্তি বজায় রাখা হয় তার ভিত্তি নিশ্চয়ই খুব নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে nuclear deterrence-এর সাথে সাথে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তবে nuclear deterrence-এর সাথে পারমাণবিক অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে nuclear deterrence কার্যকরী হতে পারে না। নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা পাল্টা আক্রমণ করার ক্ষমতাকে যদি সীমিত করা হয় তবে nuclear

1 Quincy Wright 1954 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তকে লিখেছিলেন: "While the fear of relation is an important deterrent, it may not suffice to prevent war if power political rivalries continue with mounting tensions."

deterrence-এর ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়। তাই অনেকে মনে করেন যে বর্তমান অবস্থায় পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত রাখার বা নিষিদ্ধ করার চেষ্টার ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।[1]

---

1. Sir John Slessor তাঁর *Strategy for the West* বইতে লিখেছেন: "The greatest disservice that anyone could possibly do to the cause of peace would be to abolish nuclear armaments on either side."
তিনি আরও লিখেছেন: "The continued existence of atomic weapons gives us almost a certain chance of preventing another world war."

2. সমষ্টিগত নিরাপত্তা

সমষ্টিগত নিরাপত্তার অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সমষ্টিগত নিরাপত্তার ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হতে আরম্ভ করে। সমষ্টিগত নিরাপত্তার ধারণা সহজেই বোধগম্য, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন। সমষ্টিগত নিরাপত্তার অর্থ হল প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে কোথাও কোন আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সমষ্টিগত নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে George Schwarzenberzer তাঁর *Power Politics* বইতে লিখেছেন যে এটা হল একটা "machinery for joint action in order to prevent or counter any attack against an established international order." প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র যদি অপর কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তবে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্র সেই আক্রমণকে নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ মনে করে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে—এই হল সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রকৃত অর্থ। সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে গঠিত মৈত্রীবন্ধন বা allianceকে অভিন্ন মনে করা উচিত নয়। Alliance বা মৈত্রীবন্ধনে কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের কোন এক বা একাধিক সাধারণ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোন বিশেষ শত্রুর কথা মনে রেখেই মৈত্রী বা Alliance গঠিত হয়। কিন্তু সমষ্টিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন শত্রুর কথা মনে রাখা হয় না—যে কোন দেশ অপর যে কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলেই আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি সেখানে থাকে। শক্তিসাম্য নীতির সাথে সমষ্টিগত নিরাপত্তা পদ্ধতির কোন সাদৃশ্য নেই। শক্তিসাম্য নীতির ভিত্তি হল যে পৃথিবী যদি প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত থাকে তবে

একটি দেশ অপর দেশকে আক্রমণ করতে সাহসী হবে না এবং তার ফলেই বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে। সমষ্টিগত নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হ'ল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর শক্তিকে একত্রিত করা যাতে আক্রমণকারী কখনও জয়লাভে সমর্থ না হয়। সমষ্টিগত নিরাপত্তার সমর্থকরা মনে করেন যে এই পদ্ধতিতেই বিশ্বশান্তি বজায় রাজা সম্ভব। শক্তিসাম্য ও সমষ্টিগত নিরাপত্তার এই মৌলিক পার্থক্যের কথা ব্যাখ্যা করে Quincy Wright বলেছেন যে "the fundamental assumptions of the two systems are different."

এই কথা ঠিক যে কোন দেশের পক্ষেই সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে গিয়ে আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থার (status quo) পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ একত্র ভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী থাকবে তবে সব দেশের নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হল: আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা বা status quo বজায় রাখাই কি যথেষ্ট? স্থিতাবস্থা বজায় রেখে শান্তি রক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি? প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্যারিসের শান্তি চুক্তি যে স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করে তা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল তা বর্তমানে বোধ হয় কেউ স্বীকার করবে না। ফ্রান্স ও তার বন্ধুরাষ্ট্রবর্গ তাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে, আবার ইউরোপে জার্মানী ও ইতালী তাদের জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেই স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্থিতাবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতে পারে নি। এই কথা কেবল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী স্থিতাবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, প্রত্যেক যুগের স্থিতাবস্থা সম্বন্ধেই কমবেশী সমান ভাবে সত্য। অতএব স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখাই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক দেশ তার ন্যায্য অধিকার যাতে লাভে করতে পারে বিশ্বশান্তির জন্য তাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক পরিবর্তন আনার যদি কোন উপায় খোলা না থাকে তবে কেবলমাত্র স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দেওয়ারই নামান্তর। অতএব সমস্যা খুবই জটিল। দ্বিতীয়তঃ সমষ্টিগত নিরাপত্তা তখনই সম্ভব যখন বৃহৎ শক্তিশালী দেশগুলিসহ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সমবেত ভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী

থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হ'তে আমরা এ ধরণের ব্যবহার আশা করতে পারি কি? বর্তমান অবস্থায় অন্ততঃ-পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি এক পক্ষে না থাকে তবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখা কোন মতেই সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি পরস্পরবিরোধী পক্ষ নেয় তবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে মাত্র। তা ছাড়া নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা না করে পৃথিবীর যে কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নীতি কোন দেশের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তাও বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখা উচিত। আক্রমণকারী রাষ্ট্র অন্য কোন দেশের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবে না অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল হবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। নিজের স্বার্থ ও ক্ষমতার কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি দেশ কোন শক্তিশালী আক্রমণকারী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে, তা বর্তমান যুগের অবস্থায় চিন্তা করাও কষ্টকর। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের স্বার্থ ও ক্ষমতার কথা চিন্তা করেই তার নীতি নির্ধারণ করে থাকে, কিন্তু সমষ্টিগত নিরাপত্তার যে রাজনীতি তার মূলমন্ত্র হ'ল —সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। Morgenthau মনে করেন যে একটা নৈতিক বিপ্লব বা moral revolution না হওয়া পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র কেবলমাত্র সমষ্টিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব নিতে সাহসী হবে না। এই কথা সত্য যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সাথে একটি দেশের স্বার্থ যুক্ত থাকতে পারে এবং সেই স্বার্থের জন্য সমষ্টিগত নিরাপত্তার নামে সেই রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হতে পারে। কোরিয়াতে সেই ধরণের ঘটনাই ঘটেছিল। উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবিলম্বে দক্ষিণ কোরিয়াকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। কোরিয়ার এই যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঠাণ্ডা লড়াই এর সাথে সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত ছিল। কেবলমাত্র সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধুরাষ্ট্রবর্গ দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য প্রদান করে তা মনে করার কোন কারণ নেই।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্বার্থের সাথে সেই যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত ছিল।[1] এই সব কারণে বর্তমান বা অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব হবে বলে অনেকেই মনে করেন না।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং জাতিসংঘ

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করাই ছিল জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য। কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্র যাতে পুনরায় বিশ্বশান্তি ব্যাহত করতে না পারে প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘ গঠিত হয় জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (League Covenant) নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী সৃষ্টি করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য দেশ ফ্রান্সের এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় না। একমাত্র বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র নিঃশর্ত ভাবে তার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা বোধ করে। নিজের জাতীয় স্বার্থের সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে তবে কেবলমাত্র বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য কোন দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত ছিল না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ব-নিরাপত্তা রক্ষার পথে এটাই বাধা।

আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠিত না হলেও বিশ্বনিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতি-সংঘের চুক্তিপত্র কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দেয় যে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা তারা মেনে চলবে এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তা রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে (10 নং ধারা)। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ যদি ঘটে তবে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা তারা কি ভাবে রক্ষা করবে ? 10 নং ধারাতেই লিখিত আছে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণ যদি ঘটে অথবা

1. এই সম্বন্ধে Morgenthau লিখেছেন ? "In order to understand the different attitudes taken by different nations with regard to the Korean War, it is neither sufficient nor necessary to consult the legal texts concerning the obligations imposed upon the member states by a system of collective security. It is, however, sufficient and indeed indispensable to consult their interests and power available to them in support of those interests,"

আক্রমণের সম্ভাবনা ও বিপদ যদি দেখা দেয় তবে জাতিসংঘের কাউন্সিল সদস্যরাষ্ট্রেরা যাতে এ সম্পর্কে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করবে। স্পষ্ট করে এ কথা বলা হয় নি যে সামরিক বল প্রয়োগ করে আক্রমণকে বাধা দেওয়া হবে। জাতিসংঘের কাউন্সিল কি নির্দেশ দেবে তা অনিশ্চিত রাখা হয়। কাউন্সিলের বৃহৎ শক্তি সমূহ সামরিক বল প্রয়োগে নির্দেশ দেবে কি না তা রাজনৈতিক অবস্থা ও তাদের বৈদেশিক নীতির উপরই নির্ভর করবে। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সে কাউন্সিল আক্রমণকারীকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়ে জাতিসংঘের সদস্যদের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 11 নং ধারাতেও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করার সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। সেই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকী জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত না করলেও তা সমস্ত জাতিসংঘের সাধারণ বিপদ বলে বিবেচিত হবে এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই রকম জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে জাতিসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধে মহাসচিব কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করবেন। সেই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে অথবা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যের ভাব (যার উপর আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভর করে) ক্ষুন্ন হতে পারে তবে জাতিসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্র সেই অবস্থার দিকে সাধারণ সভা বা কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। জাতিসংঘ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।

জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি কাউন্সিলের নির্দেশ অথবা সালিশী বোর্ড বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে সেই দেশকে কি ভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে তা চুক্তিপত্রের 16 নং ধারায় উল্লিখিত আছে। সেখানে বলা আছে যে জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র এই ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে জাতিসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহ তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলেই মনে করবে এবং সেই রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করবে। আক্রমণকারী দেশের নাগরিকদের সাথে জাতিসংঘের অন্তর্গত রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সমস্ত সম্পর্ক বন্ধ করে দেবে

(এখানে বোধ হয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে)। যে সব দেশ জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র নয় সেই সব দেশের নাগরিকরাও আক্রমণকারী দেশের ন'গরিকদের সাথে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যে সব রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় সেই সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই বিধান কি করে কার্যকরী করা সম্ভব সেই সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। চুক্তিপত্রের 16 নং ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে আক্রমণকারী দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে সদস্য রাষ্ট্রদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে তা হ্রাস করার জন্য সদস্যরাষ্ট্রেরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে চলবে। তা ছাড়া জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্ররা আক্রান্ত দেশকে সামরিক ভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং সেই সাহায্যের পরিমাণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের কাউন্সিল বিভিন্ন সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সদস্যরাষ্ট্রদের কাছে সামরিক সাহায্য দাবী করার কোন অধিকার কাউন্সিলের ছিল না—কাউন্সিলের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সুপারিশ করার। তা ছাড়া কাউন্সিলের সকল সদস্য একমত না হ'লে কাউন্সিলের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না (5 নং ধারা)। আক্রমণকারী দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারেও 1921 সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভা এক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাউন্সিলকে এই সম্পর্ক ছিন্ন করার তারিখ ঘোষণা করার অধিকার প্রদান করে। অতএব আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে এমন ব্যবস্থাও ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র, বিশেষ করে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় এই অর্থনৈতিক অবরোধের মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমণ করে তখন ইতালীর বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপান জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় এই অবরোধ বিশেষ কার্যকরী হয় না।

জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে জাতিসংঘের কি কর্তব্য তা চুক্তিপত্রের 17 নং ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের সাথে জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হলে যে রাষ্ট্র বা

রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সদস্য নয় তাদেরকে কেবলমাত্র সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের সদস্য হ'তে হলে যে সব দায়িত্ব নিতে হয় তা গ্রহণ করতে বলা হবে। তারা যদি তা গ্রহণ করতে রাজী হয় তবে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যাপারে জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী (অর্থাৎ 12 নং ধারা হতে 16 নং ধারা পর্যন্ত) কাউন্সিল সেই বিরোধ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করবে। যে সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে কাউন্সিল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করবে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত নয় এমন রাষ্ট্র যদি কোন বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হওয়ার পরেও জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং জাতিসংঘের সদস্য কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তবে সেই ক্ষেত্রে জাতি-সংঘের সদস্যভুক্ত আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিবদমান দুই রাষ্ট্রই যদি সেই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত হয় তবে কাউন্সিল সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে যেখানে এ কথা বলা হয় (17 নং ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদ) সেখানে 'shall' এর পরিবর্তে 'may' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই ধরণের ক্ষেত্রে কাউন্সিল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়, এই কথাই বোধ হয় বলা হয়েছে। জাতিসংঘ সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে কতদূর সমর্থ হয়েছে সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের বাইরেও জাতিসংঘ নানাভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। নিরস্ত্রীকরণ জাতিসংঘের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং মনে করা হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করা যদি সম্ভব হয় তবে তার ফলে সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে যখন আলোচনা আরম্ভ হয় তখন দেখা গেল যে পূর্বে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে না পারলে কোন দেশ নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করতে রাজী নয়। ফ্রান্স বিশেষ করে এই অভিমত প্রকাশ করে। তখন জাতিসংঘের সাধারণ সভা অস্থায়ী মিশ্র কমিশন (Temporary Mixed Commission)-কে[1] বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া চুক্তি রচনা করার

1. 'নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাস' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জন্য অনুরোধ করে। ফলে উক্ত কমিশন যে খসড়া চুক্তি রচনা করে তা পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি বা Draft Treaty of Mutual Assistance নামে পরিচিত। 1923 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সাধারণ সভা কর্তৃক সেই খসড়া চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সেই খসড়া চুক্তিতে বলা হয় যে একটি দেশ আক্রান্ত হ'লে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র সেই দেশকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কোন রাষ্ট্র আক্রমণকারী কি না সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘের কাউন্সিলকে দেওয়া হ'ল এবং বলা হয় যে 4 দিনের মধ্যে কাউন্সিলকে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাও তখন স্থির করা হবে। সেই খসড়া চুক্তিতে আরও বলা হয় যে, যে গোলার্ধে আক্রমণাত্মক কার্য সংঘটিত হবে সেই গোলার্ধের রাষ্ট্রসমূহই আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ থাকবে। নিরাপত্তার সাথে নিরস্ত্রীকরণের সংযোগ সাধনের জন্য সেই চুক্তিতে স্থির করা হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যদি কোন রাষ্ট্র সম্মত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রের জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে না।

জাতিসংঘের সাধারণ সভা এই চুক্তির খসড়াটি বিভিন্ন দেশের (যে সব দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয় তাদের কাছেও) সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রমুখ 16টি রাষ্ট্র নীতিগতভাবে এই খসড়া চুক্তিটি গ্রহণ করতে রাজী হয়, কিন্তু জার্মানী, বৃটেন, বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হল্যাণ্ড এবং আরও কয়েকটি দেশ এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে। বৃটেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ তাঁদের নিরাপত্তার জন্য খুব বিচলিত ছিল না এবং তারা অন্য দেশকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিতে বিশেষভাবে আবদ্ধ হ'তে অস্বীকার করে। তা ছাড়া এই চুক্তির কার্যকরী অংশকে একই গোলার্ধে সীমাবদ্ধ রাখায় বৃটেন বিশেষ আপত্তি জানায়। একটি দেশ আক্রমণকারী কি না সেই বিষয়ে জাতিসংঘের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তরূপে মেনে নিতে অনেক দেশেরই আপত্তি ছিল। ফলে এই খসড়া চুক্তি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল না।

পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি (Draft Treaty of Mutual Assistance)-র বিরুদ্ধে অনেক রাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল যে আক্রমণকারী রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় সেই চুক্তি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা

সম্ভব নয়। জাতিসংঘের কাউন্সিলকে সেই বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে অনেক রাষ্ট্রই রাজী ছিল না। তাই 1924 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Mac Donald) এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হ্যারিয়ট (Herriot) সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সাথে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞা যুক্ত করে দিয়ে এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনা Protocol for the Pacific Settlement of international Disputes নামে পরিচিত। সংক্ষেপে এই পরিকল্পনার নাম জেনেভা প্রোটোকোল (Geneva Protocol)।

এই প্রোটোকোলের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয় যে এই দলিলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করবে না। তাদের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তবে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হবে। আইন সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করতে হবে এবং সেই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত এই দলিলে স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আইনসংক্রান্ত বিরোধ ছাড়া অন্যান্য বিরোধ জাতিসংঘের কাউন্সিলের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। কাউন্সিল যদি সর্বসম্মতিক্রমে সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তবে সেই বিরোধ মীমাংসার জন্য কাউন্সিল একটি সালিশী কমিটি (Committee of Arbitrators) নিযুক্ত করবে। সেই কমিটির বিচার উভয় পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। যদি কোন বিরোধকে একটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে মনে করে তবে সেই বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সেই বিরোধ অভ্যন্তরীণ সমস্যার অন্তর্গত হ'লেও তা আপোষ প্রচেষ্টা (Conciliation)-র মাধ্যমে সমাধান করার জন্য জাতিসংঘের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যদি কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সাথে তার বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বা জাতিসংঘের কাউন্সিলে অথবা কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত সালিশী কমিটির কাছে উপস্থাপন করতে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী না হয় তবে সেই রাষ্ট্রকে আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলে গণ্য করা হবে। কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বা কাউন্সিলের বা সালিশী কমিটির বিচারাধীন থাকার সময় কোন রাষ্ট্র যদি সৈন্য সমাবেশ বা যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ করে তবে সেই-দেশকে আক্রমণকারী রূপে গণ্য করতে হবে বলে এই প্রটোকোলে বলা হয়। তা ছাড়া কোন বিবাদ একটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ

সমস্যার অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও আপোষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা মীমাংসার জন্য যদি জাতিসংঘের কাছে সেই বিবাদ উপস্থাপন করতে অস্বীকার করে তবে সেই দেশকেও আক্রমণকারী দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। জাতিসংঘের কাউন্সিলকে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার এবং প্রয়োজন হ'লে ক্ষতিপূরণ ধার্য করার অধিকার দেওয়া হবে। নিরাপত্তার সাথে নিরস্ত্রীকরণের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য এই প্রটোকোলে প্রস্তাব করা হয় যে 1925 খৃষ্টাব্দের 15 জুনের মধ্যে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বীকার করে নিলে উক্ত তারিখে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

এইভাবে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সাথে আক্রমণকারী দেশের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা যুক্ত করে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এই প্রটোকোল জাতিসংঘ চুক্তিপত্র থেকে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে উন্নততর ছিল বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের নিয়ম অনুযায়ী কাউন্সিল যদি কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সর্বসম্মতিক্রমে মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তবে আর জাতিসংঘের করার কিছুই ছিল না। কিন্তু এই প্রটোকোলে সেই ক্ষেত্রে সালিশী কমিটি নিয়োগ করার ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসংঘ চুক্তিপত্র অনুযায়ী (15 নং ধারা, 8 নং অনুচ্ছেদ) কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে যদি দেখা যায় তবে সেই বিষয়ে সুপারিশ পেশ করার কোন ক্ষমতাই কাউন্সিলের ছিল না। কিন্তু এই প্রটোকোলে সেই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু কোন আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে শক্তিশালী করে তোলার কোন প্রস্তাব এই প্রটোকোলের মধ্যে নেই। এই প্রটোকোল জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 16 নং ধারা গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু কার্যকরীভাবে সেই ধারাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে নি।

জেনেভা প্রটোকোলও শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। বৃটেন এবং বৃটেনের ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রগুলিই এই প্রটোকোলের সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লেবার পার্টির নেতা রামজে ম্যাকডোন্যাল্ড এই প্রটোকোল রচনার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু নভেম্বর মাসে (1924) এই সরকারের পতন ঘটে এবং বলডুইন (Baldwin)-এর নেতৃত্বে রক্ষণশীল পার্টির সরকার গঠিত হয়। 1925 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অষ্টেন চেম্বারলেইন (Austen Chamberlain) জাতিসংঘের কাউন্সিলে ঘোষণা করেন যে বৃটিশ সরকার জেনেভা প্রটোকোল গ্রহণে রাজী নয়। সমস্ত

রাজনৈতিক বিরোধের বাধ্যতামূলক সালিশী কমিটির বিচার বৃটেন মেনে নিতে অস্বীকার করে। বৃটেনের জনসাধারণ সমষ্টিগত নিরাপত্তার নামে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মধ্যে আবদ্ধ হতে রাজী ছিল না। যদিও বৃটিশ সরকার জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযোগ করেনি তবুও আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিতে বৃটেন বিশেষ আগ্রহী ছিল না। আসলে বৃটেন তার নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তিত ছিল না এবং তাই সমষ্টিগত নিরাপত্তার বেড়াজালে বৃটেন বিশেষ জড়িত হতে চায় নি। তা ছাড়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে জেনেভা প্রটোকোলের সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। জাপানের চেষ্টাতেই এই সুপারিশ জেনেভা প্রটোকোলে যুক্ত হয় এবং এই ব্যাপারে জাপানের উদ্দেশ্য বৃটিশ ডোমোনিয়ন রাষ্ট্রগুলির কাছে খুব পরিষ্কার ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড তাদের নিজ নিজ দেশে জাপানীদের প্রবেশাধিকার এবং বসবাস করার অধিকার সঙ্কোচন করতে আরম্ভ করে। জাপান স্বভাবতঃই এই নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু বৃটিশ ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করা জাপানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জেনেভা প্রটোকোলে অভ্যন্তরীণ সমস্যাপ্রসূত আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হয় তার ফলে জাপানের পক্ষে জাতিসংঘে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্ভব হবে। সেই কারণে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড জেনেভা প্রটোকোল প্রত্যাখ্যান করে।

জেনেভা প্রটোকোল প্রত্যাখ্যাত হইলেও এই পরিকল্পনার মূল বিষয় কয়েকটি রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। সেই চুক্তির নাম লোকার্নো চুক্তি (Locarno Pact)। জাতিসংঘের বাইরে কয়েকটি রাষ্ট্রের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অষ্টেন চেম্বারলেইন যখন জেনেভা প্রটোকোল সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন তিনি বলেছিলেন যে আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ না দেওয়ায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সাধারণভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না।

1922 খৃষ্টাব্দে জার্মান সরকার প্রথমে ফরাসী সরকারের কাছে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করার প্রস্তাব করে।

সেই চুক্তিতে বৃটেন ও বেলজিয়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অছি (Trustee) হিসেবে সেই চুক্তির সাথে যুক্ত করার কথাও সেখানে বলা হয়। মার্কিন সরকারের মাধ্যমেই জার্মানী ফ্রান্সের কাছে এই প্রস্তাব প্রেরণ করে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী Poincare এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জার্মানীর উপর ফ্রান্সের এবং বিশেষ করে ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর তখন কোন বিশ্বাস ছিল না। তবে জার্মান সরকার সেই ধরণের চুক্তি সম্পাদন করার জন্য চেষ্টা করে যেতে থাকে। 1925 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ফরাসী সরকারের কাছে আবার সেইরূপ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। সেই প্রস্তাবে বলা হয় যে রাইন অঞ্চল সম্বন্ধে যে সব রাষ্ট্র বিশেষভাবে জড়িত—যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী—তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না করার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই চুক্তির সাথে অছি (trustee) হিসেবে যুক্ত করার কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়। রাইন অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান সীমারেখা এবং ভার্সাই সন্ধিতে রাইনল্যাণ্ডের বে-সামরিকীকরণের (demilitarize) যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা পুনরায় স্বীকার করে নেওয়ার কথাও সেই প্রস্তাবে বলা হয়। সেই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে রাইন অঞ্চলের নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করার পরে জাতিসংঘ কর্তৃক রচিত জেনেভা প্রটোকোলের ভিত্তিতে সমষ্টিগত নিরাপত্তার জন্য একটি বিশ্বসম্মেলনও আহ্বান করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তাবিত এই চুক্তির সাথে যুক্ত করা এবং সমষ্টিগত নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান করা এই সব প্রস্তাব বাস্তবমুখী বলে ফ্রান্স মনে করে না। কিন্তু রাইন অঞ্চল সম্বন্ধে জার্মানীর প্রস্তাব ফ্রান্স তখন বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখে এবং ইংলণ্ডের সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করে। ফ্রান্স কেবলমাত্র জার্মানীর রাইন সীমান্ত নিয়েই চিন্তিত ছিল না, জার্মানীর পূর্ব দিকের সীমারেখা (অর্থাৎ জার্মানীর সাথে পোল্যাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সীমা) যাতে অপরিবর্তিত থাকে সেই দিকেও ফ্রান্সের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বৃটেন জার্মানীর একমাত্র পশ্চিম সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়। জার্মানীও তার রাইন অঞ্চলের সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে রাজী হলেও পূর্ব দিকের সীমারেখা সেইভাবে মেনে নিতে রাজী ছিল না। জার্মানী তার পূর্ব দিকের সীমারেখা অযৌক্তিক বলেই মনে করত কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে তা পরিবর্তন করার কোন চেষ্টা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন, ইতালী, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা 1925 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো নামক স্থানে আলাপ আলোচনার জন্য সমবেত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই প্রথম বিজিত ও বিজেতা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা বন্ধুভাবে সমমর্যাদায় পরস্পরের সাথে মিলিত হলেন। 12 দিন আলাপ আলোচনার পরে প্রতিনিধিরা 7টি চুক্তিপত্র রচনা করতে সক্ষম হন। পরে ডিসেম্বর মাসে (1925) এই চুক্তিগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হয়।

এই সাতটি চুক্তির প্রথমটি জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালী ও বেলজিয়ামের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রথম ধারা অনুযায়ী উক্ত পাঁচটি দেশ প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগত ভাবে জার্মানী ও ফ্রান্সের এবং জার্মানী ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখার এবং ভার্সাই সন্ধিতে রাইনল্যাণ্ডের যে ভাবে বে-সামরিকীকরণ করা হয়েছে তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্বিতীয় ধারায় জার্মানী ও বেলজিয়াম এবং জার্মানী ও ফ্রান্স পরস্পরকে কখনও আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কেবলমাত্র আত্মরক্ষা, রাইন-ল্যাণ্ডের বে-সামরিকীকরণ বজায় রাখা এবং জাতিসংঘের নির্দেশ অনুযায়ী তারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে—অন্য কোন কারণে নয়। চুক্তির তৃতীয় ধারা অনুযায়ী স্থির হয় যে জার্মানী ও বেলজিয়াম এবং জার্মানী ও ফ্রান্স যদি সাধারণ কূটনৈতিক উপায়ে তাদের কোন বিরোধ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তবে সেই বিরোধ বিচারালয় বা আপোষ কমিশনের (Conciliation Commission) কাছে উপস্থাপিত করা হবে। চতুর্থ ধারায় বলা হয় যে জার্মানী, বেলজিয়াম বা ফ্রান্স কেউ যদি এই চুক্তির দ্বিতীয় ধারা ভঙ্গ করে তবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত দেশ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। চুক্তিতে দ্বিতীয় ধারা ভঙ্গ হয়েছে কিনা সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা মতবিরোধ উপস্থিত হলে জাতিসংঘের কাউন্সিলে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে এবং কাউন্সিল যদি কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ যথার্থ বলে মনে করে তবে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত দেশ সাহায্য করবে। পঞ্চম ধারায় বলা হয়েছে যে জার্মানী এবং ফ্রান্স অথবা জার্মানী এবং বেলজিয়াম-এর মধ্যে কেউ যদি তাদের পরস্পরের কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ ভাবে (চুক্তির তৃতীয় ধারা অনুযায়ী) মীমাংসা করতে রাজী না হয় তবে স্বাক্ষর-

কারী সমস্ত দেশ অপর পক্ষকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। জার্মানী জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকেই এই চুক্তি বলবৎ হবে বলে স্থির হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফ্রান্স ও জার্মানীর সম্পর্কে স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স জার্মানীকে জাতিসংঘের সদস্য করার জন্য চেষ্টা করে। জার্মানীর ভয় ছিল যে জাতিসংঘ ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্রের (Covenant) 16 নং ধারা অনুযায়ী সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে পারে এবং সেই অভিযানে জার্মানীকে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। জার্মানীর সেই ভয় দূর করা হলে জার্মানী জাতিসংঘের সদস্য হতে রাজী হয়।

উপরের চুক্তিটিই আসলে লোকার্নো চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তিকে Treaty of Mutual Guaranteeও বলা হয়। নিম্নের চুক্তিগুলিকেও সাধারণ ভাবে লোকার্নো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে জার্মানী ও বেলজিয়াম তাদের সমস্ত বিরোধ সাধারণ কূটনীতির মাধ্যমে অথবা সালিশী এবং বিচারালয়ের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা করে নেবে।

তৃতীয় চুক্তিটি অনুরূপ ভাবে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

চতুর্থ চুক্তি অনুরূপ ভাবেই জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়, তবে এই চুক্তির সাথে একটু দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা যুক্ত ছিল। জার্মানী তখনও পোল্যাণ্ডের সাথে তার সীমারেখা যুক্তিসঙ্গত বা চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় নি, তবে পোল্যাণ্ডের সম্মতি ছাড়া বা বলপ্রয়োগ করে সেই সীমারেখা পরিবর্তন না করার প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়। সেই জন্যই একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করতে হয়।

পঞ্চম চুক্তিটি উপরের চুক্তির মতই (প্রস্তাবনা সহ) জার্মানী ও চেকোস্লো-ভাকিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম চুক্তি দুইটি প্রকৃত পক্ষে লোকার্নো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে সেইগুলিও লোকার্নো সম্মেলনেই আলোচিত এবং রচিত হয় বলে সেই-গুলিকেও লোকার্নো চুক্তির মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে। এই চুক্তি দুইটি ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে এবং ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয়। জার্মানীর সাথে লোকার্নোতে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের যেসব চুক্তি হয় তা রক্ষা করার দায়িত্ব বৃটেন ও ইতালী গ্রহণ করে, কিন্তু জার্মানীর সাথে পোল্যাণ্ড

ও চেকোস্লোভাকিয়ার শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য যে চুক্তি হয় সেই সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব নিতে এই দুই রাষ্ট্র রাজী হয় না। অর্থাৎ জার্মানী যদি পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে তবে বৃটেন বা ইতালী কোন পক্ষকেই কোনভাবে সাহায্য করবে না। সেই অবস্থায় ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাথে একটি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে। পোল্যাণ্ডের সাথে ফ্রান্স যে চুক্তি করে তাতে বলা হয় যে দুই রাষ্ট্র জার্মানীর সাথে যে সব চুক্তিতে আবদ্ধ হল তা যদি লঙ্ঘিত হয় এবং ফলে তারা যদি কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। চেকোস্লোভাকিয়ার সাথেও ফ্রান্স অনুরূপ ভাবে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

লোকার্নো চুক্তি পশ্চিম ইউরোপে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপে সেই সময় প্রধান সমস্যা ছিল ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিদ্বেষের মনোভাব। লোকার্নো চুক্তির ফলে অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য সেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে এবং সমস্ত ইউরোপে এক অভাবনীয় আশাবাদের সৃষ্টি হয়। এই আশাবাদকে সাধারণতঃ Locarno Spirit নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই Locarno Spirit দ্বারা অভিভূত হয়েই বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অষ্টেন চেম্বারলেইন লোকার্নো চুক্তিকে 'the real dividing line between the years of war and the years of peace' বলে বর্ণনা করেন। জার্মানী ইউরোপের প্রধান শক্তি-গুলির সাথে সমান মর্যাদা লাভ করে এবং মনে হ'ল যে ভার্সাই চুক্তির তিক্ততা ভুলে গিয়ে জার্মানী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সাথে একত্রে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করতে সমর্থ হবে। কয়েক বৎসর পরে হিটলারের অভ্যুত্থানে এই সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। লোকার্নো চুক্তি সম্পাদনের সময়ও জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তৎকালীন জার্মান সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে।

লোকার্নো চুক্তিতে ইংলণ্ডকে এক বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। ফ্রান্স ও জার্মানী উভয়ই ইংলণ্ডের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মনে করে যে এই চুক্তি যদি অপর দল কর্তৃক লঙ্ঘিত হয় তবে ইংলণ্ডের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে সত্যি সত্যি এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল কি না সেই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অন্য রাষ্ট্রকে

সামরিক সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে ইংলণ্ডের খুবই দ্বিধা এবং অনিচ্ছা দেখতে পাওয়া গেছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট এবং জনসাধারণ এই ধরণের প্রতিশ্রুতির বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না; তাই বাস্তব ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের পক্ষে লোকার্নো চুক্তির দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল কি না সেই বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনেকের ধারণা ছিল যে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা আছে এ কথা ভেবেই কোন পক্ষ হয়ত লোকার্নো চুক্তি লঙ্ঘন করতে সাহসী হবে না। অতএব লোকার্নো চুক্তির মধ্যে ইংলণ্ডের যে দায়িত্ব নিহিত ছিল তা সত্যি সত্যি পালন করার কোন প্রয়োজন হবে বলে অনেকে মনে করতেন না।

জাতিসংঘ অনেক চেষ্টা করেও যেখানে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে নি সেখানে জাতিসংঘের বাইরে লোকার্নো চুক্তি অন্ততঃ আঞ্চলিক ভাবে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। ফলে জাতিসংঘের মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। তা ছাড়া ভার্সাই চুক্তির মর্যাদাও লোকার্নো চুক্তির ফলে কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল। জার্মানীর পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকের সীমারেখাই ভার্সাই চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু লোকার্নো চুক্তিতে ইংলণ্ড (এবং ইতালী) জার্মানীর পশ্চিম সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখার দায়িত্ব নিতে রাজী হয়, কিন্তু পূর্ব সীমারেখা (জার্মানীর সাথে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমা) সম্বন্ধে সেই দায়িত্ব নিতে রাজী হয় না। জার্মানীও লোকার্নোতে তার পশ্চিম সীমারেখা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে রাজী হয়, কিন্তু পূর্ব সীমারেখা সেইভাবে মেনে নিতে রাজী হ'ল না। তাই এই ধারণা স্বভাবতঃই উদয় হ'ল যে ভার্সাই চুক্তিতে যে সীমারেখা সৃষ্টি করা হয়, তা মেনে নিতে বা অপরিবর্তিত রাখার দায়িত্ব নিতে সমস্ত দেশ বাধ্য নয়। লোকার্নো চুক্তি যে সীমারেখা মেনে নিল তার মূল্য ভার্সাই-সৃষ্ট সীমারেখার চেয়ে অনেক বেশী বলে পরিগণিত হয়। তাই E. H. Carr লিখেছেন: "In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Covenant."

লোকার্নো চুক্তির ফলে একদিকে জার্মানীর মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও নিজেদের স্বার্থে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিগুলির শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ভার্সাইতে অপমানিত জার্মানীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয় এবং 1922 খৃষ্টাব্দে র‍্যাপালো চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে করতে সক্ষম হ'ল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ পশ্চিমী শক্তিগুলি এই বন্ধুত্বকে সমর্থন করতে পারে নি। লোকার্নো চুক্তি দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হয় এবং ফলে সোভিয়েত-জার্মানী বন্ধুত্ব দুর্বল হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন লোকার্নো চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে এবং এই চুক্তিকে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলির ষড়যন্ত্র বলে মনে করে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা স্থাপনের ইতিহাসে কেলগ ব্রিয়ঁ চুক্তি বা প্যারিস চুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 1928 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 15টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্যারিসে মিলিত হয়ে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে। পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত 65টি রাষ্ট্র এই দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে চুক্তিপত্রের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত তাতে স্বাক্ষর করতে রাজী হয় এবং এই ঘোষণাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

লোকার্নো চুক্তি ইউরোপের রাজনীতিতে যে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে প্যারিস চুক্তিকে তার একটি ফলশ্রুতি হিসেবে ধরা যায়। 1927 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়ঁ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব কেলগের কাছে তাদের দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিহার করে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ পরিহার এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য এক বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু তখন ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই চুক্তির ফলে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ইউরোপীয় বন্ধু হিসেবে ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেলগ প্রস্তাব করেন যে কেবলমাত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই ধরণের একটি সার্বজনীন চুক্তি সম্পাদন করা বাঞ্ছনীয়। কেলগের এই প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয় এবং 27 আগষ্ট (1928) প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী, ইতালী, জাপান, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বৃটেনের বিভিন্ন ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষ এই চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষর করে।

এই চুক্তির প্রস্তাবনায় বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক মৈত্রী, জনসাধারণের উন্নতি ইত্যাদি আদর্শের কথা উল্লিখিত আছে। এই চুক্তিপত্রের প্রথম ধারায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে যুদ্ধকে নিন্দা করা হয় এবং স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে তাদের জাতীয় নীতির অঙ্গ হিসেবে ("as an instrument of national policy in their relations with one another") বর্জন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্বিতীয় ধারায় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ তাদের সমস্ত বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করতে রাজী হয়। চুক্তিপত্রের শেষে বলা হয় যে এই চুক্তি অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

এই চুক্তিপত্রের ভাষা খুব পরিষ্কার নয়। যুদ্ধকে স্পষ্ট ভাবে বে-আইনী বলা হয় নি। যুদ্ধকে নিন্দা ("condemned") করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় নীতির অঙ্গ হিসেবে যুদ্ধ বর্জন ("renounced") করতে রাজী হয়। কূটনীতির জগতে এই ভাষার অর্থ কি দাঁড়ায় তা বলা সহজ নয়। আসলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনা হয় তাতে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রই স্পষ্ট করে যুদ্ধ বর্জন করতে রাজী নয়। নীতিগতভাবে যুদ্ধ বর্জন করতে রাজী হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধ করার অধিকারকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, জাতিসংঘের নির্দেশে, লোকার্নো চুক্তির দায়িত্ব পালনের জন্য, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি কোন স্বাক্ষরকারী দেশ ভঙ্গ করলে ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে যুদ্ধ করার অধিকার বিভিন্ন দেশ দাবী করে। মণরো নীতি (Monroe Doctrine) যদি কোন দেশ ভঙ্গ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অধিকার দাবী করে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া প্রমুখ দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির জন্য কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করতে অসম্মত হয়। বৃটিশ সরকার জানিয়ে দেয় যে তাদের নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বৃটেনকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেনের সমস্ত রকম কাজ তার আত্মরক্ষার সামিল বলেই গণ্য করতে হবে। এই সব বিভিন্ন দাবী মেনে নিয়েই কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সেই কারণেই ভাষাকে অস্পষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। এই চুক্তি একটি সদিচ্ছার প্রকাশ মাত্র। যে নীতির উপর এই চুক্তি প্রতিষ্ঠিত তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কোন

চেষ্টা এই চুক্তিতে নেই। কোন স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন অস্বীকার করা কঠিন, কিন্তু 'আত্মরক্ষা' বলতে কি বুঝায় সেই সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা এই চুক্তিতে নেই। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দেওয়ার কয়েক বৎসর পরেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জাপান আক্রমণ শুরু করে এবং সেই অভিযানকে জাপান আত্মরক্ষামূলক কাজ বলে বর্ণনা করে। কোন সামরিক অভিযান আত্মরক্ষামূলক কি না তা বিচার করে দেখার মত কোন সংস্থা কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি সৃষ্টি করতে পারে নি। যুদ্ধ ঘোষণা না করে আক্রমণাত্মক সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধেও এই চুক্তি সম্পূর্ণ নীরব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কুটীল আবর্তে সদিচ্ছাপ্রসূত এই চুক্তিপত্রের কোন বাস্তব মূল্য ছিল না।

কিন্তু কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তির নৈতিক মূল্য অনস্বীকার্য। এই চুক্তিতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ স্বাক্ষর প্রদান করে এবং বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব এই চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। জাপান, ইতালী প্রভৃতি রাষ্ট্র শীঘ্রই এই চুক্তি ভঙ্গ করে, কিন্তু যে সব দেশ এই চুক্তি ভঙ্গ করে তারা পৃথিবীর নৈতিক সমর্থন লাভ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে এই নৈতিক সমর্থনের মূল্য খুবই কম, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে তার মূল্য স্বীকার করতেই হয় এবং নতুন মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। এই নৈতিক মূল্য ছাড়া কেবল-ব্রিয়াঁ চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশকে (যারা জাতিসংঘের সদস্য কখনও বা তখন পর্যন্ত হয় নি) জাতিসংঘের কাছাকাছি এনে দেয়, কারণ জাতিসংঘ ও এই চুক্তির উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে অভিন্ন ছিল। কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তির ঘোষণাকে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে সংযুক্ত করার জন্যও চেষ্টা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রকে সংশোধন করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়ে কিছু করা সম্ভব হয় নি।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

সমবেত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর কোন অংশে যদি শান্তি বিঘ্নিত হয় বা এক দেশ অপর দেশকে আক্রমণ করে তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তি

প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের সপ্তম অধ্যায়ে (39 ধারা হতে 51 ধারা পর্যন্ত) এই বিষয়ে জাতিপুঞ্জের কর্তব্য ও ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে। 39 ধারায় বলা হয়েছে যে কোন অংশে যদি শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে বা সত্যি সত্যি শান্তি ব্যাহত হয় অথবা আক্রমণাত্মক কোন ঘটনা ঘটে তবে নিরাপত্তা পরিষদ তা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সুপারিশ করবে অথবা সনদের 41 এবং 42 ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার পূর্বে অবস্থায় যাতে অবনতি না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে সাময়িক ভাবে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ও নির্দেশ যদি কোন রাষ্ট্র অগ্রাহ্য করে তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা সনদের 41 এবং 42 ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সামরিক বল প্রয়োগ ব্যতীত আর যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে তা 41 নং ধারায় লিখিত আছে। সেগুলি হ'ল পূর্ণ ভাবে অথবা আংশিক ভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, রেল, নৌপথ, বিমানপথ, ডাক, টেলিগ্রাফ, রেডিও এবং যোগাযোগের সমস্ত সূত্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। কোন ক্ষেত্রে পরিষদ যদি মনে করে যে এই সব ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় অথবা এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও যদি দেখা যায় যে সেই রাষ্ট্রকে সংযত করা সম্ভব হ'ল না তখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি—স্থল, জল ও বিমান-বাহিনী—প্রয়োগ করতে পারে (42 নং ধারা)। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তা বজায় রাখার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য নিরাপত্তা পরিষদকে সেই সময়ে সামরিক ও অন্যান্য ধরণের সাহায্য এবং বিভিন্ন রকম সুবিধা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (43 নং ধারা)। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের সাথে নিরাপত্তা পরিষদের চুক্তির কথাও 43 নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। 46 নং ধারায় বলা হয়েছে যে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা

নিরাপত্তা পরিষদ Military Staff Committe-র সহায়তায় স্থির করবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে যেখানে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে এবং অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের সমস্যায় নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য এই Military Staff Committe সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করা হয় (47 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। নিরাপত্তা পরিষদে যে সব স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র আছে তাদের প্রধান সেনাধ্যক্ষদের নিয়ে অথবা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কাজের সুবিধার জন্য যদি কখনও কোন সদস্যরাষ্ট্রের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় তবে সেই রাষ্ট্র এই কমিটির স্থায়ী সদস্য না হলেও তাকে এই কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা যায় (47 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের সহযোগিতায় গঠিত যে সেনাদল নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকে তাদের সঠিক ভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব এই কমিটির উপর অর্পণ করা হয় এবং সেই কাজের জন্য এই কমিটি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দায়ী থাকে, (47 নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে অথবা কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারে (48 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের সময় জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যই পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে (49 নং অনুচ্ছেদ)। এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোন রাষ্ট্র (সে রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য না হলেও) যদি বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে সেই রাষ্ট্র সেই সব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সাথে পরামর্শ করতে পারে (50 নং ধারা)।

এই ভাবে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কাজ করে। কিন্তু জাতিপুঞ্জের কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি আক্রান্ত হয় তবে নিরাপত্তা পরিষদ যতদিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র নিজের চেষ্টায় বা বন্ধু-রাষ্ট্রদের সাহায্যে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যেতে পারে। আত্মরক্ষার এই অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নি বলে 51 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আত্মরক্ষার জন্য একটি সদস্যরাষ্ট্র যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা

অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে হয়। আত্মরক্ষার এই অধিকার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কোন ভাবেই ক্ষুন্ন হবে না বলে বলা হয়েছে (51 নং ধারা)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে কতদূর সক্ষম হয়েছে তা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূরীকরণ

সূচনা

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখার সাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার চেষ্টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তবুও এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রচেষ্টার মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আলাপ আলোচনা (Negotiations), আপোষ প্রচেষ্টা (Conciliation), মধ্যস্থতা (Arbitration) ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা বোঝায়! আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখার অর্থ হল যে একটি দেশ যদি অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তবে সকলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার চেষ্টা সুদূর অতীত কালেও দেখা যায়। প্রাচীন যুগে মিশরে এবং বিশেষ করে গ্রীসে এই প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। যদিও এই ধরনের চেষ্টা বহু যুগ ধরেই চলে আসছে তবুও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন সুসংহত পদ্ধতি বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে এই বিষয়ে অনেক উন্নতি ঘটেছে। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে 1899 এবং 1907 খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হেগ কনভেনশন (Hague Conventions), জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (Covenant of the League of Nations), স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে গঠনতন্ত্র (Statute of the Permanent Court of Internationl Justice), 1924 খৃষ্টাব্দের জেনেভা প্রটোকোল (Geneva Protocol), 1928 খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার জন্য সাধারণ আইন (General Act for the Pacific Settlement of International Disputes), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ (United Nations Charter), আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠনতন্ত্র (Statute of the International Court of Justice) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার জন্য যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেইগুলিকে মোটামুটি দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। কতগুলি পদ্ধতি বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে—সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি পূর্ব থেকেই কোন বিশেষ সালিশী বোর্ড বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়—সেই সং পদ্ধতি বাধ্যতামূলক। আলাপ আলোচনা (Negotiations), বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্ততা (Good offices and Mediation), অনুসন্ধান ও আপোষ প্রচেষ্টা (Enquiry and Concilition)—এই সব পদ্ধতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। সালিশী এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সব পদ্ধতি ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে আঞ্চলিক সংগঠনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সনদের 33 নং ধারায় আলাপ আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ প্রচেষ্টা, সালিশীর বিচার, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত এই কয়টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে আঞ্চলিক সংগঠন বা ব্যবস্থার (Regional agencies or arrangements) কথাও বলা হয়েছে। সনদের 52 নং ধারায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরা প্রথমতঃ আঞ্চলিক সংগঠনের মাধ্যমে তাদের স্থানীয় বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সব আঞ্চলিক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে তাদের অনেকগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার জন্য বিভিন্ন ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে Organization of American States (OAS) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের চার্টারের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় (চতুর্থ অধ্যায়) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি সম্বন্ধে রচিত হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি নিয়ে নিয়ে আলোচনা করা হল।

আলাপ আলোচনা (Negotiations)

দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হ'লে প্রথমতঃ তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই দূর করার চেষ্টা হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে অথবা প্রয়োজন হ'লে বৈদেশিক মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানরা

একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনার সাহায্যে বিরোধ দূর করার জন্য চেষ্টা করে থাকেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সম্মেলন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অধিবেশন এই ধরনের আলাপ আলোচনার জন্য বিশেষ উপযোগী বলে মনে হয়। আলাপ আলোচনার ফলে এক পক্ষ অন্য পক্ষের যুক্তি ও স্বার্থ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। এবং তার ফলে তাদের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবে আলাপ আলোচনা সব সময়ই যে সফলতা লাভ করে তা নয়। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনার পরেও সেই বিরোধের কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়নি।

বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা (Good Offices and Mediation)

যখন দুই পক্ষের সম্পর্ক এমন তিক্ত হয়ে উঠে যে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করা সম্ভব হয় না অথবা আলাপ আলোচনা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন কোন তৃতীয় পক্ষ তাদের বিরোধ দূর করার জন্য বন্ধুভাবে মধ্যস্থতার কাজ করতে পারে। বিরোধী দলের যে কোন এক পক্ষ বা দুই পক্ষই তৃতীয় শক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা আহ্বান করতে পারে। অনেক সময় তৃতীয় শক্তি নিজেই স্বেচ্ছায় মধ্যস্থতার এই কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। এই ধরনের মধ্যস্থতাকে ইংরাজীতে Good Offices and Mediation বলে। Good Offices এবং Mediation-এর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ না থাকলেও অনেক সময় তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখা টানা হয়। Good Offices-এর বেলায় তৃতীয় পক্ষ বিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করে দেয় মাত্র, কিন্তু Mediation-এর ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ সেই আলাপ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক সময় নিজে একটি প্রস্তাব রচনা করে তার ভিত্তিতে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে 1899 এবং 1907 সালের হেগ কনভেনশন Good Offices এবং Mediation-এর উপর বিশেষ জোর দেয়। সেখানে বলা হয় যে Good Offices এবং Mediation এর প্রস্তাবকে কখনও বৈরীমূলক আচরণ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয় এবং সেই প্রস্তাব কখনও বাধ্যতামূলক হতে পারে না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতার ফলে রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হল্যাণ্ডের

সাথে ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিক সরকারের যে সংঘাত আরম্ভ হয় তাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের Good Offices বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। 1965 খৃষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন-এর মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

অনুসন্ধান ও আপোষ প্রচেষ্টা (Enquiry and Conciliation)

অনেক সময় দেখা যায় যে বিরোধের কারণ সম্বন্ধে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি একমত হতে পারে না অর্থাৎ যে সব কারণে তুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। যে সব ঘটনার ফলে বিবাদ উপস্থিত হয়েছে তার সঠিক বিবরণ যদি পাওয়া যায় তবে তা অনেক সময় বিবাদ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে। এই কারণেই আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন উভয়ই অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। 1922 খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ সভা অনুসন্ধান কমিটির প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে স্বীকার করে এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যে সব কারণে এবং যে সব ঘটনার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করে প্রকাশ করাই হল অনুসন্ধান কমিটির প্রধান কাজ। সেই বিবরণের ভিত্তিতে বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ একটি আপোষ মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করে। 1904 খৃষ্টাব্দে Dogger Bank ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তা সমাধান করতে গিয়ে অনুসন্ধান সমিতি বিশেষ সাহায্য করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বল্টিক নৌবাহিনী উত্তর সাগরে Dogger Bank-এর অনতিদূরে মাছ ধরতে নিযুক্ত বৃটিশ নৌযানের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং ফলে তুইজন লোক নিহত এবং কয়েকটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাশিয়ার দিক থেকে বলা হয় যে বৃটিশ জাহাজকে তারা জাপানী জাহাজ বলে ভুল করেছিল। তখন উভয় সরকারের সম্মতি নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করা হয় এবং সেই কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে দেখা যায় যে রাশিয়ার গোলা বর্ষণকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। ফলে রুশ সরকার তুঃখ প্রকাশ করে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। 1914 খৃষ্টাব্দে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব William Jennings Bryan বিরোধ মীমাংসার জন্য স্থায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে প্রায় 30টি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন এবং সেই সব চুক্তিতে স্থির হয় যে অনুসন্ধান কমিটির কাজ চলার সময় কোন পক্ষই যুদ্ধ আরম্ভ করবে না ("cooling off" period)। এইভাবে যে সব কমিটি সৃষ্টি হ'ল তা কখনও কার্যকরী হয় নি। কিন্তু যে নীতির উপর ভিত্তি করে এই কমিটিগুলি সৃষ্টি হয় তা যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। সমস্ত রকমের বিরোধকেই এই সব চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই অনুসন্ধান কমিটিগুলি গঠিত হয়ে থাকে যাতে বিরোধ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই সেইগুলির সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়।

অনুসন্ধান কমিটির সাথে আপোষ কমিটির (concilation committee) এক মৌলিক পার্থক্য আছে। অনুসন্ধান কমিটির প্রধান কাজ হ'ল ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করা মাত্র, কিন্তু আপোষ কমিটি বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাতে চায়। আপোষ কমিটি নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করতে পারে এবং উভয় পক্ষই যাতে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে তার জন্য চেষ্টা করে থাকে। Mediation বা বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতার সাথে আপোষ চেষ্টার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। মধ্যস্থতার কাজ সাধারণতঃ একজন লোক করে থাকেন কিন্তু আপোষ প্রচেষ্টার কাজ কয়েকজন লোক নিয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ যখন তাদের বিরোধ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ বিচারের জন্য এবং বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদানের জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছে আবেদন জানায় তখন Conciliation বা আপোষ প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষ যে প্রস্তাব দিয়ে থাকে তার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না অর্থাৎ বিবদমান রাষ্ট্রগুলি তা গ্রহণ করতেও পারে আবার গ্রহণ নাও করতে পারে। এখানেই সালিশী (Arbitration) অথবা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত থেকে আপোষ কমিটির সিদ্ধান্তের পার্থক্য।

সালিশী (Arbitration)

শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার যে সব পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সালিশী বিচারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সালিশী বিচারের ভূমিকা আপোষ প্রচেষ্টা (conciliation) থেকে অনেক বিষয়ে পৃথক। সালিশী বোর্ড আইনের ভিত্তিতে বিচার করে বিরোধ দূর করার চেষ্টা করে,

কিন্তু আপোষ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হ'ল আইনের উপর জোর না দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা। আপোষ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিরোধ দূর করার জন্য সুপারিশ থাকে মাত্র—সেই সুপারিশের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সালিশী বোর্ড সুপারিশ করে না, সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষই আইনত মেনে নিতে বাধ্য। সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। যদিও সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্তকে award এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে judgement বলা হয় তবুও উভয় সিদ্ধান্তই আইনের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সালিশী বোর্ড গঠনে এবং কি ধরনের আইন অনুযায়ী বোর্ড তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা স্থির করার ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা থাকে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে যে সব বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেরিত হয় সেই সব ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সে ধরনের স্বাধীনতা থাকে না।

যে সব রাষ্ট্র সালিশীবোর্ডের মাধ্যমে নিজেদের বিরোধ সমাধান করতে চায় তারা সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের ভিতর চুক্তি সম্পাদন করে নেয়। বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পরেও সেই ধরনের চুক্তি হ'তে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই সেই ধরনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। দুই পক্ষকেই একজন বিশিষ্ট-ব্যক্তি বা একটি কমিশনের মধ্যস্থতা মেনে নিতে হবে। অনেক সময় একটি মিশ্র কমিশনের (Mixed Commission) মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া হয়—সেখানে সাধারণতঃ দুই পক্ষেরই একজন করে সদস্য এবং একজন তৃতীয় ব্যক্তি থাকেন। সালিশীবোর্ডের সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষই মেনে নিতে আইনতঃ বাধ্য, এবং কোন রাষ্ট্র যদি তা মেনে নিতে রাজী না হয় তবে অপর পক্ষ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বলপ্রয়োগ করে সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে। অবশ্য সালিশী বোর্ড যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবেই তা উভয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য। উৎকোচ গ্রহণ করে, কোন রকম ভীতি প্রদর্শনের ফলে অথবা যে সব নীতির উপর সালিশী বোর্ড গঠিত হয়েছে তা ভঙ্গ করে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করার অভিযোগে (অর্থাৎ এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে যা চুক্তি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় নি) অনেক ক্ষেত্রে সালিশীর সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র মেনে নিতে অস্বীকার করে বিবদমান দুইটি রাষ্ট্র যে চুক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরোধ

মীমাংসার জন্য সালিশী বোর্ডের কাছে প্রেরণ করতে রাজী হয় সেই চুক্তি দ্বারা সালিশী বোর্ডের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু সালিশী বোর্ড সেই চুক্তির ব্যাখ্যা করে নিজের ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করতে পারে কি না তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন পক্ষ যদি সালিশী বোর্ডের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আনে তবে সেই অভিযোগ কতখানি যথার্থ তা বিচার করার কোন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নেই। সালিশী বোর্ডের বিচারের উপর আপীলের কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে এই সমস্যা সমাধান করা কঠিন।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ যদি ইচ্ছা করে তবে তারা সমস্ত রকম বিরোধই সালিশীর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তা করা হয় না। 1899 এবং 1907 খৃষ্টাব্দের হেগ কনভেনশনে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই অভিমত প্রকাশ করে যে আইনগত বিরোধ এবং বিশেষ করে যে সব বিরোধের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা জড়িত থাকে সেই সব বিরোধই সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যুক্তিসঙ্গত। প্রথম হেগ কনভেনশনের পরে 1903 খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও ফ্রান্স একটি চুক্তি সম্পাদন করে স্থির করে যে, যে সব আইনগত বিরোধের সাথে তাদের বিশেষ কোন জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা বা সম্মানের প্রশ্ন অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত নেই সেই সব বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে। আরও অনেক দেশের সাথে বৃটেন এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রও নিজেদের মধ্যে এই রকম চুক্তি সম্পাদন করে। এই ধরনের চুক্তির প্রধান অসুবিধা হ'ল এই যে একটি বিশেষ বিরোধ আইনগত বিরোধ কি না তা সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্ররাই স্থির করে থাকে। অনেক সময় এমন হয়েছে যে এক পক্ষ একটি বিশেষ বিরোধকে আইনগত বিরোধ বলে মেনে নিলেও অপর পক্ষ তা স্বীকার করে নি এবং ফলে সালিশীর মাধ্যমে সেই বিরোধের মীমাংসা করাও সম্ভব হয় নি। 1911 খৃষ্টাব্দে মার্কিন সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে দুইটি চুক্তি সম্পাদন করে স্থির করে যে একটি বিশেষ বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসিত হওয়ার মত উপযুক্ত কি না সেই বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হ'লে তা একটি যুক্ত তদন্ত কমিশনের কাছে প্রেরণ করা হবে এবং সেই কমিশনের সকল সদস্য অথবা একজন ব্যতীত সকল সদস্য যদি সেই বিরোধকে সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসিত হওয়ার উপযুক্ত মনে করেন তবে উভয় পক্ষই তা মেনে নেবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমেরিকার সিনেটের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। সালিশীর মাধ্যমে

আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে যে সব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা সাধারণতঃ শর্তহীন নয়। যেখানে কোন শর্তের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয় না সেখানেও ধরে নেওয়া হয় যে আইনগত বিরোধই সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার পদ্ধতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। গ্রীকদের ভেতর এই পদ্ধতি কিছু পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইতালীর বিভিন্ন নগর এবং সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যাণ্টনের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এই পদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাসে 1794 খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাতিদ Jay Treaty বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তি দ্বারা দুইটি রাষ্ট্র স্থির করে যে সীমান্ত নিয়ে সকল সমস্যা এবং যুদ্ধের সময় সমুদ্রে ইংলণ্ডের অধিকার ও নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে। এই প্রসঙ্গে Alabama নিয়ে 1870 খৃষ্টাব্দে যে সালিশী বোর্ড গঠিত হয় তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের লিভারপুলে বিদ্রোহীদের জন্য Alabama নামে একটি জাহাজ প্রস্তুত করা হয় এবং সেই জাহাজ অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় ব্যাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। গৃহযুদ্ধের পরে মার্কিন সরকার ইংলণ্ডের কাছে সেই কারণে ক্ষতিপূরণ দাবী করলে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। দীর্ঘদিন-ব্যাপী আলোচনার পরে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1871 খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাদের এই বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে নিতে রাজী হ'ল। ওয়াশিংটন চুক্তিতে উভয় রাষ্ট্র একটি সালিশী বোর্ড গঠন করে এবং সেই বোর্ডে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ড একজন করে (মোট 5 জন) সদস্য মনোনীত করে। জেনেভাতে এই সালিশী বোর্ডের অধিবেশন বসে এবং 1872 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বোর্ড স্থির করে যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংলণ্ডকে 15,500,000 ডলার দিতে হবে। 1899 খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম হেগ কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি স্থায়ী সালিশী বোর্ড (Permanent Court of Arbitration) স্থাপিত হয়। এই Permanent Court of Arbitration বলতে বুঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করার মত অভিজ্ঞ একদল বিচারকের নামের তালিকা। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই তালিকা থেকে বিচারক নিযুক্ত করতে পারত। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই Permanent Court of Arbitration 15টি বিরোধ দূরীকরণে সফলতা লাভ করে। জাতিসংঘের অঙ্গ হিসাবে Permanent Court of International Justice স্থাপিত হওয়ার পরেও এই Court-এর অস্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে আরও অনেক সালিশী বোর্ড বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়। 1965 খৃষ্টাব্দে কচ্ছের রাণ এলাকা নিয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত এক ট্রাইবুন্যালের কাছে উপস্থাপিত করা হয় এবং ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই মেনে নেয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (World Court)

জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার আরও একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়। জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিয়ে পরে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এই ধরনের বিচারালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণ এবং জাতিসংঘ

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক কূটনৈতিক উপায়ে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করা সম্ভব না হ'লে আলাপ আলোচনা, বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা, অনুসন্ধান ও আপোষ প্রচেষ্টা এবং সালিশীর বিচারের মাধ্যমেই তা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হত। শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধ মীমাংসা করার আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ স্থাপিত হওয়ার ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার পথ আরও বিস্তৃত হয়। এই বিষয়ে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে যে সব ব্যবস্থার উল্লেখ আছে তা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হ'ল। তা ছাড়া জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 14 ধারা অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court of International Justice) স্থাপন করা হয় এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে এই বিচারালয়ের ভূমিকাও পরে আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রবৃন্দ নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হ'লে তা সালিশী বোর্ডের কাছে অথবা বিচারালয়ে অথবা কাউন্সিল কর্তৃক অনুসন্ধানের জন্য পেশ করতে রাজী হয়। সালিশী অথবা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অথবা কাউন্সিলের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে 3 মাস পর্যন্ত তারা কোনক্রমেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না বলে স্থির হয় (12 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 12 নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে সালিশী এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত খুব বেশী কালক্ষেপন না করে একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে (within a reasonable time) প্রকাশ করা হবে এবং কাউন্সিলে কোন বিরোধ প্রেরণ করা হলে 6 মাসের মধ্যে কাউন্সিলকে সেই সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। যে সব বিরোধের সাথে কোন চুক্তির ব্যাখ্যা অথবা আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন জড়িত আছে সেই সব বিরোধ সালিশী বোর্ডের কাছে অথবা বিচারালয়ে উপস্থিত করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তা ছাড়া একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি এমন কোন কাজের অভিযোগ আনে যা আন্তর্জাতিক নীতির পরিপন্থী তবে সেই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য এবং সেই ঘটনা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে অভিযুক্ত রাষ্ট্রকে কি ধরনের এবং কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা স্থির করার জন্যও সালিশী বোর্ড অথবা বিচারালয়ের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয় (13 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। এখানে বিচারালয় বলতে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের 14 নং ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত Permanent Court of International Justice-কেই বুঝায়। তা ছাড়া বিবদমান রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করলে অন্য কোন tribunal-এও যাতে তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেরণ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়। জাতিসংঘের সদস্যরা সালিশী বোর্ড এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয় এবং যে সকল সদস্য রাষ্ট্র তা মেনে নেবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোন রাষ্ট্র যদি তা মেনে নিতে অসম্মত হয় তবে সালিশী বোর্ড এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার জন্য কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করবে (13 নং ধারা, চতুর্থ অনুচ্ছেদ)।

জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে সব বিরোধ সালিশী বা বিচারালয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব হবে না সেই সব বিরোধ কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 15 নং ধারায় এই

সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পরে যে কোন পক্ষ সেই বিষয়ে মহাসচিবকে সংবাদ দিয়ে কাউন্সিলের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করতে পারে। মহাসচিব তখন সেই বিরোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তখন দুই পক্ষকেই তাদের বক্তব্য পূর্ণ ভাবে মহাসচিবকে জানাতে হবে। কাউন্সিল প্রথমতঃ সেই বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে এবং সেই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে কাউন্সিল প্রয়োজন মত বিরোধ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ এবং তার মীমাংসার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করবে (15 নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)। যদি বিরোধ মীমাংসা করা সম্ভব না হয় তবে কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে বিরোধ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এবং কাউন্সিলের সুপারিশ একটি রিপোর্টে প্রকাশ করবে (15 নং ধারা, চতুর্থ অনুচ্ছেদ)। কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য (বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সদস্য ছাড়া) যদি সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে একমত হয় এবং বিবদমান রাষ্ট্রের কোন এক পক্ষ যদি সেই রিপোর্ট মেনে নেয় তবে জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে না (15 নং ধারা, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ)। কিন্তু কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য (বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সদস্য ছাড়া) যদি রিপোর্ট সম্বন্ধে একমত হতে না পারে তবে সেই রিপোর্টের কোন মূল্য থাকবে না এবং জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্ররা তখন ন্যায়তঃ যা প্রয়োজন মনে করবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হ'ল এবং তখন জাতিসংঘের সদস্যদের যুদ্ধ ঘোষণার পথে কোন বাধা থাকবে না। অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চুক্তিপত্রের 12 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল রিপোর্ট পেশ করার পর 3 মাসের মধ্যে যুদ্ধ করা চলবে না। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির যে কোন এক পক্ষের অনুরোধে (সেই অনুরোধ কাউন্সিলে বিরোধ মীমাংসার জন্য পাঠাবার 14 দিনের মধ্যে করার নিয়ম ছিল) কাউন্সিল বিরোধ মীমাংসা করার দায়িত্ব সাধারণ সভার উপর ছেড়ে দিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হ'লে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সদস্যদের বাদ দিয়ে কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য এবং সাধারণ সভার অন্যান্য সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের একমত হওয়া প্রয়োজন হ'ত। বিবদমান দুইটি রাষ্ট্রের এক পক্ষ যদি মনে করে যে সেই বিরোধ তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অন্তর্গত

এবং কাউন্সিল যদি তা মেনে নেয় তবে কাউন্সিল এই বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন সুপারিশ প্রদান করবে না (15 নং ধারা, অষ্টম অনুচ্ছেদ)। অর্থাৎ সেই ধরনের বিরোধ কাউন্সিলের পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুটিল আবর্তে যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার বিরোধকে তার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অন্তর্গত বলে বর্ণনা করতে পারে এবং তার ফলে জাতিসংঘের পক্ষে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

1922 খৃষ্টাব্দে নরওয়ে, সুইডেন ও দেন্মার্কের উদ্যোগে সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক আপোষ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আপোষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি করে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করার জন্য আহ্বান করা হয়। এই পাঁচজন সদস্যের মধ্যে দুইটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র প্রত্যেকে দুইজন করে সদস্য মনোনীত করবে—এই দুই জনের মধ্যে একজন হবে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অপর জন অন্য দেশের। এই বারজন মিলে তৃতীয় কোন দেশ থেকে একজন সভাপতি নিযুক্ত করবে। সমস্ত রকম বিরোধের মীমাংসার জন্যই এই কমিশন চেষ্টা করবে। আপোষ প্রচেষ্টার পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র এই ধরনের বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করে।

শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ কতদূর সাফল্য লাভ করেছে সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

যে সব আন্তর্জাতিক বিরোধ দ্বারা বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হ'তে পারে ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 1 নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ)। সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (33 নং ধারা হ'তে 48 নং ধারা পর্যন্ত) এই বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিধিব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হ'তে পারে এমন কোন বিরোধ যদি উপস্থিত হয় তবে বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ প্রথমে আলাপ

আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ প্রচেষ্টা, সালিশী, বিচারালয় আঞ্চলিক সংগঠন অথবা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হ'লে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে সমস্ত উপায়ে তাদের বিরোধ মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবে (33 নং ধারা)। কোন একটি বিরোধ বা আন্তর্জাতিক অবস্থা দ্বারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ নির্দেশ দিতে পারে (34 নং ধারা)। এই ধরণের কোন বিরোধ বা অবস্থার সৃষ্টি হ'লে জাতিপুঞ্জের যে কোন সদস্য নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করতে পারে (34 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের সাথে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সেই রাষ্ট্রও নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে পারে, তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জ সনদের নিয়মাবলী সেই রাষ্ট্রকে সেই বিশেষ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যাপারে মেনে নিতে হবে (35 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হ'তে পারে এমন বিরোধ বা অবস্থার সৃষ্টি হ'লে নিরাপত্তা পরিষদ যে কোন সময় তা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সুপারিশ করতে পারে (36 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যদি কোন পদ্ধতি পূর্বেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে নিরাপত্তা পরিষদকে নিজস্ব সুপারিশ ঘোষণা করার পূর্বে তা বিবেচনা করে দেখতে হয় (36 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। আইনগত বিরোধ যাতে সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justiee) দ্বারা মীমাংসিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নিরাপত্তা পরিষদ তার সুপারিশ প্রস্তুত করবে (36 নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে এমন কোন বিরোধ উপস্থিত হলে প্রথমে উভয় পক্ষ আলাপ আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সব পদ্ধতির দ্বারা বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তবে বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে তা প্রেরণ করবে (37 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে উক্ত বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সত্যি সত্যি ব্যাহত হতে পারে তবে এই

পরিষদ জাতিপুঞ্জ সনদের 36 ধারা অনুযায়ী (এই ধারা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অথবা প্রয়োজন বোধ করলে বিরোধ মীমাংসার জন্য অন্য কোন সূত্র সুপারিশ করতে পারে (37 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। কোন বিরোধের সাথে জড়িত সমস্ত রাষ্ট্র যদি অনুরোধ করে তবে নিরাপত্তা পরিষদ সনদের 33নং ধারা থেকে 37 নং ধারার কোন অংশ ভঙ্গ না করে সেই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যে কোন রকম ব্যবস্থা বিবদমান রাষ্ট্রগুলির কাছে সুপারিশ করতে পারে (38 নং ধারা)।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে এমন কোন অবস্থা বা বিরোধের প্রতি সাধারণ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সাধারণ সভা সনদের 11 ও 12 ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (35 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। 11 ও 12 ধারায় সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে উল্লেখ করা হ'ল। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সহ সহযোগিতার সাধারণ নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করবে এবং এই বিষয়ে সদস্যরাষ্ট্র অথবা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ প্রেরণ করতে পারে (11 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন সমস্যা যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য রাষ্ট্র অথবা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র সাধারণ সভায় উত্থাপন করে তবে সাধারণ সভা সেই বিষয়ে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অথবা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা উভয়ের কাছেই নিজস্ব সুপারিশ পেশ করতে পারে (11 নং ধারা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন অবস্থা বা বিরোধ যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকে তবে সেই বিরোধ বা অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ ছাড়া কোন ব্যবস্থা সুপারিশ করতে পারে না (12 নং ধারা, প্রথম অনুচ্ছেদ)। সাধারণ সভার প্রত্যেক অধিবেশনের সময় জাতিপুঞ্জের মহাসচিব আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে সব সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন আছে তা নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি নিয়ে সাধারণ সভাকে জানিয়ে দেবেন। সেই সব সমস্যা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বিচার বিবেচনা যখন শেষ হয়ে যাবে তখনও মহাসচিব সাধারণ সভাকে অথবা সাধারণ সভার কোন অধিবেশন যদি না থাকে তবে জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রদিগকে জানিয়ে দেবেন (12 নং ধারা, দ্বিতীয়

অনুচ্ছেদ)। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে সাধারণ সভাও নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে পারে (11 নং ধারা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ)। নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন নয় এমন যে কোন অবস্থায়—যদি সাধারণ সভা মনে করে যে সে অবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিপন্থী—শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্বন্ধে সাধারণ সভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করতে পারে (14 নং ধারা)।

শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতদূর সাফল্য লাভ করেছে সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

4. নিরস্ত্রীকরণ

নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাস : জাতিসংঘ ও নিরস্ত্রীকরণ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যার দিকে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসন (President Wilson)-এর বিখ্যাত 14 দফার চতুর্থ শর্তে বলা হয়েছিল যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র যতদূর সম্ভব হ্রাস করে আনতে হবে। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের অষ্টম ধারায় নিরস্ত্রীকরণের কথা উল্লিখিত আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজসরঞ্জাম জাতীয় নিরাপত্তা এবং (জাতিসংঘের নির্দেশে) আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে। বিভিন্ন দেশের সরকারের বিবেচনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এবং অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দায়িত্ব জাতিসংঘের কাউন্সিলকে দেওয়া হয় (জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের অষ্টম ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। এই ব্যাপারে জাতিসংঘের কাউন্সিলকে সাহায্য করার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করার কথাও চুক্তিপত্রের নবম ধারায় বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্ররা স্বীকার করে যে বে-সরকারি কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা বিপদজনক এবং তারা সকলেই তাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ, পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন শিল্প ও কারখানা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সম্পূর্ণ ভাবে এবং স্পষ্ট করে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতে রাজী হয়।

নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আরম্ভ হয় তা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক নয়। মানবিক এবং অর্থনৈতিক কারণে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বহুদিন ধরেই চিন্তা করে আসছে। সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ফলেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্দেহ, ভয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। অতএব যুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরস্ত্রীকরণের কথা বহুদিন

থেকেই মানুষ চিন্তা করে আসছে।[1] তা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। যে অর্থ আজ বিভিন্ন দেশ সামরিক খাতে ব্যয় করে থাকে তা যদি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যেত তবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হত। সামরিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে এবং যুদ্ধ অধিকতর ব্যয়সাধ্য হওয়ার ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বিশেষ ভাবে অনুভব করতে থাকে। এই নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস 1899 খৃষ্টাব্দে প্রথম হেগ সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে ইউরোপের সমস্ত শক্তিশালী দেশ সহ 24টি রাষ্ট্র যোগদান করে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে দুইটি মামুলী প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া সেই সম্মেলন কার্যতঃ কিছুই করতে পারে না। 1907 খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে 44টি রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধি পাঠায়, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সেই সম্মেলনের পক্ষেও কার্যকরী ভাবে কিছু করা সম্ভব হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণের উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তখন এই বিষয়ে সকলেই সচেতন ছিলেন যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় বিরোধ দূরীকরণের সাথে নিরস্ত্রীকরণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই তিন দিকে একই সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে তা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম। জাতিসংঘ এই সব দিকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করে। ফ্রান্সের ধারণা ছিল যে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গঠন করে প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তা যদি সুনিশ্চিত করা যায় তবেই নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হতে পারে। ফ্রান্সের এই প্রস্তাব অন্যান্য দেশ গ্রহণ করতে পারে নি। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করার উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা অন্যত্র আলোচনা করা

---

1. অস্ত্রসজ্জার ফলে যুদ্ধ হয়, না যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলেই বিভিন্ন রাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয় তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। Sharp and Kirk তাঁদের বইতে লিখেছেন : "Arms are caused by the danger of war, far more than war is caused by the presence of arms. Clearly the well-meaning pacifists who declaim against armaments have placed the cart before the horse." তাঁদের মত হ'ল যে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ হয়, এই ধারণা থেকে যুদ্ধের জন্যই অস্ত্রসজ্জা হয়, এই ধারণা অধিকতর সত্য। সে যাই হোক, উভয় ধারণার মধ্যেই যে কিছু সত্য নিহিত আছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হয়েছে। এখানে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের কার্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের বাইরেও নিরস্ত্রীকরণের জন্য নানা ধরনের চেষ্টা চলতে থাকে। তার বিবরণও পরে দেওয়া হল।

ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রেও এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে ধীরে ধীরে সমস্ত রাষ্ট্রই তাদের অস্ত্রশস্ত্র সীমিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক ভাবে এই নিরস্ত্রীকরণকে বাস্তবরূপ দেওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘের কাউন্সিলকে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের অষ্টম ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথমতঃ একটি কমিশন গঠন করা হয়। 1920 খৃষ্টাব্দে এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে সেই সময় প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘের সাধারণ সভা এই প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হয়ে 20 জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন অস্থায়ী মিশ্র কমিশন (Temporary Mixed Commission) নামে পরিচিত। কেবলমাত্র সামরিক প্রতিনিধিদের না নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মিশ্রণে এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন প্রত্যেক দেশের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার এক প্রস্তাব পেশ করে। এই পরিকল্পনা 30,000 সৈন্যকে একটি 'ইউনিট' ধরে ফ্রান্সকে 6 ইউনিট, ইতালী ও পোল্যাণ্ডকে 4 ইউনিট, বৃটেন, চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, হল্যাণ্ড, রুমেনিয়া এবং স্পেনকে 3 ইউনিট এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে দুই 'ইউনিট' বা এক 'ইউনিট' সৈন্য রাখার ক্ষমতা প্রদান করে। এই প্রস্তাব কোন রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে রাজী হয় না। নিরাপত্তা প্রশ্নের সাথে যুক্ত করে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাকে বিচার করার কোন চেষ্টা এই পরিকল্পনাতে দেখা যায় না। মিশ্র কমিশনের একজন প্রতিনিধি Lord Esher-এর নামে এই পরিকল্পনা Esher Plan নামে পরিচিত এবং পরে এই প্রস্তাব অস্থায়ী মিশ্র কমিশন প্রত্যাহার করে নেয়। জাতিসংঘের সাধারণ সভা 1922 খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব করে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না করা গেলে নিরস্ত্রীকরণের কোন প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে না এবং সাধারণ সভা কমিশনকে এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি

চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে অনুরোধ জানায়। মিশ্র কমিশন তখন নিরাপত্তার সাথে যুক্ত করে নিরস্ত্রীকরণের এক প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাব পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধীয় চুক্তি (Draft Treaty of Mutual Assistance) নামে পরিচিত। এই খসড়াচুক্তি এবং জেনেভা প্রটোকোল (Geneva Protocol) এবং তাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

1924 খৃষ্টাব্দের পর অস্থায়ী মিশ্র কমিশনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন জাতিসংঘের বাইরে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা হয়। লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইউরোপে অনেকটা নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং 1925 খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ সভা কাউন্সিলকে একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করার জন্য নির্দেশ দেয়। কাউন্সিল প্রথমতঃ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory commission for Disarmament Conference) গঠন করে। 1926 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে এই কমিশনের অধিবেশন শুরু হ'ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই প্রস্তুতি কমিশনে যোগ দিতে রাজী হয়। এই কমিশনের কাজ যখন শুরু হয় তখন প্রত্যেক দেশেই প্রচুর আশাবাদ বর্তমান ছিল। 1928 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভায় শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার সাধারণ আইন (General Act for the Pacific Settlement of International Disputes) গৃহীত হয় এবং 1929 খৃষ্টাব্দে প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। সেই অবস্থায় অনেকেই আশা করেছিলেন যে নিরস্ত্রীকরণের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টাও বোধহয় শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে, কিন্তু প্রস্তুতি কমিশন এমন সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে সকল রাষ্ট্রই একমত হয়, কিন্তু একটি দেশের সৈন্যসংখ্যা হিসাব করার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশে বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল এবং সেই সব দেশ কার্যকরী সৈন্যসংখ্যা হিসাব করার সময় সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'লেও যারা স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে কাজ করে না তাদের বাদ দিতে চায়। জার্মানী সহ কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশ ঐ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকেও সৈন্যসংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করে। নৌশক্তি হ্রাস করার পদ্ধতি নিয়েও বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফ্রান্স ও ইতালী প্রস্তাব করে যে একটি দেশের নৌ বাহিনীর মোট বহন ক্ষমতা

কত টন (Tonnage) হবে তা স্থির করে দেওয়া উচিত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জাহাজের ক্ষমতা পৃথক পৃথক ভাবে স্থির করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশের নৌবাহিনীর মোট বহনক্ষমতা এবং সেই অনুসারে বিভিন্ন ধরনের জাহাজের ক্ষমতাও পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করে। ফ্রান্স মনে করে যে একটি দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে না পারলে সেই দেশের পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব করে (জাতিসংঘ যখন স্থাপিত হয় তখনও ফ্রান্স এই ধরনের প্রস্তাব করেছিল)। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশ নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী ঠিক মত মেনে চলেছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য ফ্রান্স ও তার বন্ধুরাষ্ট্ররা একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাহিনী বা আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা কোনটা গঠন করতেই রাজী হয় না। নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবক্ষেত্রে পালন করার দায়িত্ব প্রত্যেক দেশের সততার উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় গ্রহণে বেশীর ভাগ রাষ্ট্ররই আপত্তি ছিল। জার্মানী অন্যান্য দেশের মত সমহারে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার দাবী করে (equality of right) অর্থাৎ ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীকে যে ভাবে নিরস্ত্রীকরণ কার্যসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল তার পরিবর্তন দাবী করে। ফ্রান্স ও তার বন্ধুরাষ্ট্ররা ভার্সাই সন্ধির কোন পরিবর্তন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি লিটভিনফ (Litvinov) অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ভাবে বিলোপ করার এক অভিনব পরিকল্পনা পেশ করেন। এই ভাবে প্রস্তুতি কমিশনের পক্ষে কোন ঐকমত্যে পৌছান অসম্ভব হয়ে পড়ে। 1930 খৃষ্টাব্দে এই কমিশন অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে খসড়া চুক্তি (Convention on the Reduction and Limitation of Armaments) প্রস্তুত করে তার বিশেষ কোন কার্যকরী মূল্য ছিল না।

বহু আলাপ আলোচনা, প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব এবং বিতর্কের পরে 1932 খৃষ্টাব্দে জেনেভাতে জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রায় 60টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনের অধিবেশন এমন এক সময় আরম্ভ হ'ল যখন সমস্ত পৃথিবী এক বিরা-

অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তা ছাড়া জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না। আর্থার হেণ্ডারসন (Arthur Henderson) এই সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। তিনি তখন ছিলেন বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হওয়ার পর তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। ফলে তাঁর মর্যাদা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যথেষ্ট জোরের সাথে তিনি সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করতে পারেন না।

প্রস্তুতি কমিশনে যে সব সমস্যা দেখা দেয় এই সম্মেলনেও তা নতুন ভাবে দেখা দিল। ফ্রান্স আন্তর্জাতিক বাহিনী, আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা ইত্যাদির দাবী তোলে। জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিজের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক ভাবে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণাত্মক অস্ত্র ও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের মধ্যে সীমারেখা টেনে আক্রমণাত্মক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। জার্মানী অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সমান অধিকার দাবী করে। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত জার্মানীকে অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার দিতে হবে অথবা ভার্সাই সন্ধিতে নিরস্ত্র জার্মানীর মত অন্যান্য দেশকেও নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল জার্মানীর দাবী (equality of rights এর দাবী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তখন এক নতুন প্রস্তাব দেন। তিনি সামরিক স্থল বাহিনীকে দুই অংশে ভাগ করেন—অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার জন্য এক অংশ এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এক অংশ। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয় যে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে স্থলবাহিনী বর্তমানে বিভিন্ন দেশ গঠন করেছে তার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করতে হবে। যে সব দেশের স্থলবাহিনীতে এক লক্ষের বেশী সৈন্য আছে (ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীকে এক লক্ষ সৈন্য রাখার অধিকার দেওয়া হয়) সেই সব দেশের জন্য তিনি এই প্রস্তাব করেন। তিনি ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণের কথাও সেই প্রস্তাবে উল্লেখ করেছিলেন। জার্মানী, ইতালী সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যখন

সম্ভব হ'ল না তখন জুলাই মাসে (1932) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা হয়। জার্মানী তখন ঘোষণা করে যে অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মত সমান অধিকার জার্মানীকে না দিলে ভবিষ্যতে সে আর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দেবে না। অক্টোবর মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন যখন পুনরায় শুরু হয় তখন জার্মানীর কোন প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে যোগ দেয় না। পরে ডিসেম্বর মাসে (1932) জার্মানীর সম-অধিকার দাবী (equality of rights) বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বীকার করে নেয়। পরের মাসেই হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। ভার্সাই চুক্তি উপেক্ষা করে জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করা ছিল হিটলারের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু হিটলার ক্ষমতায় আসার পরেও কয়েক মাস নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে জার্মানীর সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠে এবং সেই অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হয়ে পড়েন। সেই সময় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay MacDonald) পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধাপে ধাপে সমস্ত দেশের সৈন্যসংখ্যা এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম হ্রাস করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ কি পরিমাণ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারবে তার তালিকাও তিনি প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনায় বলা হয় যে যদি কোন দেশ এই প্রস্তাবিত চুক্তি ভঙ্গ করে সৈন্যসংখ্যা বা অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করে তবে প্যারিস চুক্তি বা কেলগব্রিয়াঁ চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই পরিকল্পনার সাথে জড়িত করে রাখার জন্যই ম্যাকডোনাল্ড এই প্রস্তাব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt) ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন এবং সাথে সাথে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের পরিকল্পনা আলোচনা করতে গিয়ে এত মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় না। 1933 খৃষ্টাব্দের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন মুলতুবী রাখা হয়। আশা করা হয়েছিল যে এই সময় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে এক সর্ববাদিসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন। সেই সময় ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। সেই

পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে চার বৎসর পর্যন্ত জার্মানী সহ কোন রাষ্ট্র যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধি করবে না এবং চার বৎসর পরে অন্যান্য দেশ ট্যাঙ্ক, বোমারু-বিমান ইত্যাদি যে সব অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী থাকবে জার্মানীকেও তা প্রস্তুত করার অধিকার দেওয়া হবে (যদিও ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর পক্ষে তা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়)। প্রথম চার বৎসর বিভিন্ন দেশের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে হিসাব নেওয়া হবে এবং পরে নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী তা হ্রাস করার পরিকল্পনা করা হয়। ফ্রান্স হিটলারের নাৎসী জার্মানীকে তখনই অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করার অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু জার্মানী চার বৎসর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। অন্যান্য দেশের যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে জার্মানী তখনই তা উৎপাদন করার অধিকার দাবী করে। নাৎসী জার্মানীর জঙ্গী মনোভাব নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ার দুদিন পূর্বে (অক্টোবর 1933) জার্মানী সেই সম্মেলন পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ থেকে বিদায় নেওয়ার অভিপ্রায়ও ঘোষণা করে। জার্মানীর এই সিদ্ধান্তের ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আবার মুলতুবী রাখা হয়। এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন বোঝাপড়া না হলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে কোন সাফল্য লাভের আশা নেই। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে তখন কূটনৈতিক পর্যায়ে অনেক আলাপ আলোচনা হল কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। 1934 খৃষ্টাব্দের মে মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আবার আহ্বান করা হয়। সেই সম্মেলনে ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (নাৎসী জার্মানীর অভ্যুত্থানে এই দুই দেশ তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠে) এই অভিমত প্রকাশ করে যে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পূর্বে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী প্রভৃতি দেশ নিরস্ত্রীকরণের উপরই প্রথম জোর দেয় এবং মনে করে যে নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গৃহীত হলে তার পরে বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হবে। এই দুই মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হল না। জুন মাসে সম্মেলন আবার মূলতুবী রাখা হয়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আর কোন অধিবেশন আহ্বান করা হয় নি, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়াও হয় নি। নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

বিভিন্ন দেশের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ এবং পরস্পরের মধ্যে ভীতি, সন্দেহ ও বিদ্বেষের সম্পর্ক নিরস্ত্রীকরণের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ফ্রান্স-জার্মান বিরোধিতা এত প্রকট হয়ে উঠে যে সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া জার্মানীতে নাৎসীবাদ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের জঙ্গীবাদ সৃষ্টি হওয়ায় নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা প্রহসনে পরিণত হয়। হিটলারের নাৎসী পার্টি দেশের উন্নতির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জার্মান জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে আরম্ভ করে। জাপান মাঞ্চুরিয়াকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে (যদিও যুদ্ধ ঘোষণা করে না)। এই অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। একটি বৃহৎ দেশ যদি নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তবে অন্য কোন দেশের পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব না—ফ্রান্সের এই যুক্তি যথার্থ। বিশেষ করে একটি দেশ যখন তার শক্তিশালী প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন (যেমন সেই যুগের ফ্রান্স-জার্মানী সম্পর্ক) তখন তার পক্ষে নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হয়ে নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাকে বিচার করা যায় তবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা আমাদের কোন বিস্ময়ের সঞ্চার করে না।

জাতিসংঘের বাইরে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা

জাতিসংঘ যেমন নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করেছে তেমনি জাতিসংঘের বাইরেও কয়েকটি রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। সিনেটের বিরোধিতার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্য হওয়া সম্ভব হয় নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ জাতি-সংঘের বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিল (অবশ্য মার্কিন সরকার জাতিসংঘের নিরস্ত্রী-করণের প্রচেষ্টাতেও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-শক্তিকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহরে পরিণত করতে হবে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইংলণ্ড ও জাপানের নৌশক্তির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সুদূর প্রাচ্যে জাপানই শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি হিসেবে

পরিগণিত হয়। চীন ফিলিপাইনস্ ইত্যাদি সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। তাই জাপানের নৌশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার নৌশক্তিকে বাড়াতে থাকে। জাপানের সাথে ইংলণ্ডের চুক্তি থাকার ফলে (1902 সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়) জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডও জড়িত হয়ে পড়ে এবং ইংলণ্ডের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব এই প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং প্রধানতঃ ইংলণ্ড, জাপান ও তাঁর নিজের দেশের মধ্যে নৌশক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য ওয়াশিংটনে এক সম্মেলন আহ্বান করতে মনস্থ করেন। এই সমস্যার সাথে সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা জড়িত থাকায় এই সম্মেলনে সেই সব সমস্যাও আলোচনা করা হবে বলে স্থির হয় এবং কেবল জাপান ও বৃটেনকে আহ্বান না করে ফ্রান্স, ইতালী, চীন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল এবং নেদারল্যাণ্ডসকেও আমন্ত্রণ করা হল।

1921 খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference) আরম্ভ হয় এবং 1922 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ঐ অধিবেশন চলে। এই সম্মেলনে মোট 7টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—তার মধ্যে পাঁচটি চুক্তি সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে এবং দুইটির উদ্দেশ্য ছিল নৌশক্তির প্রতিযোগিতা হ্রাস করা। এই দুইটি চুক্তি পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান নৌশক্তির মধ্যে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালী—স্বাক্ষরিত হয়। একটির দ্বারা এই পাঁচটি দেশের যুদ্ধের জাহাজের অনুপাত ভবিষ্যতের জন্য স্থির করে দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালীকে যে অনুপাতে যুদ্ধ জাহাজ রাখবার অনুমতি দেওয়া হয় তা হল যথাক্রমে 5 : 5 : 3 : 1.75 : 1.75। অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের 60 শতাংশ জাপানকে এবং 30 শতাংশের কিছু বেশী ফ্রান্স ও ইতালীকে রাখতে দেওয়া হয়। এই অনুপাতে এই পাঁচটি দেশের যুদ্ধ জাহাজের টনেজ (tonnage) সীমিত করে দেওয়া হল এবং পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে এই সব দেশ আর কোন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অপর একটি চুক্তি দ্বারা এই পাঁচটি দেশ যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সাবমেরিন ব্যবহার সম্বন্ধে কতগুলি নীতি নির্ধারণ করে।

নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে ওয়াশিংটন সম্মেলন আংশিকভাবে সফলতা লাভ করে, যদিও এই সাফল্যের গুরুত্ব বেশী ছিল না। কেবল মাত্র নৌশক্তি সীমাবদ্ধ করে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। নৌশক্তির মধ্যে কেবল মাত্র যুদ্ধ জাহাজ সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাবমেরিন, ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুইজার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই নীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের—বিশেষ করে ফ্রান্সের—বিরোধিতার জন্য তা সম্ভব হয় না। কেবল যুদ্ধ জাহাজ সীমিত করে নৌশক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত উক্ত পাঁচটি দেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হওয়ার জন্যই তারা তা মেনে নিতে রাজী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকায় যুদ্ধ-জাহাজের ব্যাপারে তাদের সমান অধিকার উভয়ই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়। জাপানের নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজের 60 শতাংশ রাখার অধিকার পেলেও তার নিজস্ব এলাকায় জাপানের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৃটিশ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির প্রাধান্য ফ্রান্সের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল না এবং জাপানের সাথে ফ্রান্সের নৌশক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। অপেক্ষাকৃত গরীব দেশ ইতালীর তখন পর্যন্ত অন্য দেশের সাথে নৌশক্তিতে প্রতিযোগিতা করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। অন্য দেশের নৌশক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায় এবং ফ্রান্সের সাথে সমান অধিকার লাভ করায় ইতালী তখন সন্তুষ্টই হয়েছিল। এই সব কারণে অন্ততঃ আংশিক ভাবে ওয়াশিংটন সম্মেলন নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে সফলতা লাভ করে।

1927 খৃষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজ (President Coolidge) জেনেভাতে আর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধজাহাজ ভিন্ন নৌশক্তির অন্যান্য সাজসরঞ্জামকেও সীমিত করা এবং এখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালীকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ফ্রান্স ও ইতালী এই সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী হয় না। তাদের ধারণা হয়েছিল যে এই ধরনের সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থই রক্ষিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির স্বার্থ রক্ষিত হয় না। তারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে জাতিসংঘই যখন নিরস্ত্রীকরণ

সম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন পাঁচটি দেশের পক্ষে পৃথক ভাবে এই বিষয়ে সম্মেলন করা অর্থহীন। তা ছাড়া ফ্রান্স ও ইতালী জানায় যে কেবলমাত্র নৌশক্তি সীমিত করে নিরস্ত্রী-করণের আসল উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়। অতএব জেনেভা সম্মেলনে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং জাপানের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই তিন শক্তির সম্মেলনও সম্পূর্ণ বিফল হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে যেমন যুদ্ধজাহাজ সীমিত করা হয়েছিল এই সম্মেলনে সেই ভাবে ক্রুইজার (cruiser) সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের ক্রুইজারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রস্তাব করে কিন্তু বৃটেন তা গ্রহণ করতে রাজী হয় না। বৃটেনের প্রস্তাব ছিল যে ক্রুইজারের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে দিয়ে মোট ক্রুইজারের আয়তন (size) এবং বহন ক্ষমতা (tonnage) নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিকারী বৃটেনের সংখ্যায় অনেকগুলি ক্রুইজারের প্রয়োজন ছিল। বৃটেনের দাবী ছিল ছোট আকারের অনেকগুলি ক্রুইজার আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ছিল বৃহৎ আকারের অল্প সংখ্যক ক্রুইজার। এই দুই মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং জেনেভা সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই জেনেভা সম্মেলনের পরে ইং-মার্কিন সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হয়েছিল যে বৃটেন ক্রুইজার ব্যাপারে নিজেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী রাখার পক্ষপাতী। 1929 খৃষ্টাব্দে হার্বার্ট হুভার (Herbert Hoover) মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং দ্বিতীয় বারের জন্য রামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay MacDonald) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পরে এই দুই দেশের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়। সেই বৎসর রামজে ম্যাকডোনাল্ড মার্কিন সফরে যান এবং পারস্পরিক আলোচনার ফলে সন্দেহ ও বিদ্বেষের ভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। তারপর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালীকে লণ্ডনে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। 1930 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল বটে, কিন্তু ইতালী এবং ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হয় না। জেনেভা সম্মেলনে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা

দিয়েছিল তা এই সম্মেলনে দূর করা সম্ভব হল। এই দুই দেশের মোট ক্রুইজারের আয়তন (size) বা বহনক্ষমতা (tonnage) সমান রেখে ইংলণ্ডকে ক্ষুদ্র আকারের অধিক সংখ্যক ক্রুইজার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৃহৎ আকারের অল্প সংখ্যক ক্রুইজার রাখার অধিকার দেওয়া হয়। সাবমেরিন এবং ডেষ্ট্রয়ারের ক্ষেত্রেও বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে বলে স্থির হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলমে জাপানকে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা কম নৌশক্তি রাখার অধিকার দেওয়ায় জাপান অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং নৌশক্তির সমস্ত বিষয়ে তাদের সমান অধিকার দাবী করে। শেষ পর্যন্ত জাপানকে সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান শক্তি এবং ডেষ্ট্রয়ার এবং ক্রুইজারের ক্ষেত্রে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 60 শতাংশের কিছু বেশী শক্তি অর্জন করার অধিকার দেওয়া হল। এই তিন রাষ্ট্রই 1936 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই লণ্ডন সম্মেলনে ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে ফ্রান্স ও ইতালী সমপরিমাণ যুদ্ধজাহাজ রাখার অধিকার পায়। লণ্ডন সম্মেলনে ইতালী নৌবাহিনীর অন্যান্য ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের সমান শক্তি দাবী করে। ফ্রান্সের পক্ষে সেই দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। ফ্রান্সের যুক্তি ছিল যে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফ্রান্সের যে নৌবল প্রয়োজন ইতালীর তা প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ফ্রান্সের পক্ষে কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূল রক্ষা করাই যথেষ্ট নয় উত্তর এবং পশ্চিম দিকের উপকূল রক্ষার জন্যও নৌশক্তি প্রয়োজন। তাই ফ্রান্স ও ইতালীর নৌশক্তি সমান হলে ভূমধ্যসাগরে ইতালী তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে। ফ্রান্স তার নিরাপত্তা সম্বন্ধেই ভীত ছিল। ফরাসী সরকার প্রস্তাব করে যে ইংলণ্ড যদি ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে লোকার্নোর মত একটি চুক্তি সম্পাদন করতে রাজী হয় তবে ইতালীর সমপরিমাণ নৌশক্তি রাখতে ফ্রান্সের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইংলণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে রাজী হয় না। তাই 1930 খৃষ্টাব্দের 27 এপ্রিল লণ্ডন সম্মেলনে যে সাধারণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে ফ্রান্স ও ইতালী যোগ দিতে অস্বীকার করে। ফ্রান্স ও ইতালী স্বাক্ষর দিতে রাজী না হওয়ায় ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সেই চুক্তিতে একটি বিশেষ ধারা সংযোজন করে যে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হলে পূর্বে যথাবিহিত নোটিশ দিয়ে

তারা নৌশক্তি বাড়াতে পারবে। ফলে লণ্ডন সম্মেলনের মূল্য বিশেষ কিছু রইল না।

1935 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লণ্ডনে আর একবার নৌ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তার পূর্বেই 1931 খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী ভার্সাই চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করে দ্রুতগতিতে সামরিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে। 1934 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে জাপান ওয়াশিংটন সম্মেলনের চুক্তির মেয়াদ শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দুই বৎসরের নোটিশ প্রদান করে। এই অবস্থায় নৌশক্তি সীমিত রাখার চেষ্টা বা নিরস্ত্রী-করণের উদ্দেশ্যে কোন সম্মেলন অনেকটা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। এই সম্মেলনে জাপান বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী অপেক্ষা কম নৌশক্তি রাখার কোন প্রস্তাবেই রাজী হয় না। এই সম্মেলনের একমাত্র ফল হল এই যে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করার পূর্বে পরস্পরকে সেই সংবাদ জানাতে এবং বিভিন্ন ধরনের জাহাজের বহন ক্ষমতা (tonnage) সীমিত রাখতে রাজী হয়।

জাপান, ইতালী ও জার্মানীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ শেষ পর্যন্ত অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত হ'ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা

এ্যাটম বোমা এবং পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আরও জটিল রূপ ধারণ করে। 1945 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জাপানের নাগাসাকি এবং হিরোশিমাতে যে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করা হয় তার ধ্বংসাত্মক লীলায় সমস্ত পৃথিবীর লোক চমকিত হয়ে উঠে। এই বোমা বিস্ফোরণের পূর্বেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ তৈরী হয়ে যায়। সেই সনদে নিরস্ত্রীকরণের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয় নি। সনদের 26 ধারায় নিরাপত্তা পরিষদকে এবং Military Staff Committee-কে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে প্রত্যেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার (reduction of national armaments) কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু জাতিপুঞ্জের সনদে কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (regulation of armaments) করার কথা বলা হয়েছে। এ্যাটম বোমা এবং পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক

ক্ষমতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে সনদের রচয়িতাগণ সেই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তা বলা কঠিন।

1946 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা পারমাণবিক শক্তি কমিশন (Atomic Energy Commisson) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র এ ং কানাডার প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সাধারণ সভা কর্তৃক গঠিত হলেও এই কমিশনকে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে তার রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়। এই কমিশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। এই কমিশনের প্রথম অধিবেশনে (জুন, 1946) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তিকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে রাখার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (Intetnational Atomic Development Authority) স্থাপনের প্রস্তাব করে। সেই প্রস্তাবে বলা হয় যে ইউরেনিয়াম (uranium) ও থোরিয়াম (thorium) সহ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম কাঁচামাল এই আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হবে। ইউরেনিয়াম ছাড়া পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা যায় না এবং ইউরেনিয়াম পৃথিবীর খুব কম স্থানেই পাওয়া যায়। অতএব এই প্রস্তাবে বলা হয় যে বিভিন্ন সরকার রাজী হ'লে এই ইউরেনিয়ামের উপর আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা খুব কঠিন নয়। ইউরেনিয়াম এবং থেরিয়াম দিয়ে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করার সমস্ত কলকারখানা এই আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালনায় রাখা হবে। এ্যাটম নিয়ে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণা এই আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশকে এই সংস্থা গবেষণা করার অনুমতি দেবে এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করবে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এ্যাটমিক কারখানাগুলি বা অস্ত্রশস্ত্র কোন একটি দেশ যাতে হঠাৎ অধিকার করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রত্যেক দেশ এই আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি মেনে চলছে কি না তা পরীক্ষা করার পূর্ণ ক্ষমতা এই সংস্থাকে প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে বিনা নোটিশে এই সংস্থাকে যে কোন স্থান পরিদর্শন করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। পারমাণবিক শক্তি যাতে সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করার পূর্ণ ক্ষমতাও এই সংস্থাকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

কোন রাষ্ট্র যদি সেই নীতি ভঙ্গ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং ভিটো প্রদান করে সেই শাস্তি বিধানকে নাকচ করা চলবে না। এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে সব এ্যাটম বোমা ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আছে তা এই সংস্থাকে প্রদান করতে রাজী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র International Atomic Development Authority কে পারমাণবিক ক্ষেত্রে এত বেশী ক্ষমতা প্রদান করতে প্রস্তুত ছিল যা ইতিহাসে অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দেওয়া হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কমিশনে এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাব সাধারণতঃ গ্রোমাইকো (Gromyko) প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং বর্তমানে সেই ধরনের যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে তা ধ্বংস করার কথা বলা হয়। এই প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহারে "মানবতার বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ" (a most serious international crime against humanity) বলে বর্ণনা করা হয়। সোভিয়েত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার কথাও বলা আছে। দুইটি কমিটি স্থাপন করা হবে—একটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য এবং অপরটি পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ব্যবহারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা সুপারিশ করার জন্য। সোভিয়েত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং সেই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। মার্কিন প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই ধরনের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হ'লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে এবং সেই সম্পর্কে গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজী হয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শক্তির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অস্বীকার করে। পারমানবিক শক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধান ভঙ্গ করার অপরাধে শাস্তি বিধানের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তা গ্রহণ করতেও রাজী ছিল না।

Atomic Energy Commission এই দুই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য কয়েকটি কমিটি স্থাপন করে, কিন্তু কোন বিষয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করা সম্ভব হয় না। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সদ্ভাবের অভাবেই সমস্ত ব্যর্থ হয়। প্রথমেই সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলার সোভিয়েট প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অসম্মত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায়।

1948 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিরাপত্তা পরিষদ প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন (Conventional Armaments Commission) স্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রদের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। আগষ্ট মাসে এই কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধের আবহাওয়া সৃষ্টি হলেই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণ করার নীতি গ্রহণ করা সম্ভব। এই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে সনদের 43 ধারা অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের বাহিনী গঠন করা, পারমাণবিক শক্তির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং জার্মানী ও জাপানের সাথে শক্তিচুক্তি সম্পাদন করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপরে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রশস্ত্র জাতিপুঞ্জের প্রয়োজন (সনদের 43 ধারা) এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন (সনদের 51 ধারা) অনুযায়ী কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারে নি। সেপ্টেম্বর মাসে (1948) সোভিয়েত পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটোভ সাধারণ সভার কাছে নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর শক্তি এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করার প্রস্তাব পেশ করেন। সাধারণ সভা এই প্রস্তাবকে বিবেচনা করে দেখার জন্য প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন (Conventional Armaments Commission)-কে অনুরোধ করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার এবং সেই সংবাদের সত্যতা পরীক্ষা করার (obtaining and verifying information) পদ্ধতি সম্বন্ধেও কমিশনকে রিপোর্ট করতে বলা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট যখন নিরাপত্তা

পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রিপোর্টকে ভিটো ক্ষমতার দ্বারা নাচক করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সেনাবাহিনীর শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করতে রাজী ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে সংবাদ না পেলে কোন রাষ্ট্র তার শক্তির এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করল কি না, তা কি করে বুঝা যাবে? সাধারণ সভা এই বিষয়ে কমিশনের রিপোর্টকে সমর্থন করে, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত না হওয়ায় এই রিপোর্টের কোন মূল্য থাকে না।

1950 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সাধারণ সভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই অভিমত প্রকাশ করেন যে পারমাণবিক অস্ত্র এবং সাধারণ প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য পৃথক কমিশন না করে নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করলে তা অধিকতর কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ সভা শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং 1952 খৃষ্টাব্দের 11 জানুয়ারীতে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (Disarmament Commisson) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং কানাডার প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিশন গঠিত হ'ল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করতে হলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত তার সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ সম্বন্ধে খবর দেওয়া এবং সেই খবরের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন (disclosure and verification)। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবে রাজী হয় না। 1952 খৃষ্টাব্দের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স প্রত্যেক দেশের সৈন্য হ্রাস করার এক প্রস্তাবে দেয়। সেই প্রস্তাবে বলা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সীমা 10 লক্ষ থেকে 15 লক্ষের মধ্যে কোন একস্থানে নির্ধারিত করে দেওয়া হবে এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনী 7 লক্ষ এবং 8 লক্ষের মধ্যে কোন এক বিশেষ সংখ্যায় হ্রাস করে আনা হবে। অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীর সীমাও পরে নির্ধারিত করে দেওয়া হবে। একটি দেশের পদাতিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অনুপাত কি রকম হবে, এইসব বিষয় নিরস্ত্রীকরণের এই প্রস্তাবে উল্লিখিত না থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের

এইসব সমালোচনার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

1953 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স ও কানাডার প্রতিনিধি নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের একটি উপসমিতি বা সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এই সাব-কমিটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে গোপনে আলাপ আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিরস্ত্রীকরণের একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। 1955 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধানরা জেনেভাতে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন, কিন্তু তাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের কোন নিরসন হয় না। নিরস্ত্রীকরণের সাব-কমিটিও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বহু সভায় মিলিত হয়, কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতৈক্য স্থাপন সম্ভব হয় না। অবিলম্বে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য এবং বিদেশী রাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটি বিনষ্ট করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দাবী জানায়। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ তা গ্রহণ করতে রাজী হয় না।

এদিকে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলতে থাকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে নানা ধরনের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। 1957 খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে আবেদন জানায়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন স্বেচ্ছায় পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করতে রাজী হয়। ইতিমধ্যে জেনেভাতে আণবিক অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়। 1959 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্স একত্র হয়ে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিটি গঠন করে। উপরের চারটি বৃহৎ শক্তি ছাড়া এই কমিটিতে বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালী ও কানাডার প্রতিনিধি নেওয়া হয়। সেই মাসেই জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের এক সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভা 10-সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার একটি সর্ববাদিসম্মত সমাধান দিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করে। 18 সেপ্টেম্বর (1959) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তাঁর প্রস্তাবে চার

বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশের সমস্ত সামরিক শক্তি একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়ার কথা বলা হয়।

1951 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা কর্তৃক 18টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটি জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা আরম্ভ করে। নিম্নলিখিত দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি স্থাপিত হয়েছিল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, ব্রাজিল, বার্মা, ইথিওপিয়া, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, সুইডেন এবং ইজিপ্ট। ফ্রান্স এই কমিটিতে যোগ দিতে অসম্মত হয় এবং তাই প্রকৃতপক্ষে 17টি দেশ এই কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে করে। 1952 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি করে প্রস্তাব সেখানে পেশ করে। এই কমিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বৃটেনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করে এবং পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব এই সাব-কমিটির উপর দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা তখন অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং সাব-কমিটির কাছে একটি প্রধান সমস্যা হ'ল যে মাটির অভ্যন্তরে যদি কোন দেশ পরীক্ষামূলক ভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তবে তা কি করে ধরা যাবে? সেই বিস্ফোরণের ফলে ভূমি-কম্পের মত কম্পন সৃষ্টি হয় এবং যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে যে এই ধরনের কম্পন যন্ত্রে ধরা পড়লে বৈজ্ঞানিকদের সেই অঞ্চলে গিয়ে তা পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখবেন যে সেই কম্পন কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য হয়েছে কিনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয় না—বিশেষ করে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের কোন অঞ্চল পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিতে সোভিয়েত সরকার অস্বীকার করে। আগষ্ট মাসে (1952) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে একটি চুক্তি সম্পাদন করার প্রস্তাব দেয়। এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটলে বিস্ফোরণের অঞ্চলে না গিয়েও তা ধরা যায়। তাছাড়া, মাটির অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ু দূষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ

আংশিকভাবে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয় না, কিন্তু আরও আলাপ আলোচনার পরে 1953 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইনিয়ন এবং বৃটেন আংশিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে চুক্তিতে (Partial Nuc!ear Test Ban Treaty) স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানায় এবং তাতে স্বাক্ষর দান করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন ও ফ্রান্স এই চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। 1956 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও চীন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং বিভিন্ন দেশ সেই আচরণের তীব্র নিন্দা করে। চীন ও ফ্রান্সের এই নীতি এখনও বজায় আছে। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতকরণ নিষিদ্ধ করার জন্যও চেষ্টা আরম্ভ হয়। এদিকে এই আশঙ্কা দেয় যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত অনেকগুলি রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হবে এবং তার ফলে সেই সব দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিই কেবলমাত্র ব্যাহত হবে না, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও জটিল আকার ধারণ করবে। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার (proliferation of nuclear weapons) বন্ধ করার জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেন। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 1956 খৃষ্টাব্দে 18টি রাষ্ট্রের এক সম্মেলন জেনেভাতে আহ্বান করা হয়। বহু আলাপ আলোচনার পরে 1957 খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বিষয়ে একটি চুক্তির খসড়া সম্বন্ধে একমত হল। পারমাণবিক অস্ত্র যে সব দেশ এখনও প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় নি তারা যাতে সেই ধরনের অস্ত্র প্রস্তুত না করে তাই হ'ল এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। সেই চুক্তির খসড়ায় বলা হয় যে পারমাণবিক দেশগুলি অন্য কোন দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র বা সেই ধরনের অস্ত্র প্রস্তুত করার তথ্য সরবরাহ করবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্র যে সব দেশ এখনও প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় নি তারা সেই ধরনের অস্ত্র প্রস্তুত না করার জন্য অথবা অন্য দেশ থেকে সেই ধরনের অস্ত্র বা সেই সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ না করার প্রতিশ্রুতি দেবে। অবশ্য শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক গবেষণা চালাবার অধিকার প্রত্যেক দেশকেই দেওয়া হয়। 1958 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধ চুক্তি (Nuclear Non-Proliferation Treaty) ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ভারত, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ এই চুক্তি

গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। পারমাণবিক শক্তির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই চুক্তি চিরদিনের জন্য পারমাণবিক দেশগুলির প্রাধান্য বজায় রাখবে মাত্র।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের অনেক কাছাকাছি আসার ফলে পারমাণবিক অস্ত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। 1952 খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রেসিডেণ্ট নিকসন যখন সোভিয়েত রাশিয়া সফরে যান তখন (26 মে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আন্তর্দেশীয় রকেট বিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সীমিতকরণের জন্য একটি চুক্তি (Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System) স্বাক্ষরিত হ'ল এবং রণনীতিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি অন্তর্বর্তী ঐক্যমত (Interim Agreement on Certain Measures with respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তি SALT I (Strategic Armaments Limitation Treaty) নামে পরিচিত। পরের বৎসর (1973) জুন মাসে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল. ব্রেঝনেভ (L. Brezhnev) যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন এই দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ নিরোধ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির প্রথম ধারায় দুই পক্ষ ঘোষণা করে যে তাদের নীতির আসল উদ্দেশ্য হল পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার রোধ করা। সেই সময় ব্রেঝনেভ ও নিকসন-এর যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় যে রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত এক কার্যকরী আন্তর্জাতিক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনা করে দুই পক্ষই এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে অন্যান্য দেশগুলির সহযোগিতায় তারা এই ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। দুই পক্ষই জেনেভায় সম্মিলিত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কমিটির কাজে সহায়তা করার জন্য সর্ব প্রকার প্রয়াস চালাতে রাজী হয়। 1959 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে SALT II স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত এই চুক্তি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় নি।

নিরস্ত্রীকরণের বিভিন্ন সমস্যা

নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ সহজ হলেও এ বিষয়ে কৃতকার্যতা অর্জন করা খুব কঠিন। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন নিয়ে নানা সমস্যা জড়িত। পূর্বেই আলোচনাতেই এই সব সমস্যা মোটামুটিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি নিয়ে আবার আলোচনা করা হ'ল।

বিশেষ প্রয়োজনে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অথবা অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করেও যদি সেই উদ্দেশ্য ও সেই প্রয়োজন পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব হয় তবেই রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। যে সব রাষ্ট্র শান্তির নীতিতে বিশ্বাস করে তারাও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কূটনৈতিক আলোচনায় কৃতকার্যতা অর্জনের জন্যও সামরিক শক্তি প্রয়োজন হয়, এবং কোন কারণে যুদ্ধ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তবে তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। কোন কোন রাষ্ট্র আবার আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থাকে জোর করে পরিবর্তন করার জন্যই অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে কার্যকরী এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি যদি দেওয়া না যায় তবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নিরস্ত্রীকরণের সাথে নিরাপত্তার সমস্যাকে একত্র করে বিবেচনা করার অনেক চেষ্টা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার দেওয়া হবে তা স্থির করা খুবই কঠিন এবং সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্যমত স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। অধিকতর শক্তিশালী দেশগুলি সাধারণতঃ স্থিতাবস্থা বজায় রেখে আর অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত না করার জন্য অথবা সমান হারে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব দিয়ে থাকে। এই প্রস্তাবে অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য বজায় থাকে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষ যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে অধিক বলশালী সেই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার উপরই বেশী জোর দিয়ে থাকে। ফলে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশের অস্ত্র এবং সেনাদলের শিক্ষাপদ্ধতি একই রকমের থাকে না। কোন কোন দেশ পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত, অবার বহু দেশের সেই ধরনের অস্ত্র একেবারেই নেই। কোন কোন রাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে সাবমেরিনের সংখ্যা বেশী, আবার অনেক রাষ্ট্র আছে যাদের যুদ্ধ জাহাজ বেশী। এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যারা বহু সংখ্যক নাগরিককে মোটামুটি ভাবে সামরিক শিক্ষা দিয়ে রাখে, আবার অনেক রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক নাগরিককে বিশেষভাবে সামরিক শিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত করে তোলে। এই অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের হার নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। নিরস্ত্রীকরণের সময় কয়টি সাবমেরিনকে একটি যুদ্ধ জাহাজের সমান বলে গ্রহণ করা হবে? হাল্কা ট্যাঙ্ক ও ভারী ট্যাঙ্কের হার কি ভাবে ঠিক করা যায়? সাধারণ ভাবে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কতজন নাগরিককে একজন পেশাধারী সৈনিকের সমান বলে ধরা হবে? এইসব সমস্যার সন্তোষজনক কোন সমাধান নেই। তা ছাড়া কোন কোন দেশের সীমা প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত, আবার অনেক রাষ্ট্র আছে যাদের সীমান্ত সেই ভাবে সুরক্ষিত নয়। এই পার্থক্য নিরস্ত্রীকরণের হারকে কি ভাবে প্রভাবিত করবে? ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত জাহাজকে প্রয়োজন হলে যুদ্ধের কাজেও ব্যবহার করা চলে। নিরস্ত্রীকরণের সময় এই ধরনের জাহাজের গুরুত্ব কি ভাবে স্থির হবে? প্রয়োজনের সময় অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার ক্ষমতা একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় উপর নির্ভর করে। কোন কোন দেশের পক্ষে সহজেই সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সম্ভব, আবার কোন কোন দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করার পরে এক সময় যদি তা ব্যর্থ হয়ে যায় তবে প্রথমোক্ত দেশগুলি থেকে শেষোক্ত দেশগুলি অনেক বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হবে। /

চতুর্থতঃ, একটি রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব মেনে নিলেও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছে কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। নিরস্ত্রীকরণ কার্যসূচীর রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি রাষ্ট্র সাধারণতঃ অন্য রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র কি পরিমাণে প্রস্তুত করছে তা অনুসন্ধান করে দেখার প্রশ্ন উঠে। তার ফলে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক সময় সেই কারণেই নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না

পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এই ধরনের সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কার্যকরী পদ্ধতি হওয়া দুষ্কর। Quincy Wright তাঁর বই *A Study of War*-এ লিখছেন: "It is unlikely that agreement will ever be reached on the technical problems of disarmament unless the parties have lessened tensions by political settlements or by general acceptance of international procedures creating confidence that such settlements can be effected peacefully."

আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিবোধ

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক আইন বা International Law কথাটি সর্বপ্রথম Jeremy Bentham ব্যবহার করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সব আইন মেনে চলে সেগুলিকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলে থাকি। যেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেজন্য উপর থেকে রাষ্ট্রগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন সৃষ্টি করা যায় না। Snow এবং আরও কয়েকজন International Lawর পরিবর্তে Supernational Law নামটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই নাম সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। Supernational Law কথাটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্বসংস্থার অস্তিত্ব ছাড়া Supernational Law কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ অপর কোন সংস্থার আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই। বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ফলেই আইন আন্তর্জাতিক রূপ পেয়ে থাকে। অতএব আন্তর্জাতিক আইন বলতে এমন সব নিয়ম কানুন বোঝায় যা সভ্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলতে নিজেদের আইনতঃ বাধ্য মনে করে। বিখ্যাত লেখক Oppenheium এ ভাবেই আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন।[1]

Oppenheium তাঁর গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক আইন প্রধানতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে—রাষ্ট্রের নাগরিকদের

1. Oppenheium লিখেছেন : "Law of Nations or International Law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other."

Lawrenceএর ভাষায় আন্তর্জাতিক আইনের অর্থ হ'ল the rules which determine the conduct of the general body of civilized states in their mutual dealings."

Brierly লিখেছেন : "The Law of Nations or International Law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another."

সাথে আন্তর্জাতিক আইনের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক লেখকই এই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই মতের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আজকাল অনেকে মনে করেন যে আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তি মানুষের উপরও প্রযোজ্য হতে পারে। Philip C. Jessup এই মতের একজন বড় সমর্থক এবং তাঁর *A Modern Law of Nations* নামক পুস্তকে উক্ত মতের সমর্থনে তিনি অনেক যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় কি না সেই সম্বন্ধে বহুদিন ধরেই পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। Hobbes, Pufendorf প্রমুখ অনেকে মনে করতেন যে তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনকে আসলে আইনের মর্যাদা দেওয়া চলে না। জন অষ্টিন (John Austin) আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং তিনিও উক্ত মতকেই সমর্থন করে গেছেন। Vattel, Holland প্রমুখ অনেকেই আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত অর্থে আইন বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের প্রধান যুক্তি হ'ল যে আইন বলতে যে বাধ্যবাধকতা বুঝায় আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে তা একেবারেই নেই। আইন প্রণয়ন ও তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য যদি কোন ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা না থাকে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার মত যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে কোন নিয়মকানুন আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে উপরের কোন বৈশিষ্ট্যই বর্তমান নেই। তাই আন্তর্জাতিক আইন বলে কোন আইনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে তাঁরা রাজী নন। তাঁদের মতে তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু আইনের মর্যাদা নেই।

Hall, Lawrence, Oppenheium-এর মত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে এই ধারণা গ্রহণ করতে রাজী নন। আইনের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় কি না সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমতঃ আইন বলতে কি বোঝা যায় তা পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অষ্টিন প্রমুখ অনেকে মনে করেন যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে সব বিধিনিষেধ কোন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রচিত এবং বাস্তবে প্রযোজ্য হয় তাই হল আইন। আইনের এই সংজ্ঞা যদি

স্বীকার করা যায় তবে আন্তর্জাতিক আইনকে যথার্থ আইন বলে মেনে নেওয়া চলে না। আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌম রাষ্ট্ররাই স্থির করে এবং তাদের উপরই তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব থাকে। আন্তর্জাতিক আইন রচনা ও প্রয়োগ করার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নেই। তবে অনেকে আইনের এই সংজ্ঞা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে এই সংজ্ঞা আইনের একটা অংশ সম্বন্ধে মাত্র প্রযোজ্য। প্রত্যেক দেশেই আইনের একটি অংশ কোন বিশেষ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান দ্বারা (যেমন রাজা বা পার্লামেন্ট) রচিত হয় এবং তা সাধারণতঃ লিখিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু আইনের একটি বিরাট অংশ দেশের প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। এই সব আইন কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান দ্বারা কোন বিশেষ সময়ে রচিত হয় না। কিন্তু তবুও আদালত সেই সব আইন স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রও সেই সমস্ত প্রথাগত আইনকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র স্বীকার করে বলেই যে প্রথাগত আইন প্রকৃত আইনের মর্যাদা লাভ করেছে তা ঠিক নয়। প্রথাগত আইনের ভিত্তি এত দৃঢ় যে রাষ্ট্র তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে আইন সর্বদা কোন বিশেষ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান দ্বারা রচিত হয় বলে যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে একটি সমাজে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলি বিধিনিষেধ বিভিন্ন কারণে গড়ে উঠে। মানুষের প্রয়োজনে এবং সমাজের সাধারণ সম্মতির উপর নির্ভর করেই সেই সব বাধা নিষেধগুলি সৃষ্টি হয়। সেই সব বিধি নিষেধের একটি অংশ মানুষ তার নিজস্ব বিবেকের তাগিদে মেনে চলে এবং কোন কোন বিধি নিষেধ সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক সংস্থা মানুষকে মেনে চলতে বাধ্য করে। যে সব বিধিনিষেধ একটি বাহ্যিক সংস্থা মানুষকে মেনে চলতে বাধ্য করে সেগুলিকে আমরা আইন বলি, আর যে সব বিধি নিষেধ মানুষ স্বেচ্ছায় তার বিবেকের তাগিদে মেনে চলে সেগুলিকে নীতি (morality) বলা হয়। এই ভাবে বিবেচনা করে Oppenheium আইনের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে একটি সমাজে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে সব বিধিনিষেধ সমাজের সম্মতি নিয়ে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে তাই হল আইন।[1]

1. "Law is a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power."

এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা হ'লে আইনেই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, একটি সমাজ থাকা চাই ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলি বাধা নিষেধ বা নিয়ম থাকা প্রয়োজন ; এবং তৃতীয়তঃ, সেই সব নিয়মগুলিকে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা দ্বারা প্রয়োগ করার পক্ষে সমাজের সম্মতি থাকা আবশ্যক। Oppenheium বলেন যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তবেই কোন নিয়ম বা বাধানিষেধকে আমরা আইনের মর্যাদা দিতে পারি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সব আইন প্রচলিত আছে (Municipal Law) তার অধিকাংশই লিখিত এবং তা প্রণয়ন করার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেই সব আইন যদি কেউ ভঙ্গ করে তবে বিচারের মাধ্যমে তাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য নানা ধরনের আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগে যখন আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান এবং আইনভঙ্গকারীদের বিচারের জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত সৃষ্টি হয় নি তখনও সমাজে আইন প্রচলিত ছিল। সমাজই তখন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার জন্য এবং আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত। অতএব আইন প্রণয়নের জন্য এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিচার করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠলে আইনের অস্তিত্ব থাকে না বলে যে মত প্রচলিত আছে Oppenheim তা স্বীকার করেন না। উপরে যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলি বর্তমান থাকলেই আইনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় বলে তিনি মনে করেন। এখন বিচার করা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে কিনা।

আন্তর্জাতিক সমাজ যে গড়ে উঠেছে সেই বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আজ সহজেই যাতায়াত করা এবং সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের খুব নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশের অর্থনীতি অনেক পরিমাণে অন্য দেশের অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। একটি দেশে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপস্থিত হলে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্য বা রিলিফ এসে থাকে। অতএব আন্তর্জাতিক সমাজ যে গড়ে উঠেছে তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার ফলে স্বভাবতঃই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে

কতগুলি বিশেষ নিয়মকানুন সৃষ্টি হয়। সেই সব নিয়মকানুনগুলির অধিকাংশ অলিখিত এবং ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রত্যেক দেশের আচরণই সেই সব নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেকগুলি লিখিত চুক্তিও সৃষ্টি হয়েছে। শান্তির সময় ছাড়া যুদ্ধের সময় এবং এমন কি যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারেও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে কতগুলি চুক্তি করে সেইগুলিকে কার্যতঃ মেনে নিতে রাজী হয়েছে। অতএব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও নিয়ম যে সৃষ্টি হয়েছে তাও আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপর প্রশ্ন হল: সেই সব নিয়মগুলিকে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা দ্বারা প্রয়োগ করার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমাজের সম্মতি আছে কি না? আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি যে মেনে চলা উচিত তা কোন রাষ্ট্রই অস্বীকার করে না। তবে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রয়োগ করার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই। রাষ্ট্রগুলি নিজেরাই সেই আইন বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। অবশ্য জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার এক বিশেষ ভূমিকা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর এই আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন কর্তৃত্ব এখনও স্বীকৃত হয় নি। কাগজে পত্রে যাই থাকুক না কেন রাষ্ট্রগুলি যে জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আদর্শ সর্বক্ষেত্রে পালন করছে তা কেউ মনে করে না। আন্তর্জাতিক আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা না থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন। Oppenheium বলেন যে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য বিশেষ সংস্থা না থাকাই আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান দুর্বলতা কিন্তু তিনি বলেন যে দুর্বল আইনও আইন বটে (But a weak law is nevertheless still law.")।

এই কথা কেউ অস্বীকার করে না যে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে থাকে। যুদ্ধের সময় তা প্রায়ই ঘটে। অনেক সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিক আইনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। প্রায়ই দেখা যায় যে বাস্তবে যখন কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তখনও সেই রাষ্ট্র স্পষ্ট ভাবে আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করে না। আন্তর্জাতিক আইন

অনুসারেই সে তার কার্যকে সমর্থন করতে চেষ্টা করে। Oppenheium-এর কাছে এর মূল্যও কম নয়। আবার অনেকে এই ধরনের আন্তর্জাতিক আইনকে সত্যিকারের আইনের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা

বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা নির্ণয় করতে হলে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনের (Municipal Law) সাথে আন্তর্জাতিক আইনের অনেক বিষয়েই মিল নেই। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রচলিত আইনের সাথে আইন পরিষদ, পুলিশ, আদালত, বিচার, জেল এসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক আইনের এসব কিছুই নেই। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনের মত আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্ট নয়, সেই আইনকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করার মত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা নেই, আন্তর্জাতিক আইন কোন রাষ্ট্র কর্তৃক লঙ্ঘিত হলে তার বিচার করার মত কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক আইনের এই সব দুর্বলতা মনে রেখেই বিশ্ব রাজনীতিতে তার ভূমিকা নির্ণয় করতে হবে।

শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণভাবে যে সম্পর্ক বিরাজ করে সেখানে আন্তর্জাতিক আইনের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা না থাকলেও শান্তির সময় সাধারণতঃ রাষ্ট্রসমূহ এই আইন মেনে চলে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সমস্যা সমাধান করতে না পারলেও এবং যুদ্ধের সময় বিভিন্ন ভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হলেও শান্তির সময় অসংখ্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের দ্বারা সংগঠিত আন্তর্জাতিক জগতে যে শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায় তার মূল্যও কম নয়। শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে, কারণ সেই অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইন মেনেই চলাই জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বলে প্রতীয়মান হয়। একটি রাষ্ট্র তার নিজেদের দেশে নিযুক্ত অপর রাজ্যের রাষ্ট্রদূতদের সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বিধান মেনে চলে, কারণ অন্যথায় অন্য দেশে নিযুক্ত তার নিজের রাষ্ট্রদূতরা যথোচিত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তেমনি ভাবে একটি রাষ্ট্র অন্য দেশের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি মেনে চলে, কারণ সেই চুক্তি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত না হলে তার নিজের স্বার্থই শেষ পর্যন্ত ক্ষুন্ন হয়। এই ভাবে শান্তির সময় আন্তর্জাতিক

আইন জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হওয়ায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই সাধারণতঃ তা মেনে চলে।

বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এক কঠিন সমস্যা। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সহজেই আন্তর্জাতিক অরাজকতায় পর্যবসিত হতে পারে। হেগেল, মেকিয়াভেলি প্রমুখ মনীষীদের চিন্তা সেই পথকেই সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব যাতে আন্তর্জাতিক অরাজকতায় পরিণত না হয় সেই জন্য শক্তিসাম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতির অবদান আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। প্রতিযোগিতা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এই দুই মূল নীতির উপরই শক্তিসাম্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত। তাই সহযোগিতা এবং যুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টাও আরম্ভ হয়। অনেকে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশায় বিশ্বরাষ্ট্রের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই ধরনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে বা খর্ব করে কোন রাষ্ট্রই বর্তমান যুগে সেই ধরনের কোন সংস্থায় যোগ দিতে রাজী হবে না। সেই অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা হ'ল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব শৃঙ্খলা আনয়ন করা। এই প্রচেষ্টায় আদর্শবাদ যেমন আছে, বাস্তববোধও তেমনি আছে।

আন্তর্জাতিক আইনের দুর্বলতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেই আন্তর্জাতিক আইন সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু যে সব রাষ্ট্র সেই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের পক্ষে সেই আইন প্রযোজ্য হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এমন অনেক দিক আছে (যেমন নিজের রাষ্ট্রের বিদেশীদের গ্রহণ বা immigration, অর্থনৈতিক নীতির কোন কোন বিষয়) যে সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে ঐক্যমতে পৌছান প্রায় অসম্ভব এবং সেই জন্য সেই সব বিষয়ে কোন আন্তর্জাতিক আইন গঠন করাও সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রেও এমন অনেক বিষয় আছে যে সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেশগুলির কর্তৃত্ব সমুদ্রে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকা উচিত (Maritime Belt) তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মত। অনেক রাষ্ট্রের মতে এই কর্তৃত্ব 3 মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকা বাঞ্ছনীয়, কোন কোন দেশের মতে 4 মাইল, ভারতবর্ষ,

যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের মতে ৫ মাইল, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতে 12 মাইল। এই ধরনের মতবিরোধ অনেক বিষয়েই দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় এত অস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকে যে বিভিন্ন রকমে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। অস্পষ্টতা অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে একটি প্রধান দলিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেই এই সনদ লিখিত হয়েছে। তার ফলে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনেক ধারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই অস্পষ্ট রাখা হয়। এই অস্পষ্টতা আন্তর্জাতিক আইনের একটি প্রধান দুর্বলতা। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তির ফলে সৃষ্টি হওয়ায় আন্তর্জাতিক আইন এখনও সুগঠিত নয়। কোন কোন বিষয়ে এই আইনকে সুগঠিত করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও সুসংহত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে সমস্ত দেশের দৃষ্টিভঙ্গীও অভিন্ন নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তিগুলিরই প্রাধান্য ছিল। ইউরোপের দেশগুলি একই রকমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী বলে অনেকে মনে করেন যে আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঐক্যমতে পৌছান তাদের পক্ষে সহজ ছিল। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের মূল্যও অনস্বীকার্য। এই সব দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আইন সম্বন্ধে তাদের ধারণা বিভিন্ন রকমের। অতএব বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে মতৈক্যে পৌছান অধিকতর কষ্টসাধ্য। এই ধারণা যথার্থ হলেও আধুনিক যুগে ঐক্যমতে পৌছাবার প্রধান বাধা হল রাজনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষ। কম্যুনিষ্ট শক্তি-সমূহ আন্তর্জাতিক আইন যে ভাবে ব্যাখ্যা করে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ঠিক সেই ভাবে করে না। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যও যথেষ্ট।

মনে রাখা দরকার যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত সমস্যা আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে পরিচালিত হয় না। রাজনৈতিক কারণে যে সব আন্তর্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি হয় আইনের সাহায্যে তার সমাধান সম্ভব নয়। যে সব আন্তর্জাতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে সমাধান করা সম্ভব বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্র সেই সমস্ত সমস্যাও সর্বদা আইনের মাধ্যমে সমাধান করতে

রাজী হয় না। অনেক রাষ্ট্রই বর্তমানে তার জাতীয় স্বার্থকে ন্যায়সঙ্গত আইনের বিচারের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। তা ছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক আইন এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্ট এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে নি। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা আইনগত ভিত্তি গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

আন্তর্জাতিক আইনকে কূটনীতির বিকল্প মনে করা সঙ্গত হবে না।[1] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতি এবং আইন উভয়ের ভূমিকাই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে যে সব বিরোধ সৃষ্টি হয় কূটনীতির সাহায্যেই তার সমাধান সম্ভব। যে সব বিরোধের আইনগত সমাধান সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেও কূটনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন আছে। কূটনৈতিক আলোচনার ফলেই বিভিন্ন রাষ্ট্র বিচারের মাধ্যমে তাদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে রাজী হতে পারে। অতএব কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী নয়।

অনেক বাস্তববাদী লেখক বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা সম্বন্ধে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক মতবাদ প্রকাশ করে থাকেন। আন্তর্জাতিক আইনকে যে বহু রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে উপেক্ষা করে গেছে সেই বিষয়েই তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের মত হ'ল যে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ শক্তি প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করে তাদের সমস্ত বিরোধ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে নিতে রাজী না হলে আন্তর্জাতিক আইনের কোন সক্রিয় ভূমিকা বিশ্ব রাজনীতিতে সম্ভব নয়।[2] তাঁদের এই অভিমতের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়েই এইকথা বলা যায় যে বর্তমান অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা বা তার অবমূল্যায়ন করা উচিত হবে না। একথা সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র যে বহু বিষয়ে নিয়মিত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলছে এবং এই আইনের মাধ্যমে অনেক আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করাও যে সম্ভব

1. Herbert W. Briggs লিখেছেন: "Internatioual Law is no substitute for foregin policy,"
2. Philip C. Jessup লিখেছেন: "Until the world achieves some form of international government in which a collective will takes precedence over the individual will of the sovereign state, the ultimate function of law, which is the elimination of force for the solution of human conflicts, will not be fulfilled."

হয়েছে তাও স্বীকার করে নিতে হবে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের সাথে—বিশেষ করে অন্য রাষ্ট্রের সাথে বিরোধের সময় শক্তি প্রয়োগ করার নীতির সাথে—আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধ অনস্বীকার্য। শক্তি প্রয়োগ না করে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করাই আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব খর্ব করে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে অথবা কোন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ভাবে তাদের সমস্ত বিরোধ মীমাংসা করতে রাজী হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আন্তর্জাতিক আইন যদি বাধ্যতামূলক ভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করাব জন্য প্রয়োগ করা না যায় তবে কি আন্তর্জাতিক আইনের কোন মূল্যই নেই? নানাভাবে উপেক্ষিত হয়েও আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। নিখুঁত সমাধান দিতে না পারলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে অরাজকতার হাত থেকে আন্তর্জাতিক আইনই রক্ষা করতে পারে। মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচার তাগিদেই আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। Dickinson তাঁর *Law and Peace* পুস্তকে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ধরনের মধ্যপন্থাই অবলম্বন করেছেন। ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে মানুষের চিন্তা স্বভাবতঃই জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় শক্তির দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়েছে এবং ফলে আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অনেকের দৃষ্টিতেই ক্রমাগত কমে আসছে। George Kenan, Hans Morgenthau প্রমুখ লেখকরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যাগুলিকে জাতীয় শক্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করার চেষ্টা করেছেন—আন্তর্জাতিক আইন বা নীতির মূল্য তাদের দৃষ্টিতে খুবই সামান্য। ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রকৃতি মূলতঃ রাজনৈতিক এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে বেশী সম্ভব নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই-এর বাইরে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে সেখানে আন্তর্জাতিক আইনের মূল্য একেবারে নগণ্য নয়।

আন্তর্জাতিক নীতিবোধ এবং বিশ্বজনমত

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রধানতঃ তার জাতীয় স্বার্থের উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং এই জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিজেদের শক্তি এবং কূটনীতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। জাতীয় স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতিকে প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণতঃ বিভিন্ন নৈতিক মূল্য-বোধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব নীতিকথার বিশেষ কোন মূল্য নেই। আধুনিক যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার বৈদেশিক নীতিকে শান্তি ও প্রগতির সহায়ক রূপে বর্ণনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচার করে যে তার বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপন করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নীতিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শোষিত জনগণের মুক্তির সহায়করূপে প্রচার করে থাকে। এই ধরনের প্রচারকার্য থেকে বৈদেশিক নীতিকে আলাদা করে বিচার করা প্রয়োজন—অন্যথায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত রূপ বোঝা যায় না। কিন্তু তা হ'লেও বৈদেশিক নীতি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের কোনই ভূমিকা নেই তা বলা চলে না। যাঁরা বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন তাঁরা প্রচলিত মৌলিক মূল্যগুলিকে উপেক্ষা করে চলতে পারেন না।

প্রত্যেক রাষ্ট্র—বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ—প্রতিপক্ষের তুলনায় নিজের শক্তি বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে। একটি রাষ্ট্রের শক্তি অনেক পরিমাণে তার সুদক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আধুনিক যুগে সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্রই প্রতিপক্ষের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করত যে মাও-সে-তুং-এর মৃত্যুর পরে চীনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যা সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু তার জন্য চীনের রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা সোভিয়েত রাশিয়া গ্রহণ করতে পারে না। অতীতে এই ধরনের হত্যার চেষ্টা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত ছিল না। 1415 খৃষ্টাব্দ থেকে 1525 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভেনিস রিপাবলিক তার বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনে প্রায় দুই শতটি হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে এই ধরনের হত্যার চেষ্টা বিরল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব এখানে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। অন্য রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা

করার চেষ্টা দূর হওয়ার পিছনে পারস্পরিক স্বার্থই বিশেষভাবে জড়িত। হত্যার রাজনীতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে কোন রাজনৈতিক নেতার জীবনই নিরাপদ থাকবে না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসায় হত্যার রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে একেবারে অপ্রচলিত তা মনে করার কোন কারণ নেই। কয়েক বৎসর পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দমন করার জন্য যে ব্যাপক হত্যালীলা সংঘটিত হয় তার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

যুদ্ধের সময় অসামরিক ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার জন্য এবং যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধে আহত অথবা অসুস্থ সৈন্যরা যাতে প্রতিপক্ষের হাতে মানবিক ব্যবহার পায় তার জন্য আধুনিক যুগে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও আন্তর্জাতিক নীতিবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে যুদ্ধের সময় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সামরিক বে-সামরিক সমস্ত মানুষকেই শত্রু বলে বিবেচনা করত এবং তাদের হত্যা করার অথবা ক্রীতদাসে পরিণত করার নীতি প্রচলিত ছিল। আইনের দৃষ্টিতে বা তৎকালীন নীতির বিচারে এই ধরনের কাজ নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই আচরণের পরিবর্তন ঘটেছে। 1899 এবং 1907 সালের হেগ কনভেনশন এবং 1864, 1906, 1929, 1949 খৃষ্টাব্দের জেনেভা কনভেনশন দ্বারা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের আচরণকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস বা বীজাণু ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণকে হত্যা করার চেষ্টা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাণিজ্য জাহাজের বিরুদ্ধে সাবমেরিনের আক্রমণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যও বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছে। নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং তা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি যুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করার চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে। মানব সভ্যতাকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সৃষ্টি করা হয়। এই ধরণের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের নীতিবোধের প্রভাব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। এই কথা সত্য যে যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে থাকে, কিন্তু তার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের নীতিবোধের সক্রিয় ভূমিকাকে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। অতীতে যে ভাবে যুদ্ধযাত্রা বা

যুদ্ধবিজয়কে জাতীয় গৌরব বলে মনে করা হত আজ আর তা হয় না। যুদ্ধ অনেক সময় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হলেও গৌরবের কাজ বলে কোন রাষ্ট্র প্রচার করে না। যুদ্ধ সম্বন্ধে অতীত ও বর্তমান কালের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয় এবং মানুষের উন্নত নীতিবোধের জন্যই এই পার্থক্য সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ভূমিকা লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে যুদ্ধের সময়ও মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেওয়া আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য নয়।

অতীতে যুদ্ধের সময় শত্রুরাষ্ট্রের সামরিক ও বে-সামরিক লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের (1618—1648) পর থেকে সাধারণতঃ এই পার্থক্য করার রীতি আরম্ভ হয়। তখন থেকে যুদ্ধকে দুইটি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা শুরু হয় এবং তার ফলেই বে-সামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নানাবিধ চেষ্টা আরম্ভ হল। কিন্তু আধুনিক যুগের যুদ্ধে সামরিক বাহিনী ও বে-সামরিক নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সৈন্যবাহিনী যে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে তা দেশের বিভিন্ন কারখানার প্রস্তুত হয়। সেই সব অস্ত্র নাগরিক স্থলপথে, জলপথে বা আকাশপথে সেনাবাহিনীর কাছে সরবরাহ করে থাকে। সেনাবাহিনীর রসদ, পোষাক ইত্যাদি প্রস্তুত, সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্য নাগরিকেরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। যুদ্ধের সময় দেশের মনোবল রক্ষা করার জন্য অনেক নাগরিক বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত থাকে। তাই আধুনিক যুদ্ধকে Total war বলা হয়ে থাকে এবং সেখানে সামরিক বাহিনী ও বে-সামরিক নাগরিকের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা প্রায় অসম্ভব। সেনাবাহিনীর সাথে নাগরিকরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এমন যুক্ত থাকে যে যুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্র শত্রুপক্ষের নাগরিকদের কার্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। বর্তমান যুগে একটি রাষ্ট্র শত্রুপক্ষের কলকারখানা, রাস্তাঘাট, রেডিও ষ্টেশন ইত্যাদি ধ্বংস করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করে। সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে আধুনিক যুগে একটি দেশের সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করা হয় এবং অধিকাংশ নাগরিকই সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেকে নানা ভাবে যুক্ত করতে চেষ্টা করে। যুদ্ধের ফলাফলের উপর সমস্ত নাগরিকের ভাগ্য নির্ভর করে এবং তাই যুদ্ধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা নাগরিকদের অপরাধ বলেই গণ্য হয়। জাতীয়তা-

বাদের যুগে যুদ্ধকে কেবলমাত্র সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমিত রাখা কঠিন। তা ছাড়া যুদ্ধের সঙ্গে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ ইত্যাদির মত কোন রাজনৈতিক আদর্শ যখন যুক্ত থাকে তখন সেই যুদ্ধ স্বভাবতঃই সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। রাজনৈতিক আদর্শবাদ বা ideology অনেক ক্ষেত্রে নীতিবোধের পরিপন্থী হিসেবে কাজ করে। গত বিশ্বযুদ্ধকে যারা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করতেন তারা কেবলমাত্র জার্মানী বা ইতালীর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি—সমস্ত ফ্যাসীবাদ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন। সেখানে সামরিক বাহিনী ও বে-সামরিক নাগরিকদের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব হয় নি। রাজনৈতিক মতবাদ বা ideologyর ভিত্তিতে যদি কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে সেখানে প্রতিপক্ষের অনেক বে-সামরিকর নাগরিকও অন্ততঃ আদর্শগত ভাবে শত্রু বিবেচিত হবে। এমন অবস্থায় নীতিবোধের প্রভাব স্বভাবতঃই হ্রাস পায়।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাবে আন্তর্জাতিক নীতিবোধের ভিত্তি অন্য ভাবেও অনেকাংশে শিথিল হয়েছে বলে মনে হয়। এইকথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একজন ব্যক্তি মানুষের পক্ষেই নীতিবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব। ব্যক্তি যখন কোন সমষ্টিগত সত্তা (Collective Abstraction)-র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তখন তাকে তার ব্যক্তিগত নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থের জন্য প্রচলিত প্রথা অনুসারে কাজ করতে হয়। পূর্বে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন দেশের বৈদেশিক নীতির দোষগুণের জন্য রাজা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী ছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু সংখ্যক নাগরিক রাজাকে মন্ত্রী বা পরামর্শদাতা রূপে সাহায্য করতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হতেন এবং তাদের জাতিগত পরিচয় তেমন প্রকট ছিল না। তখন ফরাসী দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে প্রাশিয়ার রাজার অধীনে সামরিক বাহিনীতে বা কূটনৈতিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আবার প্রাশিয়া বা জার্মানীর অনেকে রুশ সম্রাটের অধীনে এই ভাবে কাজ করতেন। অনেক সময় তাঁরা এক রাজার অধীনে চাকুরী ছেড়ে অন্য রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এই ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। রুশ সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার 1815 খৃষ্টাব্দে যখন ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদান করেন তখন বৈদেশিক ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য যে সব

পরামর্শদাতা তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন জার্মানীর লোক, একজন গ্রীস দেশের, একজন কর্সিকার, একজন সুইজারল্যাণ্ডের এবং মাত্র একজন রাশিয়ার অধিবাসী। সেই যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অভিজাত পরিবারগুলির একটি আন্তর্জাতিক পটভূমি ছিল এবং অর্থের জন্য অথবা প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইউরোপের যে কোন দেশের রাজার অধীনে চাকুরী নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। দেশের জনসাধারণের কাছে তাঁদের কোন দায়িত্ব ছিল না। তাঁদের আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজার কাছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের মূল্য ছিল অপরিসীম এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিতরই নীতিবোধের সক্রিয় ভূমিকা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রসারের ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রথা অচল হয়ে পড়ে। তখন আর কোন ফরাসী দেশের নাগরিকের পক্ষে জার্মান বা অন্য কোন দেশের রাজার অধীনে কোন রাষ্ট্রদূতের বা সেই জাতীয় অন্য কোন কাজ করার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ দেশের জনসাধারণের কাছে দায়ী হয়ে পড়েন এবং জনমতের পরিবতনের সাথে মন্ত্রীদের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। মন্ত্রীরা যখন ক্যাবিনেট বা পার্লামেণ্ট অথবা দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁদের পক্ষে আর ব্যক্তিগত নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা রইল না। সর্বজনীন নীতিবোধ যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তখন সেই নীতিবোধকে বিসর্জন দেওয়াই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতির প্রতি আনুগত্য আধুনিক যুগের নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক জাতিই মনে করে যে তার নীতি সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হবে। জাতীয়তাবাদের যুগে জাতির উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় যে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ অবাস্তব বলেই মনে হয়।

তবে বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক নীতিবোধের ভূমিকা কি? বর্তমান যুগ কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের যুগ নয়, এই যুগ আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগও বটে। জাতিসংঘ, ব্রিয়াঁ-কেলগ চুক্তি, আন্তর্জাতিক আদালত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—এসবই আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মূর্ত প্রতীক। বিশ্ব জনমত বা World Public Opinion-কেই এই আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও সহযোগিতার ভিত্তি

বলা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব সরকারের নীতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একই ধরণের মত পোষণ করে তবে তাকে আমরা বিশ্বজনমত বলতে পারি।[1] বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত, সংবাদ আদান প্রদান এবং ব্যবসায় বাণিজ্য করা আজকাল খুবই সহজ। তার ফলে মোটামুটি ভাবে বর্তমানে এক আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খাও প্রায় একই রকমের। সব দেশের মানুষই শান্তি, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি কামনা করে। এই সবের ভিত্তিতে বিশ্ব-জনমত গড়ে উঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রচলিত জাতীয়তাবাদ এবং মতাদর্শের সংঘাত (Conflict of ideologies) এই বিশ্বজনমত গড়ে উঠার পথে প্রধান অন্তরায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করা সহজ হলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করা মোটেই সম্ভব নয়। পূর্বে এই ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাছাড়া আধুনিক যুগে সরকারের পক্ষে প্রচার যন্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে নিজের দেশের জনমত নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ। বিদেশের সংবাদপত্র, বইপুস্তক বাজেয়াপ্ত করে অনেক সময় সরকার অন্য দেশের মতামত সম্বন্ধে নিজের দেশের নাগরিককে অজ্ঞ করে রাখার চেষ্টা করে। তার ফলে বিশ্বজনমত গড়ে উঠার সুযোগ পায় না। মতবাদের সংঘাতও সেই ভাবে বিশ্বজনমত সৃষ্টির পথে একটি প্রধান বাধা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই শান্তি, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা কামনা করে, কিন্তু তা লাভ করার উপায় সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতের কোন ঐক্য নেই এবং এমন কি বিভিন্ন মতা-বলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা সহনশীলতার ভাবও নেই। কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাস করে যে কম্যুনিজমের পথই শান্তি, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা লাভ করার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ এবং পুঁজিবাদী সমাজে এই সব আদর্শ লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। অপর পক্ষে পুঁজিবাদীদের সমর্থকরা প্রচার করে যে একমাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতেই স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক শান্তি সম্ভব। ফ্যাসিষ্টদের অন্য রকম ধারণা ছিল। এ ছাড়া আরও যে সব মতবাদ

1. Morgenthau-এর ভাষায় "World public opinion is obviously a public opinion that transcends national boundaries and that unites members of different nations in a consensus with regard to at least certain fundamental international issuees."

বা ideology আছে তারাও প্রায় অনেকটা ধর্মীয় গোঁড়ামী নিয়েই নিজের মতবাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে। জাতীয়তাবাদ এবং মতবাদের গোঁড়ামির ফলে মানুষের পক্ষে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে এবং ফলে বিশ্বজনমত সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারছে না। এইকথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক সমস্যার বিচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সকলেই যে তার নিজের দেশের সরকারের সব নীতি সমর্থন করে তা ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে ভিয়েৎনাম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে তাদের সরকারের নীতিকে সমর্থন করতে পারে নি। মোটামুটি ভাবে এই কথা বলা চলে যে ভিয়েৎনামের এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছিল। তবে বিশ্বজনমত যদি মোটামুটিভাবে গড়েও উঠে তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়।

6. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (জাতিসংঘ গঠিত হওয়া পর্যন্ত)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সংস্থার এক বিশেষ ভূমিকা বিংশ শতাব্দীতেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে স্থায়ী ভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়। সেই চেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হয় জাতিসংঘ বা League of Nations। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organization) জাতিসংঘের স্থান গ্রহণ করে। বিশেষ ধরনের কাজের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে যুক্ত হয়ে আছে কয়েকটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিপুঞ্জের বাইরেও Organization of American States, North Atlantic Treaty Organization প্রমুখ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস, আন্তর্জাতিক রোটারি, আন্তর্জাতিক বণিক সংস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে সীভার ও হেভিল্যাণ্ড (Daniel S. Cheever and H. Field Haviland) তাঁদের *Organizing for Peace : International Organization in World Affaris* বইতে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা লিখেছেন : "In the briefest form possible, it can be defined as any co-operative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities." এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা সৃষ্টি করে। বে-সরকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী বিশেষ ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক

আন্তর্জাতিক সংস্থা তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ এমন কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করে যা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রয়োজন মত সম্মেলনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং স্থায়ী কর্মচারীরা সেই সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এই অর্থে জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেই প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা যায়, কিন্তু এই ধরনের সংস্থা মানুষ হঠাৎ গড়ে তুলতে পারে নি। বহু শতাব্দীর প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলেই বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সুদূর অতীত যুগ থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে নানাধরনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে আসছে—বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সংস্থা সেই চেষ্টারই ফলশ্রুতি। অতীতে যে উদ্দেশ্যে চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করত আজও সেই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করেছে। একজন লেখক যথার্থই বলেছেন : "The treaties of the past are the first steps toward international organization."[1] আন্তর্জাতিক আইন গড়ে উঠার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করা সহজতর হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পরস্পরের পরিপূরক।

যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রাচীন গ্রীস কতগুলি ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং নগর রাষ্ট্রের উর্ধ্বে সারা গ্রীসব্যাপী কোন রাজনৈতিক সংস্থার উপর গ্রীকদের কোন আনুগত্য ছিল না। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার সময় গ্রীকরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করলেও সব সময় সেই চেষ্টা সার্থক হয় নি। পারস্যের সাথে সংগ্রামের সময় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ম্যারাথন ও থার্মোপালী যুদ্ধে পারস্যকে পরাজিত করে। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ 334 খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। পরে রোমানরা সমস্ত গ্রীসে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। গ্রীসের নগর রাষ্ট্র সমূহ স্বেচ্ছায় একত্র হয়ে কোন

1. Mangone, *A Short History of International Organization.*

বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেও বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভাবে তারা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি বিষয় পরিচালনার জন্য তারা নানাবিধ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। স্থায়ী ভাবে অন্য নগর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার কোন প্রথার উদ্ভব না হলেও প্রয়োজন দেখা দিলেই বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিয়োগ করত। কনসাল নিয়োগের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল এবং রাষ্ট্রদূত ও কনসালদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হত। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য নানাবিধ উপায়ও তারা গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার ইতিহাসে রোমানদের অবদান অন্য ধরনের। রোমানরা পশ্চিম ইউরোপ (ইংলণ্ডসহ), উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে। এই সাম্রাজ্যের বাইরে কোন সভ্য দেশ আছে বলে রোমানরা বিশ্বাস করত না এবং রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে সর্বদা গোলযোগ লেগে থাকলেও সেই সাম্রাজ্যের নিকটে অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সুখসুবিধার অধিকারী না হলেও জীবনের নিরাপত্তা সম্পত্তির নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানাবিধ আইন, প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে সাধারণ সূত্রগুলি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে রোমানরা তাদের সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্য এক নতুন আইন প্রণয়ন করে। এই আইন jus gentium নামে পরিচিত। বিরাট সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী যুগে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই jus gentium বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের যে সমস্যা আধুনিক যুগে দেখা দিয়েছে সেই বিষয়ে রোমান ইতিহাস থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের বিশেষ কিছু শিক্ষা নেওয়ার না থাকলেও নানাবিধ ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে রোমান সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা আধুনিক যুগের সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করতে পারে।

জার্মানী হতে আগত বিভিন্ন বর্বর উপজাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে ইউরোপে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হয়। এই প্রথার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বজনীন মনোভাব এবং বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে ঐক্যবোধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তখন রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠে। কিন্তু সেই যুগেও খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান চার্চ ইউরোপে সর্বজনীন মনোভাব ও ঐক্যবোধের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। জার্মানীর উপজাতিসমূহ রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করলেও তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং খৃষ্টান চার্চই তখন আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। বে-সরকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে খৃষ্টান চার্চের সমতুল্য কোন প্রতিষ্ঠান আজও গড়ে উঠে নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে Holy Roman Emperor সেই যুগে ইউরোপে সর্বজনীন ঐক্যবোধকে কিছু পরিমাণে জাগিয়ে তোলে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পোপের উপর আনুগত্য এবং পার্থিব ক্ষেত্রে Holy Roman Emperorএর উপর আনুগত্য সামন্ত যুগেও আন্তর্জাতিক আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন শাসকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য তখন পোপের কর্তৃত্ব অনেকে স্বীকার করে নিত।

মধ্য যুগের শেষার্ধে বিভিন্ন কারণে সামন্ত প্রথার অবসান ঘটে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আধুনিক যুগের জাতীয় রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট আন্দোলন এই জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির পথকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। এই জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার ফলে পোপ এবং Holy Roman Emperor-এর ক্ষমতা এবং মর্যাদা বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট শেষ পর্যন্ত হোলি রোমান সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে তাকে বিতাড়িত করেন। জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যাপারে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবী করে এবং মেকিয়াভেলী (Machiavelliর বিখ্যাত বই *The Prince* 1513 খৃষ্টাব্দে লিখিত), Jean Bodin (Bodinএর বিখ্যাত বই *De Republica* 1576 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত), টমাস হবস্ (Hobbesএর পুস্তক *Leviathan* 1651 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সার্বভৌমত্বের দাবীকে পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকলেও অনেক দেশেই নিয়মতান্ত্রিক এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সেই ভাবে বৈদেশিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে রাষ্ট্রসমূহ কি ভাবে আন্তর্জাতিক

আইন মেনে চলতে পারে সেই বিষয়ে Grotius প্রমুখ অনেকে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। ইউরোপে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের (1618-1648) সময় Grotius 1625 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশ করেন।

ত্রিশ বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের পর 1648 খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফালিয়া চুক্তি (Treaty of Westphalia) স্বাক্ষরিত হয়। এই ওয়েষ্টফালিয়া চুক্তিতে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত না হলেও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তনের ইতিহাসে এই চুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সেখানে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এক নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থার ইতিহাসে এই চুক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Mangone বলেন: "Of the greatest importance to international organization, however, were the gathering of hundreds of envoys in a diplomatic conference which represented practically every political interest in Europe and the achievement by negotiations, rather than by dictation, of two great multilateral treaties which legalized the new order of European international relations."[1] পরবর্তীকালে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে একত্র হয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। সম্মেলনে একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার চেষ্টার মধ্যেই আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্ভব নিহিত আছে। তা ছাড়া সেই সময় পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে অনেকে নানাধরনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। 1623 খৃষ্টাব্দে ফরাসীর Emeric Cruce সমস্ত স্বাধীন দেশের সহযোগিতায় একটি বিশ্ব সংস্থা স্থাপন করার পরিকল্পনা তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Le Nouveau Cynee*-তে প্রকাশ করেন। সেই সময় ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী এবং তাঁর মন্ত্রী Duce de Sully ইউরোপের খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি বৃহৎ সংস্থা স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবে সমস্ত

1. Mangone, *A Short History of International Organization*,

আন্তর্জাতিক বিরোধ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করার কথা এবং সমস্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতায় গঠিত একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী দ্বারা প্রয়োজন হ'লে সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার কথা বলা হয়। Willam Penn 1693 খৃষ্টাব্দে *Eassy Toward the Present and Future Peace of Europe* পুস্তকে ইউরোপে একটি পার্লামেণ্ট স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ এই পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা মীমাংসিত হবে এবং কোন রাষ্ট্র যদি এই সিদ্ধান্ত অমান্য করে তবে অন্যান্য সমস্ত দেশ শক্তি প্রয়োগ করে সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে। এই পরিকল্পনা আরও বিস্তৃতভাবে 1712 খৃষ্টাব্দে Abbe de Saint-Pierre তাঁর *Project to Bring Perpetual Peace in Europe* নামক পুস্তকে ব্যাখ্যা করেন এবং পরে 1761 খৃষ্টাব্দে রুশো তাঁর আদর্শ অনুযায়ী এই পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 1793 খৃষ্টাব্দে Jeremy Bentham তাঁর *Principles of International Law* নামক পুস্তকে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন যে কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা না করে আমাদের আন্তর্জাতিক স্বার্থের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। সমষ্টিগত নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদের অবসান ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। তিনি এমন একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাও চিন্তা করেছিলেন যা শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে প্রতিহত করে নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী রূপ দিতে সক্ষম হবে। এই বিষয়ে জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতবাদ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। 1795 খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় এই বিষয়ে তিনি যে পুস্তক প্রকাশ করেন তা ইংরেজীতে *Toward Perpetual Peace* নামে পরিচিত। বিশ্বশান্তির জন্য প্রত্যেক দেশে আইনের শাসন এবং গণতন্ত্র স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তিনি একটি আন্তর্জাতিক ফেডারেশন স্থাপন করার পরিকল্পনাও করেছিলেন।

এই সব পরিকল্পনা থেকে এটা স্পষ্টই মনে হয় যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তখন অনেকেই উপলব্ধি করেন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর পরাজয়ের পর 1815 খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে এই ধরনের কল্পনাকে

একটা বাস্তব ও আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়। রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার Holy Alliance নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং সেই পরিকল্পনা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্রাট সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। Holy Alliance-এর পরিকল্পনা সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও বাস্তবমুখী ছিল না। সেখানে বলা হয় যে ইউরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ খৃষ্টধর্মের নীতি অনুসরণ করে রাজ্য পরিচালনা করবেন এবং প্রত্যেক দেশের নৃপতিগণ পরস্পারের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রেখে চলবেন। ইংলণ্ডের সম্রাট এবং তুরস্কের সুলতান ব্যতীত ইউরোপের সকল দেশের রাজাই এই Holy Alliance-এ যোগদান করেন কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে এই সংঘের কোন মুল্যই ছিল না। Holy Alliance ছাড়া এই সময়ে ইউরোপে আরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যা Concert of Europe নামে পরিচিত। 1815 খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড, ইউরোপের এই চারটি প্রধান শক্তি নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে (Quadruple Alliance) এই Concert of Europe স্থাপন করে। এই চুক্তি ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং সংশ্লিষ্ট চারটি রাষ্ট্র স্থির করে যে প্রয়োজন হ'লেই তাদের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। পরে ফ্রান্সকেও এই Concert of Europe-এ গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী চারটি প্রধান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না তবুও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তনের ইতিহাসে এই Concert of Europe-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই প্রথম বৃহৎ শক্তিগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা। নিয়মিতভাবে সম্মেলনে মিলিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে বৃহৎ শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে তা সমাধান করার যে প্রয়াস Concert of Europe এ দেখা যায় তারই উন্নততর রূপ আমরা জাতিসংঘ (League of Nations) এবং পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (United Nations) দেখতে পাই। Quadruple Alliance-এর ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে Concert of Europe সৃষ্টি হয় তা কয়েক বৎসরের মধ্যে ভেঙ্গে গেলেও বৃহৎ শক্তিগুলির নেতৃত্বে সম্মেলন ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার যে ঐতিহ্য ইউরোপে

গড়ে উঠে তা বহু বৎসর পর্যন্ত বর্তমান ছিল। বল্কান অঞ্চলে তুরস্কের সমস্যা সমাধানের জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি কয়েকবার মিলিত হয়ে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে। 1878 খৃষ্টাব্দের বার্লিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও ছিল বল্কান অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করা। 1906 খৃষ্টাব্দে আলজেসিরাস সম্মেলনে (Algeciras Conference) মরোক্কোর সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা হয়। 1912-13 খৃষ্টাব্দের লণ্ডন সম্মেলনে বল্কান যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠে। রাইন নদীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ যাতে সুবিধামত ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভিয়েনা সম্মেলনে Rhine Commission স্থাপিত হয়। পরে 1856 খৃষ্টাব্দে দানিয়ুব নদীর জন্য অনুরূপ কমিশন গঠন করা হয়। সংবাদ আদান প্রদান, ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানাধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠে। International Bureau of Telegraphic Administrations (1868), Universal Postal Union (1875), International Bureau of Weights and Measures (1875), International Copyright Union (1886), International Office of Public Health (1903), International Institute of Agriculture (1905) ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠলেও কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠা সম্ভব হয় নি। অনেক দেশে এই জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে। বিংশ শতাব্দীতে বৃহৎ শক্তিগুলির পরস্পরবিরোধী নীতির ফলে ইউরোপ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং 1914 খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নতুন ভিত্তিতে এবং বৃহত্তর পটভূমিতে জাতিসংঘ বা League of Nations নামে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হ'ল।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতস্পৃহ এবং শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। তার ফলেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে League of Nations বা জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দদফা (Fourteen Points)-র শেষ শর্তটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার কথা উল্লিখিত ছিল। এই শর্তটির উপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ গড়ে উঠে।

জাতিসংঘ গঠনের জন্য যে কভেনাণ্ট (covenant) বা চুক্তিপত্র রচিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য জাতিসংঘের সদস্যরা অঙ্গীকার করে যে তারা যুদ্ধের পথ পরিহার করে পরস্পরের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে সমস্ত গোপনীয়তা বর্জন করে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সমস্ত শর্ত সঠিক ভাবে মেনে চলবে। এই চুক্তিপত্রে মোট 26টি ধারা সন্নিবেশিত ছিল এবং প্যারিস সম্মেলনে যে সব শান্তিচুক্তি রচিত হয় তার প্রত্যেকটিতে এই 26টি ধারা সন্নিবিষ্ট ছিল। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদানকারী এবং আমন্ত্রিত রাষ্ট্রসমূহ (তাদের নাম চুক্তিপত্রের সাথে পৃথক ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল) জাতিসংঘের মূল সদস্য হিসেবে গৃহীত হয়। এই চুক্তিপত্র কার্যকারী হওয়ার পর 2 মাসের মধ্যে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রসমূহকে এই সংস্থায় শর্তহীন ভাবে যোগদান করার ইচ্ছা ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। এ ছাড়া যে কোন রাষ্ট্র, 'ডমিনিয়ন' বা 'কলোনি' জাতিসংঘের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারত।

জাতিসংঘের গঠন পদ্ধতি

একটি সাধারণ সভা (Assembly) এবং কাউন্সিল (Council) নিয়ে জাতিসংঘ গঠন করা হয়। তা ছাড়া ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের (ম্যাণ্ডেট-এর অর্থ পরে

ব্যাখ্যা করা হয়েছে) শাসনকার্য তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন এবং Permanent Court of International Justice নামে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করা হয়েছিল। জাতিসংঘের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে একজন মহাসচিব (Secretary General)-এর পরিচালনায় জাতিসংঘের দপ্তর (Secretariat) সৃষ্টি করা হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠনপদ্ধতি ও কার্যাবলী নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

সাধারণ সভা

জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত হয়। এই সভায় প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অনধিক তিনজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করে ভোট ছিল। জেনেভাতে প্রতি বৎসর এই সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা হ'ত।

সাধারণ সভায় বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 5ম ধারায় বলা হয়েছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্য কোন উপায়ের কথা যদি বিশেষভাবে লিখিত না থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে সব বিষয়ে অন্যভাবে সাধারণ সভার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল তার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি হ'ল: দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণ, সাধারণ সংখ্যাধিক্যে কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, মহাসচিবকে নিয়োগ এবং পদ্ধতিগত (procedural matters) প্রশ্নের সমাধান। তাছাড়া চুক্তিপত্রের 15 নং ধারায় 10 নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ কাউন্সিল কর্তৃক সাধারণ সভার কাছে প্রেরিত হয় তবে সেই বিরোধ সম্বন্ধে সাধারণ সভা কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য-সহ অধিকাংশ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যদি কোন সদস্যরাষ্ট্র অনুপস্থিত অথবা ভোটদানে বিরত থাকত তবে তা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট বলে গণ্য হ'ত না।

সাধারণ সভার কাজ পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি এবং 15জন সহ-সভাপতিকে নিযুক্ত করা হ'ত। এই সভায় নিম্নলিখিত 7টি বিষয়ের জন্য 7টি প্রধান কমিটি নিযুক্ত ছিল—(1) শাসনতন্ত্র ও আইনসংক্রান্ত বিষয়, (2) জাতি-

সংঘের সাথে যুক্ত বিভিন্ন 'টেকনিক্যাল' (technical) প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়, (3) অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস, (4) প্রশাসন এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়, (5) সামাজিক এবং মানবকল্যাণ সংক্রান্ত (humanitarian) বিভিন্ন বিষয়, (6) রাজনৈতিক বিষয় এবং (7) স্বাস্থ্য, আফিন সমস্যা, বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সহযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। এই সব কমিটির চেয়ারম্যানদের সাধারণ সভার সহ-সভাপতি রূপে গ্রহণ করা হত এবং অবশিষ্ট 8 জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতেন।

জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে বিশ্বশান্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাধারণ সভায় আলোচনা হ'ত। জাতিসংঘের বাজেট নিয়ন্ত্রণ করা, নতুন সদস্য গ্রহণ করা, কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করা, স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা— এই সব ছিল সাধারণ সভার প্রধান দায়িত্ব।

কাউন্সিল

জাতিসংঘের কাউন্সিলকে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী পরিষদ বলে ধরা যেতে পারে। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 4নং ধারায় বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপানের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের মধ্য থেকে চারটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হবে। এই চারটি দেশ জাতিসংঘের সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত হবে। সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম দিকে বেলজিয়াম, ব্রাজিল, গ্রীস ও স্পেনকে কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল (জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 4নং ধারার 1 অনুচ্ছেদ)। সাধারণ সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে কাউন্সিলকে তার নিজের সদস্য সংখ্যার পরিবর্তন করার অধিকারও দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য না হওয়ার ফলে কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা 4-এ পরিণত হয়। অতএব প্রথম দিকে 8 জন সদস্য নিয়ে কাউন্সিলের কাজ আরম্ভ হয়—4 জন স্থায়ী সদস্য, 4 জন অস্থায়ী। 1922 খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা 6 করা হয়। 1926 খৃষ্টাব্দে জার্মানী যখন জাতিসংঘে প্রবেশ করে তখন তাকে কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা হল এবং অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে 9 করা হয়। 1933 খৃষ্টাব্দে জাপান ও জার্মানী জাতিসংঘের সদস্যপদ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত

জানিয়ে নোটিশ দেয় এবং ফলে কাউন্সিলে মাত্র তিনটি রাষ্ট্রের সদস্য স্থায়ী সদস্য রূপে বর্তমান থাকে। 1934 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হ'ল। কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা তখন দাঁড়ালো 4 জনে। কিন্তু 1937 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ইতালী জাতিসংঘ পরিত্যাগ করায় স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা আবার 3 হয়। ইতিমধ্যে কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে 11 করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ছিল 3—বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন —এবং অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা 11। কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচনের সময় এত তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে যে প্রধানতঃ সেই কারণেই কাউন্সিলে অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হয়। পোল্যাণ্ড, স্পেন প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্রকে কাউন্সিলে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হ'ল এবং তার ফলে তারা কাউন্সিলে কার্যতঃ প্রায় স্থায়ী আসনই লাভ করতে সমর্থ হয়।

এই সব স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য ছাড়াও বিশেষ অবস্থায় কাউন্সিলের অধিবেশনে জাতিসংঘের অন্য সদস্য রাষ্ট্রকেও আহ্বান করার ব্যবস্থা ছিল। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে যে কাউন্সিলের কোন আলোচনার সাথে কোন সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থ যদি বিশেষভাবে জড়িত থাকে তবে কাউন্সিলের সদস্য না হ'লেও সেই রাষ্ট্রকে কাউন্সিলের সেই আলোচনায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হবে (চুক্তিপত্রের 4নং ধারা, পঞ্চম অনুচ্ছেদ)।

কাউন্সিলের সদস্যরাষ্ট্ররা সেখানে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট ছিল।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ("on questions of substance") সাধারণ সভার মত কাউন্সিলও কেবলমাত্র সর্বসম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। তবে পদ্ধতিগত প্রশ্নে ("all matters of procedure") সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল। কোন বিশেষ সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য যদি কোন কমিটি গঠনের প্রয়োজন মনে করা হ'ত তবে সেই ব্যাপারেও সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিয়ম ছিল (চুক্তিপত্রের 5নং ধারা)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দুইটি সদস্যরাষ্ট্রের কোন বিবাদ যখন কাউন্সিল সমাধান করার চেষ্টা করত তখন বিবদমান রাষ্ট্রগুলির

কোন ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না (চুক্তিপত্রের 15 নং ধারা)। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 11 নং ধারা অনুযায়ী কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘকে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা সর্বসম্মতিক্রমেই নিতে হ'ত।

জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 4 নং ধারায় বলা হয়েছে যে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবে বৎসরে অন্ততঃ একবার অধিবেশন আহ্বান করতেই হবে। কার্যতঃ প্রথম দিকে কাউন্সিলের অধিবেশন বৎসরে 4 বার করে আহ্বান করা হ'ত এবং 1929 খৃষ্টাব্দের পর থেকে বৎসরে তিনবার করে। কাউন্সিলের অধিকাংশ অধিবেশনই জেনেভায় আহ্বান করা হয়, তবে অন্যান্য স্থানেও—যেমন প্যারিস, লণ্ডন, ব্রাসেল্‌স্‌, মাদ্রিদ প্রভৃতিতে—কাউন্সিলের অধিবেশন সংঘটিত হয়েছে।

কাউন্সিল ও সাধারণ সভার কাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় নি, তবে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র কাউন্সিলকে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এইরকম ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা কাউন্সিলের একটি বিশেষ কর্তব্য বলে বিবেচিত হ'ত। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সদস্যরাষ্ট্রদের রক্ষা করা, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল। জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেট নীতি অনুযায়ী যে সব রাষ্ট্র অন্য দেশ শাসন করার অধিকার লাভ করেছিল তারা যে সব বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করত তা পর্যালোচনা করাও কাউন্সিলের একটি অন্যতম কাজ ছিল।

ম্যাণ্ডেট এবং ম্যাণ্ডেট কমিশন

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানী তার সমস্ত সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তুরস্কও আরবভূমিতে তার সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হ'ল। জার্মানী ও তুরস্কের এই সব রাজ্য কোন বিশেষ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে না রেখে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কয়েকটি রাষ্ট্রকে বিশেষ শর্ত অনুযায়ী এই সব রাজ্য শাসন করার

অধিকার দেওয়া হ'ল। যে সকল রাষ্ট্র এই ভাবে সেই সব রাজ্য শাসন করার অধিকার লাভ করে তারা Mandatory রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবং যে সব লিখিত শর্ত অনুযায়ী তারা সেই সব অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করতে রাজী হয় তা mandate নামে পরিচিত হ'ল। জাতিসংঘের সাথে প্রত্যেক mandatory রাষ্ট্রের সেই সব রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে mandate স্বাক্ষর করতে হয়।

যে সব অঞ্চলে এই ম্যাণ্ডেট নীতি প্রচলিত হয় সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা সমানভাবে উন্নত না থাকায় বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই জন্য ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলিকে A, B, C এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তুরস্কের অধীনস্থ আরব দেশগুলিকে A শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তার মধ্যে ইরাক এবং প্যালেষ্টাইন ও ট্রানস্‌জোর্ডান ইংলণ্ডকে এবং সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সকে ম্যাণ্ডেট হিসেবে দেওয়া হ'ল। এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 22 নং ধারায় বলা হয় যে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রের সাহায্য ও পরামর্শে এই সব অঞ্চল শীঘ্রই স্বাধীন ভাবে কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। ম্যাণ্ডেট শাসনের অধীনে ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপন করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় (Balfour Declaration) তার ফলে এই অঞ্চলে নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়। মধ্য আফ্রিকার অঞ্চলগুলিকে B শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্যামারুনের এক অংশ টোগোল্যাণ্ডের এক অংশ এবং ট্যাঙ্গানিকা ইংলণ্ডকে, ক্যামারুন ও টোগোল্যাণ্ডের বাকী অংশ ফ্রান্সকে, এবং রুয়ান্দা উরুন্দি (Ruanda Urundi) বেলজিয়ামকে ম্যাণ্ডেট হিসেবে দেওয়া হ'ল। এই সব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশী অনুন্নত থাকায় ম্যাণ্ডেট শাসকের অধিকতর কর্তৃত্ব প্রয়োজন ছিল। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে যে এই সব অঞ্চল শাসন করতে গিয়ে ম্যাণ্ডেট শাসককে জনসাধারণের ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে, তবে আইন শৃঙ্খলা ও নৈতিক মান রক্ষার জন্য এবং ক্রীতদাস প্রথা, অস্ত্রশস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ে ব্যবসায় ইত্যাদি কুপ্রথাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিকে C শ্রেণীভুক্ত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা 'ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা'কে, সামোয়া (Samoa)

নিউজীল্যাণ্ডকে, নাওরু (Nauru) গ্রেটবৃটেন, নিউজাল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়াকে একত্র ভাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত জার্মানীর অধীনে আরও যে সব দ্বীপ ছিল তা অষ্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত জার্মানীর দ্বীপগুলিকে জাপানকে ম্যাণ্ডেট হিসেবে দেওয়া হ'ল। এই সব অঞ্চলসমূহের অনেকগুলি আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় খুবই ছোট এবং সভ্য জগত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এইসব কারণে C শ্রেণীভুক্ত ম্যাণ্ডেট অঞ্চলসমূহকে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

ম্যাণ্ডেট শাসনকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে পৃথক ভাবে বিচার করা প্রয়োজন। ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলির শাসন জাতিসংঘের উপর অর্পণ করা হয় এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রগুলি সেই সব অঞ্চল শাসন করার অধিকার লাভ করে। তাই সেই সব অঞ্চলের শাসন ব্যাপারে তারা জাতিসংঘের নিকট দায়ী ছিল। জাতিসংঘের অনুমতি ভিন্ন ম্যাণ্ডেট অঞ্চলকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা বা কোন রাষ্ট্রের অধীনে সেই সব অঞ্চলকে হস্তান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। সেই সব অঞ্চল শাসন ব্যাপারে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রগুলিকে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হ'ত। B এবং C শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট অঞ্চলে কোন প্রকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের দেশরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে সামরিক শিক্ষা দেওয়া বা সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলিতে—বিশেষ করে A এবং B শ্রেণীভুক্ত ম্যাণ্ডেট অঞ্চলে—জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে সমান অধিকার প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রগুলি প্রতি বৎসর কাউন্সিলের কাছে ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের শাসনকার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য ছিল এবং Permanent Mandates Commission নামে একটি সংস্থাকে সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিশন দশ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা এই কমিশনে যাতে সংখ্যাধিক্য হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করে দেখার সময় কমিশনের কাছে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হ'ত। তিনি কমিশনের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হ'ত। ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের অধিবাসীদেরকেও জাতিসংঘের

কাছে তাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে কিছু লিখিত ছিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে এই প্রথা স্বীকৃতি লাভ করে। ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রের মাধ্যমে মাণ্ডেট অঞ্চলের অধিবাসীরা জাতিসংঘের কাছে আবেদন প্রেরণ করতে পারত এবং ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব বক্তব্য সেই আবেদনের সাথে যুক্ত করে পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয়। Permanent Mandates Commission প্রয়োজন মনে করলে আবেদন পত্রের সাথে ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্রের বক্তব্য ও তার নিজস্ব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে তা কাউন্সিলের কাছে প্রেরণ করত, এবং কাউন্সিল শেষ পর্যন্ত তার মতামত ম্যাণ্ডেট রাষ্ট্র ও আবেদনকারীকে একই সাথে জানিয়ে দিত। নগণ্য ব্যাপার নিয়ে বা বেনামী ভাবে যে সব আবেদন প্রেরণ করা হ'ত এবং যে সব আবেদনে জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের অথবা ম্যাণ্ডেট নীতির বিরোধিতা করা হ'ত তা অবশ্যই বিবেচনা করা হ'ত না।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়

জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর 1922 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হল্যাণ্ডের হেগ শহরে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court of International Justice) স্থাপিত হয়। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের চতুর্দশ ধারায় কাউন্সিলকে Permanent Court of International Justice নামে একটি বিশ্বকোর্টের পরিকল্পনা গঠন করে তা জাতিসংঘের সদস্যদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয় যে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের উভয় পক্ষ যদি তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য এই বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে রাজী হয় তবে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে এই বিচারালয় সেই বিরোধের মীমাংসা করবে। এই বিচারালয়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে কোন রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয় নি—স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য এই বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে পারত। তা ছাড়া উক্ত ধারায় (চুক্তিপত্রের চতুর্দশ ধারায়) বলা হয়েছে যে জাতিসংঘের কাউন্সিল বা সাধারণ সভা যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ বা সমস্যা এই বিচারালয়ে উত্থাপন করে তবে এই বিচারালয় সেই সম্বন্ধে পরামর্শ হিসেবে তার অভিমত প্রদান করতে পারবে। বিচারালয়ের অভিমত কেবলমাত্র আইনসংক্রান্ত বিরোধ ও সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ছিল না। যে কোন সমস্যা ও

বিরোধ সম্বন্ধে এই বিচারালয় জাতিসংঘের কাউন্সিল বা সাধারণ সভার অনুরোধক্রমে তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয় তখন বিচারালয়ের অভিমত কেবলমাত্র আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান বা Statute প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে 10 জন আইনবিশেষজ্ঞ নিয়ে কাউন্সিল একটি কমিটি স্থাপন করে। এই কমিটি যে সংবিধান (Statute) রচনা করে তা প্রথমতঃ কাউন্সিল বিবেচনা করে দেখে এবং কিছু পরিবর্তন করে তা সাধারণ সভার কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং সাধারণ সভা 1920 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে সেই সংবিধান গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। 1922 খৃষ্টাব্দে এই বিচারালয় স্থাপিত হয় এবং 1942 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সংবিধানে 59টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর প্রদান করে এবং 51টি রাষ্ট্র বিচারালয়ের সদস্য হয়।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রথমতঃ 9 জন বিচারপতি এবং 4 জন উপ-বিচারপতি (Deputy Judges) নিয়ে গঠিত হয়। পরে 1929 খৃষ্টাব্দে বিচারালয়ের সংবিধান বা Statute পরিবর্তন করে 15 জন বিচারপতি নিয়ে এই বিচারালয়কে গঠন করা হয়। উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হ'তেন। এই বিচারালয়ের বিচারক থাকার সময় তাঁরা অন্য কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। Permanent Court of Arbitration কর্তৃক রচিত একটি নামের তালিকা থেকে সাধারণ সভা ও কাউন্সিল 9 বৎসরের জন্য বিচারপতিদের নির্বাচন করত। Permanent Court of Arbitration-এর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতীয় প্রতিনিধি দল 4 জনের অনধিক বিচারকের নাম প্রস্তাব করতে পারত এবং এই 4 জনের মধ্যে 2 জনের বেশী তাদের নিজেদের দেশের নাগরিক হতে পারত না। যে সব দেশ এই Court-এর সদস্য ছিল না তাদেরকেও বিচারকের নামের তালিকা প্রেরণ করার অধিকার দেওয়া হত। জাতিসংঘের মহাসচিব (Secretary General) সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের কাছে সেই নামের তালিকা পাঠিয়ে দিতেন এবং সেই তালিকা থেকে সাধারণ

সভা ও কাউন্সিল পৃথক ভাবে গোপন ভোটের মাধ্যমে বিচারকদের নির্বাচন করত। অধিকাংশের ভোট না পেলে কোন বিচারক নির্বাচিত হতে পারতেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিচারালয়ের সদস্য ছিল না তবুও এই রাষ্ট্রের তিনজন নাগরিক স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারকরা কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হতেন না—নিজেদের ব্যক্তিগত গুণেই তাঁরা নির্বাচিত হ'তেন। কিন্তু একটি বিশেষ বিচারের সময় যে সব রাষ্ট্র সেই বিচারের সাথে জড়িত ছিল সেই সব প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন বিচারপতি এই বিচারালয়ে থাকার নিয়ম ছিল। তার ফলে অনেক সময় অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হত। সেই বিচার শেষ হয়ে গেলে তাঁরা আর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক থাকতেন না। এই নিয়ম নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

বিভিন্ন দেশের সরকারই এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হতে পারত—কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। কোন বিরোধ উপস্থিত হলে দুই পক্ষই যদি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সেই বিবাদ উত্থাপন করতে রাজী হত তবেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে তার বিচার সম্ভব ছিল। যে কোন এক পক্ষ কোন বিরোধ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত করতে পারত যদি সেই বিষয়ে পূর্ব থেকেই অপর পক্ষের সাথে চুক্তি করা থাকত। কোন রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত সেই রাষ্ট্রকে কোন মতেই স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হতে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না। জাতিসংঘ যখন গঠিত হয় তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে অন্ততঃ আইনসংক্রান্ত বিবাদে রাষ্ট্রসমূহ যাতে এই বিচারালয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু জাতিসংঘের বহু সদস্য রাষ্ট্রই এই নীতি গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় আইনসংক্রান্ত বিবাদের কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা স্বীকার করে নিতে পারে (Optional Clause)। এই Optional Clauseএর অর্থ হল যে আইনসংক্রান্ত যে সব বিবাদে বিশেষ কয়েকটি সমস্যা জড়িত থাকবে সেই সব বিবাদ মীমাংসা করার জন্য একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিতে পারে। সেই সমস্যাগুলি হ'ল: (ক) কোন চুক্তির ব্যাখ্যা, (খ) আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন, (গ) কোন রাষ্ট্রের কোন কাজ আন্তর্জাতিক দায়িত্বের বিরোধী

কি না এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক দায়িত্বের বিরোধী হলে কি ধরনের এবং কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বেশ কিছু রাষ্ট্র এই Optional Clause স্বীকার করে নেয়, কিন্তু অনেক রাষ্ট্রই বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ঐই স্বীকৃতির মধ্যেও অনেক শর্ত আরোপ করে।

হল্যাণ্ডের হেগ শহরের শান্তি প্রাসাদে (Peace Palace) এই বিচারালয় অবস্থিত ছিল। এই প্রাসাদটি এণ্ড্রু কার্ণেগী (Andrew Carnegie) Permanant Court of Arbitrationকে প্রদান করেছিলেন। জাতিসংঘের সাধারণ সভা বিচারকদের বেতন এবং বিচারালয়ের বাজেট স্থির করে দিত এবং বিচারালয় তার নিজের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচন করত। এই বিচারালয়ে সাধারণতঃ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ রাষ্ট্রকে প্রয়োজন হলে অন্য ভাষা ব্যবহার করার অধিকারও দেওয়া হত। অধিকাংশ বিচারক যে অভিমত প্রকাশ করতেন তাই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হত এবং দুই দিকে সমান সমান ভোট হলে প্রেসিডেণ্ট তাঁর ভোট দিতেন। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হত এবং এই বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল সম্ভব ছিল না, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিচারালয়ের জ্ঞাত ছিল না, এমন তথ্য প্রদান করে যে কোন পক্ষ সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারত। সাধারণতঃ প্রত্যেক পক্ষকে বিচারের খরচ বহন করতে হত. তবে প্রয়োজন মনে করলে বিচারালয় এই নিয়মের পরিবর্তনও করতে পারত।

শান্তি রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে না পারলেও এই বিচারালয়ের অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 22 বৎসরে এই বিচারালয় 32টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং 27টি পরামর্শমূলক অভিমত প্রদান করছে। বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্তকেই অবমাননা করা হয় নি। দুই পক্ষ স্বেচ্ছায় বিচারালয়ের বিচারপ্রার্থী না হলে এই বিচারালয়ের কোন কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। তাই যে সব রাজনৈতিক বিরোধের ফলে সাধারণতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই ধরনের বিরোধ মীমাংসা করার কোন ক্ষমতা এই বিচারালয়ের ছিল না। তবুও এই বিচারালয় এমন কতগুলি বিরোধের মীমাংসা করেছে যার ফলে আন্তর্জাতিক অশান্তি ও উদ্বেগ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই বিচারালয়ের সংবিধান (statute) এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আইন গঠনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনের

শাসন স্থাপনের ইতিহাসে এই স্থায়ী বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে এই বিচারালয়ের অস্তিত্ব প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে তবুও এই ধরনের বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকৃত হয় নি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নতুন নাম দিয়ে (International Court of Justice) এই বিচারালয়কে পুনরায় গঠন করা হয়।

জাতিসংঘের মহাসচিব ও দপ্তর

একজন সেক্রেটারী জেনারেল বা মহাসচিবের অধীনে জেনেভা শহরে জাতিসংঘের স্থায়ী দপ্তর স্থাপন করা হয়েছিল। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 6নং ধারায় মহাসচিব ও দপ্তরের কথা উল্লিখিত আছে। সেখানে বলা আছে যে কাউন্সিলের সম্মতি নিয়ে মহাসচিব প্রয়োজন মত কর্মচারী নিযুক্ত করবেন। জাতিসংঘ দপ্তরে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় 700। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্থাপিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রায় 4000 কর্মচারী কাজ করেন। তা ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন সংস্থাগুলিতেও (specialized agency) অনেক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের মধ্যেই (Annex 2 of the Covenant) জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হিসেবে স্যার এরিক ড্রামণ্ড (Sir Eric Drummond)-এর নাম উল্লেখ ছিল এবং স্থির হয়েছিল যে এর পর থেকে সাধারণ সভার সংখ্যাধিক্যের সম্মতি নিয়ে কাউন্সিল কর্তৃক মহাসচিব নিযুক্ত হবেন। ড্রামণ্ড ছিলেন ইংলণ্ডের একজন উচ্চ রাজকর্মচারী (civil servant)। ড্রামণ্ড কত বৎসর পর্যন্ত মহাসচিব হিসেবে কাজ করবেন সেই বিষয়ে চুক্তিপত্রে কিছুই লেখা ছিল না। 1933 খৃষ্টাব্দে ড্রামণ্ড পদত্যাগ করার পর সাধারণ সভা স্থির করে যে দশ বৎসরের জন্য মহাসচিবকে নিয়োগ করা হবে। জাতিসংঘের দ্বিতীয় এবং শেষ মহাসচিব ছিলেন ফ্রান্সের জোসেফ এভেনল (M. Joseph Avenol)।

মহাসচিবকে সাহায্য করার জন্য দুইজন Deputy Secretary General এবং তিনজন Under Secretary General নিযুক্ত ছিলেন। জাতিসংঘের দপ্তর 11টি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল—রাজনৈতিক, সংবাদ আদান-প্রদান, আইন সংক্রান্ত বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয়, যাতায়াত, প্রশাসন এবং সংখ্যালঘু

সমস্যা, ম্যাণ্ডেট, নিরস্ত্রীকরণ, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা।

মহাসচিব কেবলমাত্র প্রশাসনিক প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন কিংবা তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাও থাকবে সেই সম্বন্ধে জাতিসংঘ চুক্তিপত্র থেকে স্পষ্টভাবে কিছু বুঝা যায় না। চুক্তিপত্রের 6নং ধারায় লিখিত আছে যে তিনি সাধারণ সভা এবং কাউন্সিলের প্রত্যেক সভাতেই মহাসচিব হিসেবে কাজ করবেন। জাতিসংঘের যে সব খসড়া চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল তার কয়েকটিতে জাতিসংঘের প্রধান কর্মকর্তাকে যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের এবং তাঁকে চ্যান্সেলার নামে অভিহিত করার প্রস্তাব ছিল। Lord Cecil যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাতেও এই ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু স্যার এরিক ড্রামণ্ড এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন না করে প্রশাসনিক প্রধান কর্মচারী হিসেবেই কাজ করেন। কোন রাজনৈতিক বাক্-বিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণরূপে প্রচার বিমুখ ভাবে দপ্তরের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব জাতীয় প্রতিনিধির দল জেনেভায় জাতিসংঘের আলোচনায় যোগ দিতে আসত তাদের প্রত্যেককে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে পরামর্শ দিতেন। বিশেষজ্ঞের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন—রাজনীতিবিদের ভূমিকা নয়। জোসেফ এভেনলও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘের সাধারণ সভা এবং কাউন্সিলে বিবৃতি দেওয়ার যে অধিকার তাঁদের ছিল তা তাঁরা বিশেষ ব্যবহার করেন নি। অনেকে মনে করেন যে জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম-কর্তার পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল। বোধহয় সেই কারণেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মহাসচিবকে অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জাতিসংঘের কর্মচারীদের সাথে তাঁদের জাতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি ধরনের হবে সেই বিষয়ে চুক্তিপত্রে কিছু লিখিত নেই। জাতিসংঘের দপ্তরে কাজ করেও তাঁরা কি তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের কর্মচারী বলে পরিগণিত হবেন? কিংবা তাঁরা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর আনুগত্য প্রদর্শন করে তার নির্দেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবেন? এরিক ড্রামণ্ডের চেষ্টায় জাতিসংঘ দপ্তরের কর্মচারীদের ভেতর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্পষ্ট করে লিখিত আছে যে কোন সদস্যরাষ্ট্র

জাতিপুঞ্জের কর্মচারীকে কোন ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে না জাতি-সংঘের অভিজ্ঞতার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অনেক পরিমাণে উন্নততর সংস্থা হিসেবে গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা

এই অধ্যায়ে সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করার সময় জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে এই বিষয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে জাতিসংঘ সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে কতদূর সক্ষম হয়েছে এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হল। কয়েকটি প্রধান প্রধান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ভাবে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এঞ্জেলি সমস্যা

যে সব সমস্যা জাতিসংঘ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল এঞ্জেলি (Engeli) বন্দর নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইরানের মধ্যে মতবিরোধ। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত এঞ্জেলি বন্দরের উপর 1920 খৃষ্টাব্দে রুশ নৌবাহিনী গোলা বর্ষণ করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার মীমাংসার জন্য ইরান কাউন্সিলের কাছে অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে এই সমস্যা নিয়ে ইরান সরকার ও সোভিয়েত সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনাও শুরু হয় এবং কাউন্সিল কোন ব্যবস্থা স্থির করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট দুই সরকার নিজেরাই সমস্যা মিটিয়ে নিতে সমর্থ হয় এবং রাশিয়া এঞ্জেলি শহর পরিত্যাগ করে চলে আসে।

আল্যাণ্ড সমস্যা

ঐ বৎসরই (1920) আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ (Aaland Islands) নিয়ে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা জাতিসংঘ কাউন্সিলের কাছে উত্থাপিত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ এক সময় সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অধিবাসীরা সুইডিশ ভাষাতেই কথা বলত। 1809 খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড জয় করে এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নেয়। 1917 খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড যখন

স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা সুইডেনের সাথে মিলিত হতে চায়। সুইডেন সংখ্যালঘুর আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী এই দাবী সমর্থন করে এবং গণভোটের মাধ্যমে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের এই বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে ফিনল্যাণ্ডকে অনুরোধ জানায়। ফিনল্যাণ্ড আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের এই দাবী এবং সুইডেনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। ফিনল্যাণ্ডের যুক্তি ছিল যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই সমস্যা ফিনল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ সমস্যা। 1920 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বৃটেন জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 11 নং ধারা অনুযায়ী এই সমস্যা জাতিসংঘ কাউন্সিলে উত্থাপন করে। এই সমস্যা ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ সমস্যা কিনা স্থির করার জন্য প্রথমতঃ তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞের একটি কমিশন স্থাপন করা হল। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচারালয় তখনও স্থাপিত হয় নি বলে এই কমিশন স্থাপন করার প্রয়োজন হয়েছিল। এই কমিশনের মতে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের সমস্যা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে মনে করা যায় না, কারণ ফিনল্যাণ্ড যখন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয় তার পূর্বেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘ কাউন্সিল তখন এই সমস্যা বিবেচনার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে এবং সেই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করে স্থির করে যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের উপর ফিনল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। যদিও এই সিদ্ধান্তে সুইডেন খুশী হতে পারে নি তবুও কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়।

পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত সমস্যা

1918 খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া রাশিয়ার আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কিন্তু প্রথম থেকেই সীমান্ত নিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। ভিলনা শহর প্রাচীন লিথুয়ানিয়ার রাজধানী হলেও এই শহরে পোল্যাণ্ডের অনেক অধিবাসীর বসবাস ছিল। এই শহর নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 11 নং ধারা অনুযায়ী পোল্যাণ্ড এই সমস্যা জাতিসংঘ কাউন্সিলে উত্থাপন করে।

কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং সাময়িক ভাবে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সীমান্ত গৃহীত হয় তাতে ভিলনার উপর লিথুয়ানিয়ার কর্তৃত্বই স্বীকৃত হ'ল। কিন্তু এই সময় সরকারী নির্দেশ ছাড়াই পোল্যাণ্ডের একজন সেনানায়ক নিজের চেষ্টায় হঠাৎ এই শহর অধিকার করে নেয়। পোল্যাণ্ড সরকার এই কাজকে সমর্থন না করলেও পোল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী ভিলনা পরিত্যাগ করতে রাজী হয় না এবং সেই শহরে গণভোট নেওয়ার জন্য জাতি-সংঘের কাউন্সিল যে চেষ্টা করে তাও ব্যর্থ হয়। 1922 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পোল্যাণ্ড সরকারী ভাবে ভিলনা শহরকে পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত বলে ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ এই সীমান্তই স্বীকার করে নেয়। লিথুয়ানিয়া পরে জাতিসংঘের কাউন্সিল ও সাধারণ সভার কাছে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন জানায়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। এই পোল্যাণ্ড-লিথুয়ানিয়া সীমান্তবিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ আসলে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় স্বার্থ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্স তার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং জাতিসংঘের উপর বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন করতে পারে না। জার্মানী সম্বন্ধে ফ্রান্সের ভীতির অন্ত ছিল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। তাই জার্মানী ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। ফ্রান্সের এই নীতি পোল্যাণ্ডকে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করার সাহস দেয়।

গ্রীস ও ইতালীর বিরোধ—কর্ফু দ্বীপ

1923 খৃষ্টাব্দে গ্রীস ও আলবেনিয়ার সীমান্ত নির্ধারণের জন্য গ্রীসে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের অধিবেশন আরম্ভ হয় তখন সেই অধিবেশনের ইতালীয় সদস্য হঠাৎ নিহত হন। ইতালীতে তখন মুসোলিনীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষতিপূরণ সহ বিভিন্ন দাবী জানিয়ে ইতালী গ্রীসকে এক চরম পত্র প্রেরণ করে এবং 24 ঘণ্টার মধ্যে তা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়। গ্রীস সেই চরমপত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ইতালী তখন কর্ফু দ্বীপে গোলা বর্ষণ করে এবং তা অধিকার করে নেয়। এখানে লক্ষণীয় যে ইতালী জাতিসংঘের কাছে এই সমস্যা উত্থাপন না করে নিজেই শক্তি প্রয়োগ করে তার মীমাংসার জন্য চেষ্টা করে। বলপূর্বক ইতালী কর্ফু দ্বীপ অধিকার করার পর

গ্রীস জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 12 ও 15 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের কাছে সেই সমস্যা উত্থাপন করে। যদিও মুসোলিনী এই ব্যাপারে জাতিসংঘের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন তবুও জাতিসংঘ এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে এবং জাতিসংঘের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রীস ইতালীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হয়। ইতালী পরে কর্ফু দ্বীপ থেকে তার সৈন্য অপসারণ করে নেয়। জাতিসংঘের প্রতি মুসোলিনীর কোন শ্রদ্ধা ছিল না কিন্তু তবুও তিনি জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ফু দ্বীপ থেকে ইতালীয় সৈন্য অপসারণ করতে বাধ্য হন। তার প্রধান কারণ হ'ল যে তখনও ভূমধ্যসাগরে ইতালীর ক্ষমতা সম্প্রসারণ বৃটেন ও ফ্রান্স মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল প্রকৃতির কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি। বিভিন্ন দেশের শক্তি, স্বার্থ ও পররাষ্ট্র নীতি দ্বারাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালিত হত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সেই রাজনীতির সাথে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই তা কার্যকরী হত।

টিউনিস ও মরোক্কোতে নাগরিকতার সমস্যা

টিউনিস ও মরক্কো ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ছিল, কিন্তু সেই রাজ্যের এক শ্রেণীর অধিবাসীকে (Maltese residents) বৃটেন নিজেদের প্রজা হিসেবে গণ্য করত। ফ্রান্স সেই দাবী অস্বীকার করে 1921 খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সেই সব অধিবাসীদের ফরাসী নাগরিক বলে গ্রহণ করে এবং ফরাসী সামরিক বাহিনীতে যোগদানের যোগ্য বলে ঘোষণা করে। বৃটেন ফ্রান্সের এই কার্যের প্রতিবাদ জানায় এবং জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 15 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ফ্রান্স এই বিষয়টিকে তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে ঘোষণা করে এবং তাই এই বিষয়ে কাউন্সিলের কোন কর্তৃত্ব করতে রাজী হয় না। ফ্রান্স ও বৃটেন উভয়েই এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উত্থাপন করতে রাজী হয় এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিতে উভয়ই স্বীকার করে। বিচারালয় মনে করে যে যদিও নাগরিকতার সমস্যা একটি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয় তবুও টিউনিস ও মরোকোতে নাগরিকতা নিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ সেই ধরনের প্রশ্ন নয়। ফ্রান্সের অধীনস্থ অঞ্চলে নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রশ্ন জড়িত আছে। যাই হোক আন্তর্জাতিক

বিচারালয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফ্রান্স ও বৃটেন নিজেরাই এই বিরোধ মিটিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার বিরোধ

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমান্ত নিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সীমান্ত অঞ্চলে প্রায়ই নানা ধরনের সংঘর্ষ চলতে থাকে। 1925 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সৈন্য সীমান্তে গোলা বর্ষণের ফলে নিহত হয় এবং তারপরেই গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। বুলগেরিয়া তখন জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 10 এবং 11 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানায়। কাউন্সিলের তখন কোন অধিবেশন ছিল না, কিন্তু কাউন্সিলের সভাপতি ব্রিয়াঁ (M. Aristide Briand) নিজ দায়িত্বে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং অপর রাষ্ট্র থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেন। পরে জাতিসংঘের কাউন্সিল সভাপতির এই নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য অপসারণের পূর্বে এই সমস্যা সম্বন্ধে দুই পক্ষের কোন কথা বিবেচনা করতে রাজী হয় না। যুদ্ধ বিরতির পরে একটি অনুসন্ধান কমিটিকে সেখানে প্রেরণ করা হয় এবং সেই কমিটির সুপারিশক্রমে কাউন্সিল গ্রীসকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং গ্রীস বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষ অবসানের জন্য কাউন্সিলের সভাপতি ব্রিয়াঁ যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার এই সংঘর্ষের সার্থক সমাধানের সাথে 1914 সালের সেরাজেভো ঘটনার (এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়) তুলনা করে অনেকে জাতিসংঘের উপকারিতা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেরাজেভো ঘটনার সাথে ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির স্বার্থ ও পররাষ্ট্র নীতি জড়িত ছিল, কিন্তু গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সংঘর্ষের সেই রকম কোন গুরুত্ব ছিল না।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে শুল্ক সংস্থার প্রস্তাব

1931 খৃষ্টাব্দে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে মিলিতভাবে এক শুল্ক সংস্থা (Customs Union) স্থাপন করে এবং ঘোষণা করে যে অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিও এই শুল্ক সংস্থায় যোগদান করতে পারে। ফ্রান্স

এই চুক্তিতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে ভার্সাই সম্মেলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্সের প্রধান নীতি ছিল জার্মানীকে দুর্বল করে রাখা এবং সেইজন্য ভার্সাই সম্মেলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ফ্রান্স সহ্য করতে রাজী ছিল না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেণ্ট জারমেইন (Treaty of Saint Germain) চুক্তিতে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক মিলন যাতে ভবিষ্যতে কখনও হ'তে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে জাতিসংঘ কাউন্সিলের সম্মতি ব্যতীত অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। পরে 1922 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে প্রটোকোল (Protocol) স্বাক্ষরিত হয় তাতে বলা হয়েছিল যে অষ্ট্রিয়া অন্য রাষ্ট্রের সাথে এমন কোন অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করবে না যার ফলে তার স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ফ্রান্সের ভয় ছিল যে মিলিত শুল্ক সংস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সাথে মিলিত হয়ে জার্মানীকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল জার্মান।

বৃটেন জাতিসংঘ কাউন্সিলে এই অভিযোগ আনে যে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর মিলিত শুল্ক সংস্থা অষ্ট্রিয়ার পূর্ববর্তী চুক্তিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে চুক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং তাই জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 14 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে এই বিষয়ে মতামত জানাবার জন্য অনুরোধ করে। এখানে আসল সমস্যা ছিল রাজনৈতিক—জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় ফ্রান্সের ভয়। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ফ্রান্সের এই ভয় দূর করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকরাও এই সমস্যার বিচার করতে গিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন নি বলেই মনে হয়। 8 জন বিচারক (ফ্রান্সের বিচারক সহ) এই শুল্ক সংস্থাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। 7 জন বিচারক (জার্মানীর বিচারক সহ) বলেন যে এই সংস্থা দ্বারা অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় নি এবং তাই তাঁরা এই শুল্ক সংস্থাকে সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত বলেই মনে করেন। সৌভাগ্যবশতঃ জাতিসংঘ

কাউন্সিলকে এই সমস্যা নিয়ে আর বেশী আলোচনা করতে হয় নি কারণ সেই বৎসরেই (1921) সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী শুল্ক সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। এই সমস্যা বিচার করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মর্যাদা সাধারণের দৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাতিসংঘের মাধ্যমে ফ্রান্স ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি পরিবর্তন সম্ভব না হয় তবে অন্য উপায়ে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। পরিবর্তনকে অস্বীকার করে কেবল মাত্র স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা দ্বারা নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী আক্রমণ

মাঞ্চুরিয়াতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ নিয়ে জাপান, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বহু বৎসর ধরেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ চলে আসছিল। জাপান পাশ্চাত্য শক্তির অনুকরণে সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে এবং 1895 খৃষ্টাব্দে চীনকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপ (Liaotung Peninsula) এবং পোর্ট আর্থার অধিকার করে নেয় এবং চীনকে কোরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতার ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। 1898 খৃষ্টাব্দে পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হলে জাপান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং 1904-5 খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে (South Manchurian Railway) নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথকে রক্ষা করার জন্য জাপান সেই অঞ্চলে কয়েক হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখার অধিকারও লাভ করে। মুকডেনে এই জাপানী সেনাদলের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। তারপরেও চীনের সাথে জাপানের শত্রুতা অব্যাহত থাকে এবং 1910 খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপান চীনে অবস্থিত জার্মান 'কলোনী' অধিকার করে নেয় এবং চীনকে জাপানের 21 দফা দাবী (Twentyone Demands) মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। চীন বাধ্য হয়ে 21

দফার অধিকাংশ দাবীই মেনে নেয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে (1921-1922) জাপান প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চীনে যে সব অধিকার লাভ করে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং চীনের অখণ্ডতা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সাময়িক ভাবে চীন সম্বন্ধে জাপানের নীতির কিছু পরিবর্তন হ'লেও শেষ পর্যন্ত জাপান আবার চীনে বিশেষ করে চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। মাঞ্চুরিয়া কয়লা, লোহা এবং খাদ্যশস্যে সমৃদ্ধ ছিল। নিজের দেশের শিল্প সম্প্রসারণের জন্য কোরিয়ার বাজার ও সম্পদের দিকে জাপান বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সেই সময়কার বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার জন্য জাপান মাঞ্চুরিয়াতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 1931 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। 18 সেপ্টেম্বর মুকডেনে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের এক অংশ বিস্ফোরক দ্বারা বিনষ্ট করে দেওয়ার অজুহাতে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল আক্রমণ করে বসে। বিস্ফোরণের ফলে যা ক্ষতি হয়েছিল তা খুবই সামান্য এবং সেই কাজও মুকডেনের মত জায়গায় চীনা সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল কি না তাও সন্দেহ।

19 সেপ্টেম্বর (1931) চীন জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 11 নং ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের নিকট আবেদন জানায়। কাউন্সিলে জাপানের প্রতিনিধি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে মুকডেনের ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং চীন ও জাপান পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে, এবং তাই এই বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক 22 সেপ্টেম্বর কাউন্সিল চীন ও জাপান উভয়কেই যুদ্ধ বিরতি এবং সংঘর্ষের এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণের জন্য এবং অবস্থার অবনতি ঘটে এমন কোন কাজ না করার জন্য নির্দেশ দেয়। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চীন ও জাপানকে এই ধরনের কথা জানিয়ে 'নোট' প্রেরণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানের অভিযান অব্যাহত থাকে। 13 অক্টোবর (1931) কাউন্সিলের যখন পুনরায় অধিবেশন বসে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারে জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতা করতে রাজী হয় এবং মার্কিন সরকার জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয় যে জাতিসংঘ এই বিষয়ে যে ব্যবস্থা নেবে মার্কিন সরকার নিজে স্বাধীন ভাবে তা কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করবে। কাউন্সিল তখন

জাপানের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিকে কাউন্সিলের আলোচনায় যোগদান করার জন্য আহ্বান জানায়। জেনেভায় নিযুক্ত মার্কিন কন্সাল Prentice Gilbert-কে কাউন্সিলের আলোচনায় যোগদান করার জন্য মার্কিন সরকার মনোনীত করেন। Kellogg—Briand Pact (অথবা Pact of Paris)-এর অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয় কেবলমাত্র সেই সব আলোচনাতেই মার্কিন প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং আলোচনার অন্যান্য অংশে তিনি কেবলমাত্র পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। জাপান তার মাঞ্চুরিয়া অভিযানকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন বলে বর্ণনা করে।[1] কাউন্সিলে যখন চীন ও জাপানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা উঠে তখন চীনের প্রতিনিধি বলেন যে সৈন্য অপসারণের পূর্বে আলোচনা সম্ভব নয় কিন্তু জাপান আলোচনার ফলেই সৈন্য অপসারণ সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে। কাউন্সিল 24 অক্টোবর (1931) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে 16 নভেম্বরের মধ্যে (অর্থাৎ কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশনের পূর্বে) জাপানকে অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করতে বলা হয়। জাপান এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং এই সিদ্ধান্তের পরেও মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের অভিযান সমান ভাবে চলতে থাকে। 16 নভেম্বর (1931) কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং চীন ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কাউন্সিল ডিসেম্বর মাসে (1931) এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কমিশনে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড লিটন (Lord Lytton) এই কমিশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। এই কমিশন লিটন কমিশন নামে পরিচিত। জাতিসংঘ কাউন্সিলে জাপানের প্রতিনিধিই এই কমিশন স্থাপনের প্রস্তাব করে এবং সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সেনাদল তখন পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং বোধহয় মাঞ্চুরিয়া

1. মনে রাখা প্রয়োজন যে আত্মরক্ষামূলক কোন কাজে Kellogg-Briand চুক্তি প্রযোজ্য ছিল না। এই চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন Frank. B. Kellogg বলেন যে আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যেক সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অধিকার এবং আত্মরক্ষার জন্য কখন যুদ্ধের প্রয়োজন তা প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেই স্থির করবে।

সম্পূর্ণভাবে দখল করার জন্য সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যেই জাপান কমিশন স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। জাপানের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়, কারণ লিটন কমিশন তার রিপোর্ট প্রস্তুত করতে দীর্ঘ নয় মাস সময় নেয়। 1932 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লিটন কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার Kellogg-Briand Pact-এ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব সম্বন্ধে জাপান ও চীন উভয়কেই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 1932 খৃষ্টাব্দের 7 জানুয়ারী মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব Henry L. Stimson ঘোষণা করেন যে জাতিসংঘ চুক্তিপত্র এবং Kellogg-Briand Pact-কে উপেক্ষা করে যদি কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় বা কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে মার্কিন সরকার তা স্বীকার করবে না। স্বীকৃতি না দেওয়ার ষ্টিমসনের এই নীতি (Stimson Doctrine of Non-recognition) সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে কার্যকরী কোন ভূমিকা পালন করতে পারে নি। স্বীকৃতি না দেওয়ার এই নীতিতে মার্কিন সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই সব দেশ সহযোগিতা করতে রাজী হয় না। এই অঞ্চলে বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির সাথে সহযোগিতা করে তারা প্রত্যক্ষ ভাবে জাপানের বিরোধিতা করতে অস্বীকার করে। আসলে ষ্টিমসনের এই নীতি দ্বারা মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের সামরিক অভিযান বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। একমাত্র সামরিক বল প্রয়োগ করেই জাপানকে বিরত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বল প্রয়োগ করতে অথবা জাপানের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতেও প্রস্তুত ছিল না। বৃটেন ও ফ্রান্স জাতিসংঘের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে। জাপান সহজেই উপলব্ধি করে যে সামরিক বল প্রয়োগ করতে তখন কোন রাষ্ট্রই প্রস্তুত নয়। ফলে জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি আরও নিরঙ্কুশ রূপ ধারণ করে।

ষ্টিমসনের নোটের উত্তরে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানায় যে চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করার কোন উদ্দেশ্য জাপানের নেই। কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে তখনও জাপানের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জাপান মাঞ্চুরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। জাপানের বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে মাঞ্চুকুও (Manchukuo) নাম দিয়ে একটি জাপানের তাবেদারী রাষ্ট্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন তখন উপায়ান্তর না দেখে অর্থনৈতিক ভাবে জাপানকে

আঘাত করার জন্য জাপানী জিনিষের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের ফলে জাপান ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং তাই এই বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে জাপানের রণতরী চীনের প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র সাংহাই আক্রমণ করে। চীন তখন আবার জাতি-সংঘের কাছে আবেদন জানায়। এবার 11নং ধারা আর কার্যকরী হবে না ভেবে চীন 10 নং এবং 15 নং ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘের কাছে এই সমস্যা উত্থাপন করে। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 15নং ধারার 9 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চীন জাতিসংঘের সাধারণ সভার কাছে এই সমস্যা তোলার আবেদন জানায়। মাঞ্চুরিয়ার প্রশ্নে তখন প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সাধারণ সভা মার্চ মাসে (1932) জাপানকে অবিলম্বে সাংহাই পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এবং জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে ষ্টিমসনের স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতি (Stimson Doctrine) গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। অবশেষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর মে মাসে সাংহাইতে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। জাপান সাংহাই ছেড়ে চলে আসে এবং চীন বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসে (1932) লিটন কমিশন জাতিসংঘ কাউন্সিলের কাছে যে দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করে তাতে বলা হয় যে মাঞ্চুরিয়াতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই এবং মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের সামরিক অভিযানকে আত্মরক্ষামূলক বলে মনে করা যায় না। রিপোর্টে বলা হয় যে পরস্পরের সাথে সহযোগিতাই চীন ও জাপানের উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল এবং জাতিসংঘের সহায়তায় এই দুই রাষ্ট্র যাতে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে পারে সেই চেষ্টাই করা উচিত। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করে সেই অঞ্চলকে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন রাজ্যে পরিণত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ডিসেম্বর মাসে (1932) এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য Assembly বা সভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সভা বিবদমান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উপযোগী একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য 19 জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে (Committee of Nineteen)। এই কমিটি জাপান ও চীন উভয়ের গ্রহণযোগ্য কোন পরিকল্পনা রচনা করতে ব্যর্থ হয়। তখন জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 15 নং ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অনুযায়ী[1] এই কমিটি একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে। সেখানে বলা হয় যে একটি কমিটির মাধ্যমে লিটন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করা উচিত এবং তাতে মাঞ্চুকুওকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে আহ্বান জানান হয়। কমিটির এই রিপোর্ট বিবেচনা করার জন্য 24 ফেব্রুয়ারী (1933) জাতিসংঘের সভা মিলিত হয় এবং জাপান ছাড়া সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র এই রিপোর্ট সমর্থন করে। জাতিসংঘ চীন-জাপানের এই সমস্যার জন্য জাপানকেই দায়ী করে, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানকে আত্মরক্ষামূলক বলে স্বীকার করে না এবং সেই অঞ্চলে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতাই মেনে নেয়। জাতিসংঘের সভা লিটন রিপোর্ট গ্রহণ করায় জাপানের প্রতিনিধি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সভা পরিত্যাগ করে চলে যান। 27 মার্চ (1933) জাপান সরকার জাতিসংঘ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মাঞ্চুরিয়াতে জাতিসংঘের ব্যর্থতার ফলে সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাস অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে যায়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন জাতিসংঘ অনেক ক্ষেত্রে তা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতেই প্রথম জাতিসংঘ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে তার আক্রমণাত্মক নীতি থেকে প্রতিহত করার সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যান্য বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন জাতিসংঘের সদস্য নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করে তা দ্বারা মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। কোন বৃহৎ শক্তিই তখন জাপানকে প্রতিহত করার জন্য চীনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অথবা জাপানের বিরুদ্ধে কার্যকরী অর্থনৈতিক কোন চাপ সৃষ্টি করতে প্রস্তুত ছিল না। সমস্ত পৃথিবী তখন এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার (economic depression) সম্মুখীন এবং কোন রাষ্ট্রই জাপানের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী ছিল না। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু তখন রাশিয়া তার নিজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এত ব্যস্ত

1. এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কাউন্সিল যদি কোন বিরোধ মীমাংসা করতে অসমর্থ হয় তবে সেই বিরোধ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও সেই সমস্যার যে সমাধান ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে তা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাধিক্যে রচনা করে প্রকাশ করবে।

যে জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সমর্থন করতে না পারলেও কোন বৃহৎ রাষ্ট্র কার্যকরী ভাবে সেখানে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা তার নিজের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করে নি। তাই জাতিসংঘের সমস্ত কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র নীতি দ্বারাই বিশ্ব রাজনীতি পরিচালিত হত—সেই রকম কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতির সাথে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে জাতিসংঘের পক্ষে কোন দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

ইতালীর ইথিওপিয়া আক্রমণ

1935 খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া (প্রাচীন নাম ছিল আবিসিনিয়া) আক্রান্ত হওয়ার ফলে এক গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুসোলিনী সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ফ্যাসিজম ইতালীর জনসাধারণকে সামরিক গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তখন ইতালীর পক্ষে ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব ছিল না এবং তাই মুসোলিনী আফ্রিকার স্বাধীন কিন্তু দুর্বল রাষ্ট্র ইথিওপিয়াতে ইতালীর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য প্রস্তুত হলেন। খনিজ সম্পদ এবং কাঁচা মালে ইথিওপিয়া সমৃদ্ধ ছিল এবং ইরিত্রিয়া (আফ্রিকাতে ইতালীর 'কলোনী') ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড থেকে ইথিওপিয়াকে আক্রমণ করা ইতালীর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তা ছাড়া 1896 খৃষ্টাব্দে এডোয়া (Adowa)-র যুদ্ধে ইথিওপিয়ার কাছে ইতালী পরাজিত হয়। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেও ইতালী বদ্ধপরিকর ছিল। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে জাতিসংঘের ব্যর্থতাও মুসোলিনীকে আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করতে উৎসাহ দেয়। 1934 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আফ্রিকাস্থ ইতালীর কলোনী এবং ইথিওপিয়ার সীমান্তে ওয়াল ওয়াল (Wal Wal) নামক স্থানে ইতালীয় এবং ইথিওপিয়ার বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের সুযোগ নিয়েই ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে।

1934 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত Wal Wal-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতালী ও ইথিওপিয়ার মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয় জাতিসংঘ সেই ব্যাপারে ও ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। 1935 খৃষ্টাব্দের

জানুয়ারী মাসেই ইথিওপিয়া জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু জাতিসংঘ এই বিষয়ে আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক বিলম্ব করে। জাতিসংঘের ধারণা ছিল যে সালিশীর (arbitration) সাহায্যে ইতালী ও ইথিওপিয়া তাদের সমস্যা সমাধান করে নিতে সক্ষম হবে। Wal Wal ঘটনার অব্যবহিত পরেই ইথিওপিয়া ইতালীর কাছে প্রতিবাদ জানায় এবং 1928 খৃষ্টাব্দে ইতালী ও ইথিওপিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সালিশীর মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসার জন্য ইতালীকে অনুরোধ করে। মুসোলিনী প্রথমতঃ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পরে বৃটেন ও ফ্রান্সের অনুরোধে সালিশীর প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত হন। বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ই জাতিসংঘে উত্থাপিত না করে আলাপ আলোচনা ও সালিশীর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ছিল। মে মাসে (1935) জাতিসংঘের কাউন্সিলকে জানানো হল যে ইতালী ও ইথিওপিয়া সালিশীর মাধ্যমে তাদের সমস্যা মীমাংসা করতে রাজী হয়েছে। মুসোলিনী সালিশীর প্রস্তাবে রাজী হলেও নানা অজুহাতে কালক্ষেপণ করতে আরম্ভ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করেন। সালিশী বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়—পঞ্চম সদস্য কে হবেন তা নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। তখন কাউন্সিল মিলিত হয়ে পঞ্চম সদস্যকে অবিলম্বে মনোনয়ন করে সালিশীর কাজ শীঘ্র আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করে এবং স্থির করে যে আগামী 4 সেপ্টেম্বর (1935) ইতালী ও ইথিওপিয়ার সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলে সাধারণ আলোচনা শুরু হবে। সালিশী কমিশন 3 সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলে যে Wal Wal ঘটনার জন্য কোন পক্ষকেই দায়ী করা চলে না, কারণ উভয় পক্ষেরই ধারণা ছিল যে তারা নিজেদের জায়গায় যুদ্ধ করেছে। Wal Wal এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর বৈরীমূলক আচরণ এই কমিশন সমর্থন করতে পারে না। সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য মুসোলিনী মোটেই আগ্রহী ছিলেন না—সামরিক প্রস্তুতির পরে কোন অজুহাতে যুদ্ধ আরম্ভ করাই ছিল তাঁর নীতি। ইথিওপিয়ার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বিপন্ন জেনেও জাতিসংঘ ইতালীকে বিরত করার জন্য কোন কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে নি। সেপ্টেম্বর মাসে (1935) কাউন্সিল এই সমস্যা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করে তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক ও স্পেন—এই

পাঁচটি দেশের পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কমিটিতে যোগদান করতে অস্বীকার করে। সোভিয়েতের মতে সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কেবলমাত্র কালক্ষেপণ করাই ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই কমিটি প্রস্তাব করে যে ইথিওপিয়াতে ইতালীর বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করে নিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে ইথিওপিয়াকে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রদান করে কতগুলি সংস্কার সাধন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ইথিওপিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ইতালী রাজী হয় না। অক্টোবর মাসে (1935) ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা না করে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করে।

5 অক্টোবর ইথিওপিয়া জাতিসংঘের কাছে চুক্তিপত্রের 16 নং ধারা অনুযায়ী আবেদন জানায় এবং 7 অক্টোবর কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে চুক্তিপত্রের 12নং ধারা অগ্রাহ্য করে ইতালী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। জাতিসংঘ ইউরোপের একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম আক্রমণকারী হিসেবে অভিহিত করে। কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে সভা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং চুক্তি-পত্রের 16নং ধারা অনুযায়ী ইতালীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। প্রস্তাব করা হয় যে ইতালীকে অস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া সর্বোতভাবে বন্ধ করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইতালীর কোন জিনিষ কোন দেশ আমদানী করবে না। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করে বলা হল যে সেই সব উপকরণ কোন দেশ ইতালীতে রপ্তানী করতে পারবে না। কোন দেশ যাতে ইতালীর সাথে বাণিজ্য বন্ধ করে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য স্থির করা হয় যে ইতালী থেকে আমদানী বন্ধ করে সেই সব দেশ থেকে আমদানী করা হবে যারা ইতালীর বাজারে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। আলবেনিয়া, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ব্যতীত জাতিসংঘের সমস্ত রাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে স্বীকৃত হয়। ইতালীর এই তিনটি প্রতিবেশী দেশ ইতালীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হয় নি। জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের 16নং ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যরা আক্রমণকারী ইতালীর সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী হলেও তা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি। ইতালী যাতে ইথিওপিয়ায় সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ প্রেরণ করতে না পারে তার জন্য সুয়েজখাল বন্ধ করে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা করা হয় নি।

যুদ্ধের জন্য ইতালীর তেলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ইতালীতে তেল রপ্তানি করা বন্ধ হয় নি। তেল এবং অন্যান্য কয়েকটি উপকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর (এই দুই দেশ তখন জাতিসংঘের সদস্য ছিল না) সহযোগিতা ভিন্ন ইতালীতে এই সব উপকরণের রপ্তানী কার্যকরী ভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ইতালীকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত অধিক তেল সেখানে রপ্তানী করে বেশী মুনাফা আদায় করার সুযোগ লাভ করত।[1] তা ছাড়া মুসোলিনী ঘোষণা করেছিলেন যে ইতালীতে তেল রপ্তানী যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তা শত্রুতামূলক কাজ বলে গণ্য করা হবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইথিওপিয়ায় ইতালীর আক্রমণকে সমর্থন করতে না পারলেও সেই কারণে ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

নভেম্বর মাসে (1935) জাতিসংঘের এক কমিটি স্থির করে যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরে ইতালীতে তেল সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাতে ফ্রান্সের লাভাল (Pierre Laval) এবং ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hoare) বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁদের ভয় হয় যে এই ব্যবস্থার ফলে যুদ্ধ ইউরোপেও বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই হোর ও লাভাল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য গোপনে স্থির করেন যে ইথিওপিয়ার এক বিরাট অংশে ইতালীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাকী অংশেও ইতালীর অর্থনৈতিক অধিকার পূর্ণ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। ডিসেম্বর মাসে হোর ও লাভালের এই গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ এই অভিসন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ক্যাবিনেট থেকে স্যার স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এণ্টনী ইডেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হন। ইতালীতে তেল রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বে জাতিসংঘের কমিটি ইতালী ও ইথিওপিয়া এই উভয় দেশকেই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আর একবার আবেদন জানায়। 1936 খৃষ্টাব্দের 3 মার্চ এই আবেদন প্রেরণ করা হয় এবং বলা হয় যে এই আবেদনের উত্তর বিবেচনার জন্য এক সপ্তাহ পরে

1. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 1935 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস নিরপেক্ষ থাকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতালী ও ইথিওপিয়া উভয় দেশকেই অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী করা বন্ধ করে দেয়। আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দেশের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করা হ'ল না। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তেল, লোহা বা ইস্পাত রপ্তানী বন্ধ করার কোন কথা ছিল না।

জাতিসংঘের কমিটি আবার মিলিত হবে। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই 7 মার্চ হিটলার রাইনল্যাণ্ড সম্বন্ধে ভার্সাই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা ভঙ্গ করে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ফ্রান্স অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং এই নতুন পরিস্থিতিতে ইতালী-ইথিওপিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব যেন অনেক কমে যায়। মে মাসে (1936) ইতালীর সেনাবাহিনী ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবাতে প্রবেশ করে। রাজা হেইলে সেলাসী দেশ ছেড়ে পলায়ন করেন এবং ইথিওপিয়ার স্বাধীনতাসূর্য সাময়িক ভাবে অস্তমিত হ'ল। ইতালীর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা ক্রমে তুলে নেওয়া হয়। জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়ে এবং জাতিসংঘের সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েও ইথিওপিয়া তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের হুমকী থেকে সদস্যরাষ্ট্রদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ যে 'প্রোগ্রাম' গ্রহণ করে তা প্রহসনে পরিণত হ'ল।

জাতিসংঘের এই চরম ব্যর্থতার কারণ কি? জাতিসংঘের শক্তি নির্ভর করত বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সহযোগিতার উপর, কিন্তু প্রধান প্রধান রাষ্ট্রসমূহ ইথিওপিয়ার প্রশ্নে ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। ইতালীর বিরুদ্ধে তারা এমন কার্যকরী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও রাজী ছিল না যার ফলে ইতালীর সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। ফ্রান্স জার্মানীর ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে ইতালীর বন্ধুত্ব ফ্রান্সের বিশেষ ভাবে কাম্য ছিল। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতি সেই ভাবেই গড়ে উঠে। বৃটেনও ইতালী অপেক্ষা নাৎসী জার্মানীকেই বড় শত্রু বলে মনে করে। অতএব ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না যার ফলে ইতালী জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করতে পারে।[1] হোর-লাভাল গোপন পরিকল্পনার মধ্যেই বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে ইতালী-ইথিওপিয়ার যুদ্ধের প্রশ্নে বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতি ছিল সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত। এই দুই দেশ, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইতালীর বন্ধুত্ব লাভের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল, কিন্তু জাতিসংঘের নীতি এবং গণতন্ত্র ও জনমতের প্রভাবে ইথিওপিয়ার উপর ইতালীর নির্লজ্জ আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে এবং খোলাখুলি ভাবে সমর্থন করতে পারে নি। তা ছাড়া আফ্রিকা

1. বৃটেন ফ্রান্সের এই নীতি সফল হয় নি কারণ ইথিওপিয়ার যুদ্ধের পর থেকেই ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

এবং ভূমধ্যসাগরের উপর ইতালীর শক্তি বৃদ্ধি বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না। তাই বৃটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনীকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থনও করে না, আবার কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে তার বিরোধিতাও করতে পারে না। এই কারণেই জাতিসংঘের নীতিও ছিল দুর্বল এবং দ্বিধাগ্রস্ত। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য না হওয়ায় জাতিসংঘের অসুবিধা ও দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিধাহীনভাবে ইতালীর আক্রমণাত্মক নীতির বিরোধিতা করলেও পশ্চিমী শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জাতি-সংঘের নীতিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া ইতালীর সাথে অর্থ নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখা গেল যে তার ফলে কেবল ইতালীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রদেরও যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সব কারণে জাতিসংঘ ইতালীকে আক্রমণকারী বলে অভিহিত করলেও এবং অর্থ নৈতিকভাবে সেই দেশকে অবরোধ করার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বে নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

স্পেনের গৃহ যুদ্ধ এবং অন্যান্য সঙ্কট

1931 খৃষ্টাব্দে স্পেনে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং নতুন সরকার অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে। স্পেনে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় এই নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী কোন গোষ্ঠীই এই সরকারকে সমর্থন করে না। বামপন্থীদের দৃষ্টিতে এই সরকার ছিল রক্ষণশীল আর দক্ষিণপন্থীরা এই সরকারকে অতিবৈপ্লবিক বলে মনে করে। এই অবস্থায় সরকারের মধ্যপন্থা নীতি জনসাধারণের বিশেষ সমর্থন লাভ করতে পারে না। স্পেনে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। 1936 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একজন বামপন্থী পুলিশ অফিসার নিহত হন এবং তারপরেই দক্ষিণপন্থী একজন নেতাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মরোক্কোতে নিযুক্ত স্পেনীয় সেনানায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো দক্ষিণ-পন্থীদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত হলেন। স্পেনের সরকার এই গৃহযুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত ছিল না এবং বাধ্য হয়ে সম্পূর্ণরূপে বামপন্থীদের সাহায্যেই সরকার গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা চেষ্টা করে। 1936 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কেব্যালেরো (Caballero) স্পেনের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। কেব্যালেরো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্পেনে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতপন্থী সরকার স্থাপিত হয়। বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ফ্যাসিবাদেরও সমর্থক ছিলেন। আন্তর্জাতিক পটভূমির জন্য স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপীয় কূটনীতির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

1936 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্পেনে যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাতে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল নগণ্য। সেই গৃহযুদ্ধ আইনতঃ না হলেও কার্যতঃ ইউরোপের সংগ্রামে পরিণত হয়। জার্মানী ও ইতালী বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর সমর্থনে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের বিভিন্ন উপকরণ প্রেরণ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পেনের সরকারকে যথা সম্ভব সাহায্য প্রদানের চেষ্টা করে। ফ্রান্স ও বৃটেন কোন পক্ষেই যোগদান না করে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কোন বিদেশী শক্তি যাতে হস্তক্ষেপ না করে বৃটেন ও ফ্রান্স সেই ধরনের নীতি (Policy of Non-Intervention) গ্রহণ করে এবং জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে লণ্ডনে একটি Non-Intervention Committee স্থাপন করে। ইউরোপের সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্র সহ 27টি দেশ এই নীতি সমর্থন করে। স্পেনের কোন পক্ষই যাতে বিদেশ থেকে কোন সাহায্য না পায় তার ব্যবস্থা করা হ'ল। বিদেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা যাতে স্পেনে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীর জাহাজ স্পেনের উপকূলে পাহারা দিতে থাকে এবং স্থলপথে ফ্রান্স ও পর্তুগালের সাথে স্পেনের সীমান্তরেখাতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য করার জন্য স্পেনে প্রায় 1 লক্ষ ইতালীয় সৈন্য পৌছে গিয়েছিল। তা ছাড়া বৃটেন ও ফ্রান্স এই নীতি মেনে চললেও জার্মানী, ইতালী ও পর্তুগাল কার্যতঃ এই নাতি মেনে চলে না। তার ফলে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর দল বিদেশের সাহায্য লাভ করে, কিন্তু মাদ্রিদ সরকার সমস্ত বৈদেশিক সাহায্য থেকে (কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদূর সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করে) বঞ্চিত হয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের এই নীতি Non-Intervention Policy স্পেনের আইনসম্মত সরকার এবং বিদ্রোহীদের একই পর্যায়ভুক্ত করে

দেখার চেষ্টা করে—কেউ কোন বৈদেশিক সাহায্য পাবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে স্পেনীয় সরকারের বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করার পূর্ণ অধিকার ছিল। স্পেনের সরকার স্বভাবতঃই এই Non-Intervention নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে আবেদন করে কোন ফল হয় না—তখন মাদ্রিদ সরকার জাতিসংঘের কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানায়। জাতিসংঘ এই বিষয়ে কার্যতঃ কিছুই করতে সক্ষম হয় না। 1936 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ Non-Intervention নীতিকেই স্বীকার করে নেয় এবং স্পেনের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তার কর্তব্য শেষ করে। নভেম্বর মাসেই (1936) ইতালী ও জার্মানী জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। স্পেন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের জন্য Non-Intervention Committee চেষ্টা আরম্ভ করে এবং জাতিসংঘের সভাও সেই বিষয়ে 1937 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইতালী ও জার্মানী সৈন্য অপসারণ করতে মোটেই রাজী ছিল না। আংশিক ভাবে সৈন্য অপসারণ করলেও স্পেনে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর কর্তৃত্ব পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জার্মান ও ইতালীয় সৈন্য স্পেন পরিত্যাগ করে না। 1939 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন ও ফ্রান্স ফ্র্যাঙ্কোর সরকারকে স্বীকার করে নেয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে জাতিসংঘের মনোভাব ছিল যে এই সমস্যা স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই জাতিসংঘের কর্তৃত্বাধীনের বাইরে। কিন্তু জার্মানী ও ইতালী জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করার ফলে স্পেনের এই সমস্যা সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে না। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি স্পেনীয় সরকারের আইনসঙ্গত অধিকারকে খর্ব করে এবং জাতিসংঘ সেই নীতিকেই সমর্থন জানায়। আসলে তখন আর জাতিসংঘের পক্ষে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে সেই সময়ে আর কোন ঐক্য না থাকায় জাতিসংঘ তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও পঙ্গু।

1938 খৃষ্টাব্দের মার্চে জার্মান সৈন্য যখন অষ্ট্রিয়াতে প্রবেশ করে তখন জাতিসংঘের কাছে আবেদন করার কোন প্রয়োজনীয়তা কেউ মনে করে নি। ইতালী তখন কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জার্মানীর সাথে বন্ধুত্বের

সূত্রে আবদ্ধ। 1934 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াতে জার্মান প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা যখন দেখা দেয় তখন মুসোলিনী তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু 1938 খৃষ্টাব্দে ইতালী জার্মানীর অভিযানকে সমর্থন করে। ইউরোপীয় রাজনীতির সেই অবস্থায় জাতিসংঘের পক্ষে কার্যকরী কোন ভূমিকা পালন করা আর সম্ভব ছিল না। চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যাও জাতিসংঘে উত্থাপিত হল না। 1938 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী মিউনিক চুক্তি দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে। চেকোস্লোভাকিয়ার যে অংশ মিউনিক চুক্তির পরেও স্বাধীন ছিল জার্মানী ছয় মাসের মধ্যে তা অধিকার করে বসে। জাতিসংঘের উপর কোন রাষ্ট্রের বিন্দুমাত্র বিশ্বাসও তখন নেই। সমবেত ভাবে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের বাইরে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির গভীর সন্দেহ থাকায় সেই সম্মেলন কার্যকরী হয় না। পোল্যাণ্ডের সমস্যা নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু সেই সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করার মত উৎসাহ কোন দেশের ছিল না। হিটলার, মুসোলিনী, জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো এবং জাপানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেও 1939 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের কাউন্সিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করে। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে 1939 খৃষ্টাব্দের 30 নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন ফিনল্যাণ্ড জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানায় এবং 14 ডিসেম্বর Assembly বা সভায় এই সম্বন্ধে আলোচনার পর কাউন্সিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর থেকে জাতিসংঘের অস্তিত্ব আর অনুভব করা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ে জাতিসংঘ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যুদ্ধের পরে জাতিসংঘের স্থানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে এক নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল।

জাতিসংঘের অন্যান্য কার্যাবলী

রাজনৈতিক কাজ ছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক অনেক জনহিতকর কার্যও সম্পাদিত হয়েছে যদিও তা আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। সহস্র সহস্র যুদ্ধবন্দী যাতে নিরাপদে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে তার

জন্য জাতিসংঘ সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছে। তুরস্ক থেকে যে হাজার হাজার গ্রীক ও আর্মেনিয়ান শরণার্থী বিতাড়িত হয় তাদের সাহায্যের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘ নানাভাবে সাহায্য করে এবং গ্রীস, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। রাশিয়া থেকে টাইফাস রোগ যাতে ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। দাসপ্রথা, মানুষকে বেগার পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা, মেয়ে নিয়ে ব্যবসায় ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্যও জাতিসংঘ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। আফিঙের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং শিশু শ্রমিকের জীবন রক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের প্রচেষ্টা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা ছাড়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘের অবদান উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্যও জাতিসংঘ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে এই বিষয়ে কিছু লিখিত না থাকলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে সব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার অনেকগুলির মধ্যেই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার কথা উল্লিখিত ছিল। জাতীয়তাবাদের নীতিতে ইউরোপকে পুনর্গঠন করা হলেও বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বর্তমান ছিল এবং সেই সব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অধিকার স্বীকৃত হয়। সেই সব চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব জাতিসংঘকে প্রদান করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে কাউন্সিলের অনুমতি ব্যতীত সংখ্যালঘুদের অধিকার পরিবর্তন করা যাবে না। সেই সব অধিকার লঙ্ঘিত হলে কাউন্সিলের সদস্যদের সেই প্রশ্ন কাউন্সিলে উত্থাপন করার এবং কাউন্সিলকে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়।

আসলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। কোন অভিযোগ আসার পরে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য কোন কমিটি নিয়োগ করার অধিকার জাতিসংঘের ছিল না। কোন সরকারকে কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করাও জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই জাতিসংঘ এই সব

সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতিসংঘের কার্যে অনেক রাষ্ট্র সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এই বিষয়ে জাতিসংঘকে আরও সক্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়। তার মধ্যে 1921 খৃষ্টাব্দে Gilbert Murray-র প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি Permanent Mandates Commission-এর মত সংখ্যালঘুদের জন্য একটি স্থায়ী কমিশন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সংখ্যালঘু সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে এই কমিশনের সদস্য হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তিনি তার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় না। কাউন্সিল স্থির করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রত্যেকটি আবেদন একটি বিশেষ কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন আবেদনের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মনোনীত আরও দুইজন অথবা চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই সব কমিটি Committees of Three (or Five) নামে পরিচিত। কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য কোন আবেদন সেখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন কিনা তা এই সব কমিটিই স্থির করে। অনেক ক্ষেত্রে কাউন্সিলের কাছে না পাঠিয়ে এই কমিটিই এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে—খুব কম আবেদনই কাউন্সিলের কাছে প্রেরণ করা হয়।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতিসংঘের অবদান এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organization) নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাকে জাতিসংঘের অঙ্গ হিসেবে ধরা যেতে পারে। জাতিসংঘের সদস্যরা এই সংঘের সদস্য ছিল এবং জাতিসংঘের অর্থ দিয়েই এই সংঘের কার্য পরিচালিত হত। তবে জাতিসংঘের সদস্য না হয়েও শ্রমিক সংঘের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও জাতিসংঘে যোগদান করে নি, কিন্তু 1934 খৃষ্টাব্দে শ্রমিক সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে যে সব রাষ্ট্র জাতিসংঘ ছেড়ে চলে যায় তারা শ্রমিক সংঘ পরিত্যাগ করে না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সদস্যরাই এই প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করত। সাধারণ অধিবেশন (General Conference), কার্যকরী সমিতি (Governing Body), এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস (International Labour Office) দ্বারা এই সংঘের কার্য পরিচালিত হত। বৎসরে একবার সাধারণ

অধিবেশন আহ্বান করা হত এবং প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র এই অধিবেশনে চারজন প্রতিনিধি প্রেরণ করত—একজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি, একজন শিল্পপতিদের প্রতিনিধি এবং দুইজন সরকারের প্রতিনিধি। সাধারণ অধিবেশন শ্রমিক সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ব্যাপারে নানা ধরনের মৌলিক নীতি বিভিন্ন জাতীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করত। শ্রমিকরা কত ঘণ্টা কাজ করবে, স্ত্রী-শ্রমিক ও শিশুদের নিয়োগ, তাদের স্বাস্থ্য, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের প্রস্তাব শ্রমিক সংঘ গ্রহণ করে। তার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, আবার অনেকগুলি গৃহীত হয় না। যদিও এই সংঘ সমাজতন্ত্রের আদর্শে গঠিত হয়নি তবুও শ্রমিক শ্রেণী এই প্রতিষ্ঠান থেকে যে নেতৃত্ব লাভ করে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রমিক সংঘের কার্যকরী সমিতি (Governing Body) 32 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তাঁরা তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হতেন এবং তাঁরা একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করতেন। কার্যকরী সমিতি দ্বারা সাধারণ অধিবেশনের কার্যসূচী স্থিরীকৃত হত এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিসের ডিরেক্টর নিযুক্ত হতেন। জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে প্রায় 400 জন লোক এই অফিসের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান নগরে এই অফিসের শাখা খোলা হয়। এই অফিসের প্রধান কর্মকর্তাকে Director বলা হত এবং পূর্বেই বলা হয়েছে যে কার্যকরী সমিতি (Governing Body) দ্বারা তিনি নিযুক্ত হতেন। অফিসের অন্যান্য কর্মচারীকে Director নিজেই নিযুক্ত করতেন। শ্রমিক সমস্যা নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন সরকার ও নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করা ছিল এই অফিসের অন্যতম কাজ।

জাতিসংঘের মূল্যায়ন

পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘের উপর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। জাপান, ইতালী এবং জার্মানীর আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র নীতি জাতিসংঘ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের বিলোপ ঘটে। জাতিসংঘের মূল্যায়নের সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে একমাত্র আন্তর্জাতিক

রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক সংঘের সাফল্য অসাফল্য বিচার করা সম্ভব। বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েই জাতিসংঘ গঠিত হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর জাতিসংঘের কোন কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নি—বিশ্বরাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করা জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখাই ছিল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেবলমাত্র জাতিসংঘের উপর নির্ভরশীল ছিল না—বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির, নীতির উপর তা নির্ভর করত। বৃহৎ শক্তিগুলির নীতি স্বভাবতঃই জাতীয় স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের সাথে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সামঞ্জস্য স্থাপনে অনেক রাষ্ট্রই ব্যর্থ হ'ল। জাতিসংঘ স্থাপিত হওয়ার পরে বিভিন্ন দেশে একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়। জাতিসংঘের কার্যপদ্ধতি ছিল মোটামুটি ভাবে গণতন্ত্রসম্মত—তাই একনায়কত্বের আদর্শ ও কর্মপন্থার সাথে তার কোন মিল ছিল না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তির আদর্শের প্রতি ফ্যাসিবাদের কোন বিশ্বাসই ছিল না। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি এবং জঙ্গী মনোভাব জাতিসংঘের আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইতালীর ইথিওপিয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মানী ও ইতালীর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনার ফলেই জাতিসংঘ বিশেষ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেশগুলি সামরিক বল প্রয়োগ করে এই সব আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না। সেই অবস্থায় জাতিসংঘের পক্ষে শান্তি বজায় রাখার কার্যকরী কোন পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে অবিশ্বাস, ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দ্বারাও জাতিসংঘের আদর্শ ব্যাহত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথমে জাতিসংঘে গ্রহণ করা হল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করে। সিনেটের বিরোধিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও জাতিসংঘের সদস্য হওয়া সম্ভব হল না। পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কখনও একই সঙ্গে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও সদস্য হয় নি। 1925 খৃষ্টাব্দে জার্মানী এবং 1934 খৃষ্টাব্দে রাশিয়া জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হল কিন্তু শীঘ্রই জাপান,

জার্মানী ও ইতালী জাতিসংঘ ত্যাগ করে চলে যায়। বৃহৎ শক্তিগুলি একই সাথে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত না থাকায় জাতিসংঘের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় সেই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইতালী-ইথিওপিয়া যুদ্ধে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতিসংঘের কাউন্সিলকে সকলের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত এবং তার ফলে অনেক সময়ই কাউন্সিলের পক্ষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। সেই সময়ে কোন রাষ্ট্র কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কাউন্সিলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত ছিল না।

তাই জাতিসংঘের মূল্যায়নের সময় জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা অন্যায় হবে। জাতিসংঘের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ—জটিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত পৃথিবীতেও জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিবাদের মীমাংসার প্রয়োজন সম্বন্ধে মানবসমাজকে সচেতন করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে জাতিসংঘ বিলুপ্ত হলেও জাতিসংঘের আদর্শেই আবার যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গড়ে তোলা হয়। জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই যে বর্তমান যুগের নানাবিধ আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান নিহিত আছে এটা তারই স্বীকৃতি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনহিতকর অন্যান্য যে সব কার্যাবলী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে ইতিপূর্বে আর কোন প্রতিষ্ঠান তা কখনও করতে পারে নি। অতএব জাতিসংঘ সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তা মনে করার কোন কারণ নেই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তা আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে জাতিসংঘ স্বভাবতঃই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অনুরূপ একটি আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations Organization. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাতে এই কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে না পারলে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই আন্তর্জাতিক সংগঠনের গুরুত্ব সমস্ত দেশই উপলব্ধি করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের জন্য যে চার্টার (Chartar) বা সনদ রচিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে ভবিষ্যৎ মানব জাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করাই জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইন যাতে প্রত্যেক দেশ মেনে চলে এবং প্রত্যেক দেশে সামাজিক উন্নতি এবং জীবনধারণের মান যাতে বর্ধিত হয় তার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাও এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। ছোট বড় সব দেশ যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারে এবং কোন মানুষই যাতে মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখাও জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র পরস্পরের সাথে প্রতিবেশী সুলভ সহযোগিতার মনোবৃত্তি গ্রহণ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে সমবেত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সঙ্কল্প জাতিপুঞ্জের সনদে ঘোষণা করা হয়। তা ছাড়া সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কথাও সেখানে বলা আছে।

সনদের 1 নং ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 4টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

(ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ;

(খ) প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে এবং সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা ;

(গ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ সমাধান করা এবং প্রত্যেকে যাতে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

(ঘ) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই মিত্রশক্তি এই সব আদর্শের কথা ঘোষণা করতে আরম্ভ করে। 1941 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটি জাহাজে যুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক আদর্শ সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা হয়। এই সব আলোচনার পর আটলাণ্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে একটি সনদ প্রচারিত হয়। সেই সনদে যে সব আদর্শের কথা বলা হয়েছিল তার ভিত্তিতেই পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গঠন করা হয়। 1943 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ মস্কোতে মিলিত হয়ে যুগ্ম ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহার Moscow Declaration নামে পরিচিত। সেই ঘোষণা পত্রে শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের কথা বলা হয়। সেই বৎসরের (1943) ডিসেম্বরে রুজভেল্ট, ষ্টালিন ও চার্চিল তেহরাণে মিলিত হয়ে যে ঘোষণাপত্র (Teheran Declaration) প্রচার করেন তাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় পৃথিবী থেকে অত্যাচার, অসহিষ্ণুতা ও দাসত্ব দূর করে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সংকল্প প্রকাশিত হয়। 1944 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও চীনের প্রতিনিধিবর্গ ওয়াশিংটনের কাছে ডাম্বার্টন ওকস (Dumberton Oaks) নামক স্থানে একত্র হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। পরের বৎসর (1945) ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিমিয়ার ইয়েণ্টাতে রুজভেল্ট, ষ্ট্যালিন ও চার্চিল এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র নিয়ে আরও আলাপ আলোচনা করেন। অবশেষে 1945 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সানফ্র্যান্সিসকো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন আহ্বান করা হল। এই সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হয় এবং সেই সনদে তখন 55টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর প্রদান করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন পদ্ধতি :

ছয়টি প্রধান সংস্থা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গঠন করা হয়েছে। সেগুলি হল :

(ক) সাধারণ সভা (General Assembly)

(খ) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

(গ) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)

(ঘ) অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

(ঙ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

(চ) মহাসচিব (Secretary General)-এর পরিচালনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তর (Secretariat)

এই সমস্ত বিভিন্ন সংস্থার গঠন পদ্ধতি ও কার্যাবলী নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

সাধারণ সভা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের চতুর্থ অধ্যায়ে সাধারণ সভার গঠন পদ্ধতি ও ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যের প্রতিনিধি নিয়েই এই সাধারণ সভা গঠিত। কোন রাষ্ট্র পাঁচ জনের বেশী প্রতিনিধি এই সভায় প্রেরণ করতে পারে না এবং ভোটের সময় একটি রাষ্ট্র একটি মাত্র ভোট দেওয়ার অধিকারী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে এখানে আলোচনা হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে নিরস্ত্রী-করণ এবং অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা হতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদে উল্লিখিত যে কোন বিষয় নিয়ে এই সভা আলোচনা করতে পারে এবং নিজস্ব মতামত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রদের কাছে বা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অথবা উভয়ের নিকটই প্রেরণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য রাষ্ট্র অথবা জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন বিষয় সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সভা সেই বিষয়ে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে অথবা নিরাপত্তা পরিষদকে অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ প্রেরণ করতে পারে। সাধারণ সভা যদি মনে

করে যে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে সেই অবস্থার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সাধারণ সভা তার নিজস্ব মতামত সুপারিশ করতে পারে। তবে কোন বিবাদ বা কোন বিষয় যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকে তবে সেই বিবাদ বা বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ ব্যতীত কোন সুপারিশ প্রেরণ করতে পারে না। সাধারণ সভা যদি মনে করে যে কোন বিশেষ অবস্থা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে তবে এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে থাকে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর করা, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতি সাধন ও তাকে সুসংহত করা এবং প্রত্যেক মানুষ যাতে মানব অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা সাধারণ সভার বিশেষ দায়িত্ব। এই সব সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য সাধারণ সভা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং সুপারিশ প্রেরণ করতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে সাধারণ সভায় আলোচনা হয়। সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাজেট আলোচনা ও পাশ করে এবং জাতিপুঞ্জের খরচ বাবদ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হবে তাও সাধারণ সভা স্থির করে। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য এবং অছি পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

প্রতি বৎসর সাধারণ সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রয়োজন হ'লে যে কোন সময় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যায়। নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধে মহাসচিব সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন করতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য সাধারণ সভা একজন সভাপতি নির্বাচিত করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গ্রহণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন,

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নির্বাচন, অছি পরিষদের কিছুসংখ্যক সদস্যের নির্বাচন ('অছি পরিষদ' দ্রষ্টব্য), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভেতর নয়। সদস্যকে গ্রহণ করা, কোন সদস্যের বহিষ্কারকরণ, বাজেট সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের সাধারণ ভোটাধিক্যে গ্রহণ করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহকে সমিতি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। জাতিপুঞ্জের 11 জন সদস্য নিয়ে প্রথমে এই পরিষদ গঠিত হয়। এই 11 জন সদস্যের মধ্যে 5টি দেশ স্থায়ী ভাবে সদস্য থাকে এবং অপর 6টি সদস্যরাষ্ট্রকে 2 বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। অস্থায়ী সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের সময় 3 জন সদস্য 1 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। তার ফলে প্রতি বৎসরই তিন জন অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বিদায় নেয় এবং তিনজন নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়। যে সদস্য রাষ্ট্র বিদায় নেয় সেই বৎসরই সেই রাষ্ট্র আবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন (চিয়েংকাইশেকের চীন)—প্রথমে এই 5টি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরূপে গৃহীত হয়। পরে কম্যুনিস্ট চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদেও কম্যুনিস্ট চীনকেই স্থায়ী সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের প্রত্যেককে ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই পাঁচজন সদস্যের যে কেউ নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে। অর্থাৎ পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের সম্মতি ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 1966 খৃষ্টাব্দে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ছয় জনের স্থানে দশ জন করা হয়। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা 15 জন—5 জন স্থায়ী, 10 জন অস্থায়ী। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র একজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট আছে। এই পরিষদ যাতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এখানে স্থায়ী ভাবে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখে। নিয়মিত ভাবে নিরাপত্তা

পরিষদের অধিবেশন বসে এবং যে কোন সদস্য রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে সেই সব অধিবেশনে কোন মন্ত্রী বা বিশেষ কোন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করতে পারে। কাজের সুবিধার জন্য যে কোন স্থানে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। এই পরিষদ নিজের কার্যপদ্ধতি বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করে থাকে এবং প্রয়োজন মত পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করতে পারে।

কোন সমস্যা আলোচনার সময় নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এমন কোন সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থ সেই সমস্যার সাথে বিশেষভাবে জড়িত তবে পরিষদের সেই আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সেই রাষ্ট্রকে যোগদান করার অধিকার দেওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন কোন আন্তর্জাতিক বিরোধে যদি এমন রাষ্ট্র জড়িত থাকে যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যও নয় তবে সেই বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনার সময় সেই ধরনের রাষ্ট্রকে আলোচনায় যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়। তবে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটের অধিকার কখনও দেওয়া হয় না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব এই পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই পরিষদকে অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর ধনসম্পদ যাতে অস্ত্রসজ্জায় বেশী ব্যবহৃত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম কর্তব্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 33 নং ধারায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন বিরোধ উপস্থিত হ'লে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি প্রথমতঃ আলাপ আলোচনা, তদন্ত, মধ্যস্থতা, সালিশী অথবা বিচারালয়ের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই বিরোধ মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা করবে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন বোধ করলে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে উপরিউক্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে অনুরোধ জানাবে। কোন একটি বিশেষ বিরোধ বা পরিস্থিতি দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেই সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ তদন্ত করতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে এমন বিরোধ উপস্থিত

হ'লে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যে কোন সময় সুপারিশ করতে পারে। সেই ধরনের সুপারিশ করার সময় বিবদমান রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য যদি কোন পদ্ধতি পূর্বেই অবলম্বন করে থাকে তবে তা নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্যই বিবেচনা করবে। আইনগত বিরোধ যাতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সাহায্যে মীমাংসিত হয় নিরাপত্তা পরিষদ সেই দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখে। বিবদমান রাষ্ট্রগুলি যদি আলাপ আলোচনা, তদন্ত, মধ্যস্থতা, বিচারালয় ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির সাহায্যে তাদের বিরোধ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আবেদন জানাতে পারে (সনদের 37 নং ধারা)। নিরাপত্তা পরিষদ তখন সেই বিশেষ বিরোধ মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করে (সনদের 38 নং ধারা)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কোন সদস্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক কোন বিরোধ বা পরিস্থিতির দিকে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে (সনদের 35 নং ধারা)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের সাথে যদি অন্য দেশের কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে জাতিপুঞ্জের সদস্য না হয়েও সেই রাষ্ট্র উক্ত বিরোধের দিকে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তবে সেই রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদে উল্লিখিত শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধ মীমাংসার নীতিগুলি মেনে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হলে অথবা এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ আক্রান্ত হ'লে এই পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা সনদের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে। অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে তার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমতঃ বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে সাময়িক ভাবে কতগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে (সনদের 40 নং ধারা)। সেই সব সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোন রাষ্ট্র যদি অস্বীকার করে তবে সামরিক বল প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার চেষ্টা হয় এবং সেই কাজে নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা দাবী করতে পারে। পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, রেলপথ, সমুদ্রপথ, আকাশপথ, ডাক, টেলিগ্রাম, রেডিও ইত্যাদি যোগাযোগ সাধনের

এবং সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যমগুলি বন্ধ করে দেওয়া, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা—আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা পরিষদ আহ্বান জানাতে পারে (সনদের 41 নং ধারা)। নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে এই সব ব্যবস্থা আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট নয় অথবা এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও যদি দেখা যায় যে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সম্ভব হ'ল না তখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে (সনদের 42 নং ধারা)। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করতে সনদের 43 নং ধারা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে। সনদের 46 নং ধারায় বলা হয়েছে যে সামরিক বল প্রয়োগ করার সময় নিরাপত্তা পরিষদ Military Staff Committee-র সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরা নিজের প্রচেষ্টায় বা বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। অবশ্য সেই সব ব্যবস্থার বিবরণ নিরাপত্তা পরিষদকে অবিলম্বে জানাতে হয়।

অছি পরিষদের ব্যাপারেও নিরাপত্তা পরিষদকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যদিও এই বিষয়ে সাধারণ সভার ক্ষমতাই বেশী। সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান সমূহের উপর (Strategic areas) এবং অছিবিষয়ক চুক্তি অনুমোদন ও উহার পরিবর্তন করা ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে এবং প্রয়োজন হ'লে বিশেষ রিপোর্টও পেশ করতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপন করতে হ'লে কতগুলি মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার

সমাধান করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য স্থির হয় যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিম্নলিখিত আদর্শগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবে :

(ক) উন্নত জীবনমান, বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি ;

(খ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় এবং এই ধরনের অন্যান্য সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন ;

(গ) সমস্ত মানুষ যাতে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি।

এই সব আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব সাধারণ সভার উপরই দেওয়া হয়েছে, তবে সাধারণ সভাকে এই ধরনের কাজে সাহায্য করার জন্য সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের দশম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 18টি সদস্যরাষ্ট্র দ্বারা এই পরিষদ গঠিত। সাধারণ সভা দ্বারা এই সদস্যরাষ্ট্র-সমূহ 3 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয় এবং প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র একজন করে প্রতিনিধি এই পরিষদে প্রেরণ করে। প্রথম যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হয় তখন সনদের 61 নং ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 6 জন সদস্য 1 বৎসরের জন্য, 6 জন 2 বৎসরের জন্য এবং বাকী 6 জন 3 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। তার ফলে প্রতি বৎসর এই পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় নেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়। বিদায়ী রাষ্ট্র পুনরায় নির্বাচিত হতে পারে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট আছে এবং সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাধিক্যের ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদের কোন আলোচনার সাথে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এমন কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে এই পরিষদের সদস্য নয় তবে সেই রাষ্ট্রকে সেই আলোচনায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। অবশ্য সেই রাষ্ট্রকে ভোটের কোন অধিকার দেওয়া হয় না (সনদের 69 নং ধারা)।

এই পরিষদ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক,

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এই ধরনের সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের নিকট অথবা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে পারে। প্রত্যেকেই যাতে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে এই পরিষদ নিজস্ব সুপারিশ জাতিপুঞ্জকে জানাতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার নিজের কার্যাবলী সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারে এবং প্রয়োজন হ'লে তার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে বিভিন্ন চুক্তিপত্রের খসড়া (draft convention) প্রস্তুত করে সাধারণ সভার কাছে প্রেরণ করতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকার একত্র হয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অথবা এই ধরনের কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি স্থাপন করে তবে এই পরিষদ সেই সব সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে সেই সব সংস্থার একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এই ধরনের চুক্তির জন্য সাধারণ সভার অনুমোদন প্রয়োজন। এই ভাবে বিভিন্ন সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : আন্তর্জাতিক পরমাণুশক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency—IAEA), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (Internatinal Labour Organization—ILO), খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (Food and Agricultural Organization—FAO), ইউনাইটেড ন্যাশনস্ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization—UNESCO), আন্তর্জাতিক বে-সামরিক বিমান সংগঠন (International Civil Aviation Organization—ICAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization—WHO), পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development—Bank), আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা International Finance Corporation—IFC), আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund—Fund), বিশ্ব ডাক সংগঠন (Universal Postal Union—UPU), আন্তর্জাতিক টেলি-সংযোগ সংস্থা (International Tele-Communication Union—ITU)। এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা এই পরিষদের

অন্যতম কার্য। বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরামর্শ করে এবং সাধারণ সভা ও সংস্থাগুলির কাছে বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করে পরিষদ তাদের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করে। পরিষদ এইসব সংস্থা থেকে নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে এবং সেই সব রিপোর্টের উপর পরিষদ তার নিজের মন্তব্য সাধারণ সভার কাছে প্রেরণ করতে পারে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রয়োজন মত নিরাপত্তা পরিষদকে নানা বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে এবং নিরাপত্তা পরিষদকে বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। সাধারণ সভার সুপারিশ অনুযায়ী এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সদস্য অথবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুরোধ ক্রমে এই পরিষদ এই ধরনের আরও অনেক কাজ করে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন রকমের—যেমন অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, মানবিক অধিকার স্থাপন সংক্রান্ত—কমিশন স্থাপন করতে পারে।

এই পরিষদের কোন আলোচনায় অথবা এই পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন কমিশনের আলোচনায় প্রয়োজন হ'লে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কোন বিশেষ সংস্থা বা specialized agencyর প্রতিনিধিরা যোগদান করতে পারে এবং specialized agency সমূহের কোন বিশেষ আলোচনায় পরিষদের প্রতিনিধিরাও যোগ দিতে পারে। এই ভাবে যে সব প্রতিনিধি আলোচনায় যোগদান করে তাদের ভোটের কোন অধিকার থাকে না।

অর্থ নৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি যে সব বিষয় নিয়ে এই পরিষদ কাজ করে সেই সব বিষয়ে বে-সরকারী পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথেও অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সাথে পরামর্শ করার ব্যবস্থা করতে পারে। ইণ্টারন্যাশন্যাল চেম্বার্স অফ কমার্স, ইণ্টারন্যাশন্যাল কনফেডারেশন অফ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস্, রটারি ইণ্টারন্যাশন্যাল, স্যালভেশন আর্মি প্রমুখ এক হাজারেরও বেশী এই ধরনের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ পরামর্শ করে থাকে। পরিষদ এবং পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কমিশনের আলোচনায় এই সব প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে।

দেখে। অছি অঞ্চলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য অছি পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে সেই অঞ্চলে পর্যবেক্ষক প্রেরণ করতে পারে। অছি অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নতি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে অছি পরিষদ কতকগুলি প্রশ্ন তৈরী করে সেই সব অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং অছি অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষ সেই সব প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট প্রতি বৎসর সাধারণ সভার কাছে পেশ করে।

অছি পরিষদ প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অথবা অন্য কোন বিশেষ সংস্থা (specialized agency)-র সাহায্য নিতে পারে।

অছি পরিষদ সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তবে অছি অঞ্চলের যে সব অংশকে সাময়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই সব অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশ বা 'কলোনী'র উপর অছি পরিষদের আধিপত্য স্বীকৃত হয় নি। জাতিসংঘের কর্তৃত্বাধীনে যে সব ম্যাণ্ডেট অঞ্চল ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিজিত অক্ষ শক্তির অধিকার থেকে যে সব অঞ্চল মুক্ত করা হয় সেই সব অঞ্চলের উপরই অছি পরিষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া সনদের 77 (গ) ধারায় উল্লেখ আছে যে কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তাদের অধিকৃত কোন অঞ্চলের শাসনভার অছি পরিষদের হাতে সমর্পণ করতে পারে। যে সব অঞ্চলে অছি পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হ'ল তার লোকসংখ্যা মাত্র 2 কোটি। পরাধীন দেশ বা 'কলোনী'র অধিকাংশই ছিল অছি পরিষদের কর্তৃত্বের বাইরে—এই ধরনের দেশের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 17 কোটি। স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত এই সমস্ত দেশের উপরেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্ব কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হয়েছে এবং সনদের একাদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্ব কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হয়েছে এবং সনদের একাদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সব সদস্য-রাষ্ট্র এই ধরনের অঞ্চল শাসন করে তারা সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই তাদের শাসন কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করবে। তারা সেই সব অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দেখিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত

উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। জনসাধারণের রাজনৈতিক উন্নতি ও অবস্থা বিবেচনা করে সেই সব অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাও সেখানে বলা হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে এবং যখন সম্ভব হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশেষ সংস্থার (specialized international agency) সাহায্য নিয়ে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের উন্নতির জন্য বাস্তব ও গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও তারা স্বীকৃত হয়। এই সব রাষ্ট্র তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নতি সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের নিকট নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রেরণ করতে রাজী হয়।

যে সব অঞ্চল এখনও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারে নি সেই সব অঞ্চলের উন্নতি সাধনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের একাদশ অধ্যায়ে এই সব কথার উল্লেখ থাকলেও এই সব আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয় নি। তা ছাড়া এই একাদশ অধ্যায় পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ এখনও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারেনি বলে স্পষ্টত কোন্ সব অঞ্চলকে গণ্য করা হবে সেই বিষয়ে সনদে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। এইসব অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষকে মহাসচিবের কাছে নিয়মিত ভাবে সংবাদ প্রেরণ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। সাধারণ সভা এই বিষয়ে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করলেও সেই সব অঞ্চলের শাসক রাষ্ট্রসমূহ সব সময়ই তার বিরোধিতা করে এসেছে। তবুও এই ব্যবস্থার মূল্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন 'কলোনী'র শাসন কার্য সম্বন্ধে সংবাদ গৃহীত হলে তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব এবং অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সেই সব অঞ্চলের উন্নতি দ্রুততর করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court of International Justice) গঠিত হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ নিয়ে আলাপ আলোচনা যখন শুরু হয় তখন এই ধরনের একটি বিশ্ব বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার

করেন। তখন প্রশ্ন উঠেছিল—পুরাতন বিচারালয়কেই (অর্থাৎ Permanent Court of International Justice) বাঁচিয়ে রাখা হবে কিংবা নতুন করে একটি বিশ্ব বিচারালয় সৃষ্টি করা হবে। সানফ্র্যান্সিসকো সম্মেলনে স্থির হয় যে বিশ্ব বিচারালয়কে নতুন করেই গঠন করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিচারালয়কে রাখতে হ'লে তাকে নতুন করে গড়া উচিত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের (Permanent Court of International Justice) সদস্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে পুরাতন বিচারালয়ের আদর্শেই একটি নতুন বিচারালয় গড়ে তুলতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের চতুর্দশ অধ্যায়ে এই বিচারালয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই বিচারালয়ের সংবিধান বা statute পুরাতন স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধান বা statute-এর উপর নির্ভর করেই রচনা করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রের সকলেই এই বিচারালয়ের সদস্য। যে সব রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় তারাও এই বিচারালয়ের সদস্য হতে পারে। এই ধরনের কোন রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে ভর্তি করার শর্তসমূহ নিরপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা স্থির করবে। এই বিচারালয়ের কোন মামলায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য যদি সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে সেই রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের বিচার মেনে নিতে বাধ্য (সনদের 94 নং ধারা)। এই বিচারালয়ের বিচার যদি কোন এক পক্ষ মেনে নিতে রাজী না হয় তবে অন্য পক্ষ তা নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে পারে এবং তখন সেই বিচারকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে (সনদের 94 নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরা এই বিচারালয় ছাড়া অন্য কোন আদালত বা tribunal-এর মাধ্যমেও তাদের মতবিরোধ মীমাংসা করার চেষ্টা করতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে এই ধরনের tribunal সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদ আইনগত কোন প্রশ্নে এই বিচারালয়কে পরামর্শ ও মতামত (advisory opinion) দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (organs) এবং বিশেষ সংস্থাসমূহ (specialized agencies) সাধারণ সভার অনুমতি

নিয়ে আইনগত প্রশ্নে এই বিচারালয়ের মতামত পরামর্শ হিসেবে চাইতে পারে।

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শ ও অভিমত কেবলমাত্র আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় আন্তর্জাতিক আদালতের পরামর্শ ও মতামত কেবলমাত্র আইন সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। জাতিসংঘের স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় অষ্ট্রিয়া-জার্মানীর শুল্ক সংগঠন (Austrc-German Customs Union) সম্বন্ধে যে মতামত প্রদান করে[1] তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে অনেকের মনে হয়েছিল। তার ফলে সেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মর্যাদা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া সমস্যা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের অভিমত জানার জন্য একবার প্রস্তাব করে কিন্তু সেই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা এবং প্যালেষ্টাইন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের মতামত জানার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লে সাধারণ সভায় তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মোট 15 জন বিচাপতি থাকেন তবে কোন একটি রাষ্ট্র থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা চলে না। যাঁরা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক নিযুক্ত হবেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার মত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে বিচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাই আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। Permanent Court of Arbitration কর্তৃক রচিত একটি নামের তালিকা থেকে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ বিচারপতিদের নির্বাচিত করে। Permanent Court of Arbitrationএর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতীয় প্রতিনিধি দল অনধিক 4 জন বিচারকের নাম তালিকাবদ্ধ করতে পারে এবং সেই 4 জনের মধ্যে 2 জনের বেশী তাদের নিজেদের দেশের লোক হতে পারবে না। যে রাষ্ট্র এই Court-এর সদস্য নয় তারাও বিচারকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব (Secretary General) সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদে সেই নামের তালিকা পাঠিয়ে দেন এবং সেই

1. জাতিসংঘের 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা' সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তালিকা থেকে উক্ত সভা ও পরিষদ পৃথক ভাবে গোপন ভোটের মাধ্যমে বিচারকদের নির্বাচিত করে। নির্বাচিত হতে হলে একজন বিচারককে অধিকাংশের ভোট পেতে হয়। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রকেই ভিটো প্রয়োগের কোন অধিকার দেওয়া হয়নি। বিচারকগণ 9 বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি বৎসর পরে এক-তৃতীয়াংশ বিচারক অবসর গ্রহণ করেন এবং তাদের স্থানে নতুন বিচারক নির্বাচিত হন। বিচারালয় যখন প্রথম গঠিত হয় তখন কোন্ কোন্ বিচারক 3 বৎসর পরে এবং কারা 6 বৎসর পরে বিদায় নেবেন তা লটারি করে স্থির করা হয়। তারপর থেকে প্রত্যেক বিচারকই 9 বৎসর কার্যে নিযুক্ত থাকেন। বিচারকরা কোন রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন না, ব্যক্তিগত গুণেই নির্বাচিত হন। কিন্তু এই বিচারালয় যখন কোন বিষয় নিয়ে বিচার করে তখন সে সব রাষ্ট্র সেই বিচারে সংশ্লিষ্ট আছে সেই সব প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন বিচারপতি এই বিচারালয়ে থাকার নিয়ম আছে। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিচারের সময় অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হয়। সেই বিচার শেষ হয়ে গেলে তারা আর আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক থাকেন না। এই নিয়মকে অনেকেই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতির অনুকূল মনে করেন না।

জাতিসংঘের স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের (Permanent Court of International Justice) মত এই বিচারালয়ও হল্যাণ্ডে হেগ নগরীতে অবস্থিত।

এই বিচারালয়ের বিচার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘের স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার ক্ষমতার অনুরূপ। রাজ্যের সরকারই এই বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হতে পারে—কোন ব্যক্তিবিশেষ পারে না। কোন বিবাদ উপস্থিত হলে দুই পক্ষই যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সেই বিবাদ উত্থাপন করতে এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয় তবেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে তার বিচার হতে পারে। যে কোন এক পক্ষ কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত করতে পারে যদি সেই বিষয়ে অন্য পক্ষের সাথে পূর্বেই চুক্তি করা হয়ে থাকে। আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে পারে যদি উভয় পক্ষই পূর্ব থেকে সেই ধরনের বিবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়। কোন রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত সেই

রাষ্ট্রকে কোন ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হ'তে বাধ্য করা যায় না। কোন বিবাদ আরম্ভ হওয়ার পরে উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় সেই বিচারালয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত করতে পারে অথবা কোন বিবাদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তারা সেই মর্মে নিজেদের ভেতর চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

আইন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় সমস্ত রাষ্ট্র যাতে আন্তর্জাতিক বিচারলয়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয় সেই উদ্দেশ্যে অনেকে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে আইন সংক্রান্ত বিবাদের কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় এই বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা স্বীকার করে নিতে পারে (optional clause)। কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এই ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু অনেকেই এই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নানাধরনের শর্ত আরোপ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1946 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই বিশেষ ধরনের আইন সংক্রান্ত বিবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়, কিন্তু তা স্বীকার করতে গিয়ে যে সব শর্ত আরোপ করে তাতে বিচারালয়ের এই ক্ষমতা প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শর্তগুলি হ'ল :

(ক) যে সব বিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে মনে করবে সেই সব বিবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা থাকবে না ;

(খ) যে সব বিবাদ কোন চুক্তি অনুযায়ী অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে মীমাংসা করার ব্যবস্থা থাকবে সেই সব বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা স্বীকৃত হবে না ;

(গ) দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত কোন চুক্তি সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হ'লে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রের সম্মতি না থাকলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সেই সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা থাকবে না। এই ধরনের ব্যাপক শর্ত আরোপ করার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতা ও গুরুত্ব খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। আসলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এমন কোন ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে রাজী নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 36 নং ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিরোধগুলি যাতে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত হয়, নিরাপত্তা পরিষদ সেই বিষয়ে চেষ্টা

করবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে রাজনৈতিক কারণে যে সব বিবাদ ও মতবিরোধ উপস্থিত হয় সেই ধরণের বিবাদ মীমাংসা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে হওয়া কঠিন। কোন রাষ্ট্রই এই রকম বিরোধের মীমাংসার ভার সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের হাতে তুলে দিতে রাজী হবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদকে ব্যাখ্যা করার চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে প্রদান করা হয় নি। জাতিপুঞ্জের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সনদের যে অংশ দ্বারা তাদের কার্য ও ক্ষমতা স্থিরীকৃত হয়েছে সেই সব অংশ ব্যাখ্যা করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অথবা বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে সনদের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ উপস্থিত হ'লে সাধারণ সভা অথবা নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে পরামর্শ হিসেবে তার মতামত জানাতে অনুরোধ করতে পারে অথবা আইনজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারে। তবে কোন কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েকবার আন্তর্জাতিক বিচারালয় সনদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নতুন রাষ্ট্রকে গ্রহণ করার ব্যাপারে একাধিকবার আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে তার মতামত পরামর্শ হিসেবে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জে নতুন রাষ্ট্রকে গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। 1948 খৃষ্টাব্দে কতিপয় নতুন রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জে গ্রহণ করার প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে বাধা দেয়। তখন সাধারণ সভা এই মর্মে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মতামত জানতে চায় যে জাতিপুঞ্জে নতুন রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার প্রশ্নে সনদের চতুর্থ ধারায় অনুল্লিখিত কোন শর্ত আইনতঃ কোন সদস্য রাষ্ট্র আরোপ করতে পারে কিনা।[1] বিচারালয় তার মতামত জানিয়ে বলে যে এমন অধিকার আইনতঃ কোন সদস্য রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু বিচারালয়ের এই পরামর্শমূলক অভিমত সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি। 1949 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে এই সংক্রান্ত

1 সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 4 নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অন্য সমস্ত (অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময় যারা সদস্য হয়েছে তারা ছাড়া) শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র এই সনদে উল্লিখিত দায়িত্ব স্বীকার করতে যদি প্রস্তুত থাকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি মনে করে যে তাদের এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা আছে তবে তাদের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ার পথ খোলা থাকবে।

কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। 1904-05 খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে এবং কোরিয়াতে তখন জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 1910 খৃষ্টাব্দে জাপান সম্পূর্ণ ভাবে কোরিয়া অধিকার করে নেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট, চার্চিল, এবং চিয়াং কাই শেক 1943 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে স্থির করেন যে কোরিয়াকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। 1945 খৃষ্টাব্দে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নও কোরিয়া সম্বন্ধে এই নীতি স্বীকার করে নেয়। ঐ বৎসরই অগাষ্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পন করে এবং স্থির হয় যে কোরিয়ার 38° অক্ষাংশ রেখার উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এবং দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করবে। এই ভাবেই কোরিয়া দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং তার ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। কোরিয়ার দুই অংশে ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন মীমাংসায় পৌছতে না পারায় শেষ পর্যন্ত 1947 খৃষ্টাব্দে মার্কিন সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই সমস্যাটি উত্থাপন করে। জাতিপুঞ্জ কোরিয়ার জন্য একটি সাময়িক কমিশন (UN Temporary Commission on Korea—UNTCOK) গঠন করে এবং সেই কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কোরিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠন করার পরিকল্পনা নেয়। উদ্দেশ্য ছিল যে এই ভাবে সমস্ত দেশে একটি সরকার স্থাপন করতে পারলে কোরিয়ার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা এবং কোরিয়া থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং ইউক্রেনিয়ান রিপাবলিকের প্রতিনিধি সাময়িক কমিশন (UNTCOK) যোগ দিতে অস্বীকার করেন। উত্তর কোরিয়াতে এই কমিশনকে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হ'ল না। তাই এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে 10 মে (1948) কেবল মাত্র দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অঞ্চলে আগষ্ট মাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (Republic of Korea) সরকার গঠিত হ'ল। এই দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হলেন সিংম্যান রী (Singhman Rhee)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা তখন কোরিয়ার জন্য একটি নতুন কমিশন (United Nations Commission on Korea—UNCOK) গঠন করে। বিদেশী সৈন্য অপসারণ করে

কোরিয়াকে কি ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে কি ভাবে ঐক্য স্থাপন করা যায় সেই সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করার জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের চেষ্টায় 'গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democr.tic People's Republic) স্থাপিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারিত হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী উত্তর কোরিয়া পরিত্যাগ করে চলে যায়। দুই কোরিয়া স্বাধীন হ'লেও দক্ষিণ অঞ্চল মার্কিন প্রভাবাধীনে এবং উত্তর অঞ্চল সোভিয়েত প্রভাবাধীনে থাকে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চরম তিক্ততায় পরিণত হয়। এমন অবস্থায় 1950 খৃষ্টাব্দের 25 জুন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পরেই মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ফরমোসার (তাইওয়ান) চিয়াং কাইশেক সরকারকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চীনের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করার প্রতিবাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানুয়ারী মাস (1950) থেকে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে। অতএব নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত 'ভিটো'র কোন ভয় তখন ছিল না। 25 জুন নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের দক্ষিণ করিয়া পরিত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ পালিত না হওয়ায় 27 জুন নিরাপত্তা পরিষদ জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগণকে এই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করার জন্য সুপারিশ করে। 7 জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের পরিচালনায় কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান সেনানায়কের নাম ঘোষণা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাক্ আর্থারকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুপস্থিত থাকায় নিরাপত্তা পরিষদে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানই প্রধান, তবে প্রায় 45টি সদস্যরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সুপারিশে সাড়া দিয়েছিল। তার মধ্যে 16টি রাষ্ট্র সৈন্যবাহিনী দিয়ে জাতিপুঞ্জকে সাহায্য করে এবং অন্যান্য দেশ খাদ্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি

প্রেরণ করে। সকল দেশের সমস্ত সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। জাতিসংঘ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে এই প্রথম আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক বল প্রয়োগ করার উদাহরণ। এই বল প্রয়োগ করা হয়েছিল জাতিপুঞ্জ সনদের 39 নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ফলে।

পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয় এবং তীব্র ভাষায় কোরিয়াতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর নিন্দা করে। এর পর থেকে সোভিয়েত ভিটোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তখন সাধারণ সভা Uniting For Peace Resolution অনুযায়ী কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। কোরিয়ার যুদ্ধের প্রথম দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী পরাজিত হলেও সেপ্টেম্বরের (1950) পর উত্তর কোরিয়া দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করে। তখন প্রশ্ন উঠে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী 38° অক্ষাংশরেখা অতিক্রম করে আরও উত্তরে অগ্রসর হবে কি না। 1950 খৃষ্টাব্দের 7 অক্টোবর সাধারণ সভা ঘোষণা করে যে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া স্থাপন করাই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য এবং সেই অনুযায়ী United Nations Commission for Unification and Rehabiliation of Korea (UNCURK) নামে একটি নতুন কমিশন গঠন করা হ'ল। 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করাই যে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করার বিপদ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ জাতিপুঞ্জকে সতর্ক করে দেয়। পিকিং-এ নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করা হ'লে কম্যুনিষ্ট চীন যুদ্ধ যোগদান করতে বাধ্য হবে এবং তার ফলে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। কম্যুনিষ্ট চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। ফরমোসা বা তাইওয়ানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করতে কম্যুনিষ্ট চীন তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠে। জাতিপুঞ্জের বাহিনী 38° অক্ষাংশ অতিক্রম করার পর চীনের সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকের ভয় হয়েছিল যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অবিলম্বে কোরিয়া থেকে চীনের সৈন্য অপসারণ দাবী করে নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবে ভিটো প্রদান করে এবং ভারতবর্ষ ভোট দানে বিরত

থাকে। নিরপত্তা পরিষদের অপর নয় সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেয়। ভারতের নেতৃত্বে 13টি আফ্রোএশীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী 14 ডিসেম্বর (1950) সাধারণ সভা 3জন সদস্য বিশিষ্ট একটি যুদ্ধ বিরতি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ভারতবর্ষ, কানাডা ইরানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটির পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব হয় না। কারণ কম্যুনিষ্টরা এই কমিটির সাথে কোন আলাপ আলোচনা করতে রাজী হয় না। পরে 1951 খৃষ্টাব্দের 2 ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা কম্যুনিষ্ট চীনকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। 44জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, 5জন বিপক্ষে এবং 9জন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ 5টি কম্যুনিষ্ট দেশ ছাড়া ভারত ও ব্রহ্মদেশ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। আফগানিস্তান, ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সুইডেন, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং যুগোস্লাভিয়া কোন পক্ষেই ভোট দেয় না। এদিকে কোরিয়ায় চীনাবাহিনীকে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে প্রায় বিতাড়িত করা হয় এবং জাতিপুঞ্জের অনেক সদস্য রাষ্ট্রই 38° অক্ষাংশ রেখা পুনরায় অতিক্রম করে যাওয়ার পূর্বে এই সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু জেনারেল ম্যাক্ আর্থার চীনের ভূখণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে পদ-চ্যুত করে সেই স্থানে জেনারেল রিজওয়ে (General Ridgway)-কে নিযুক্ত করেন।

1951 খৃষ্টাব্দের মে মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কম্যুনিষ্ট চীনে সমস্ত রকম সমরোপকরণ প্রেরণ করা বন্ধ করে দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক অবরোধ সম্বন্ধে সাধারণ সভার এটাই প্রথম সুপারিশ। জুন মাসে (1951) নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি জেকব মালিক তাঁর বেতার ভাষণে শান্তির কথা বলেন এবং যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করার জন্য আবেদন জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে জেনারেল রিজওয়েকে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রথমে কাইসং এবং পরে পান্‌মুন্‌জনে দুই পক্ষের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা হয় শেষ পর্যন্ত 1953 খৃষ্টাব্দের 27 জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার পথে যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাই

শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বন্দী এমন অনেকে উত্তর কোরিয়ায় ফিরে যেতে রাজী ছিল না বলে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু জুন মাসে (1953) এই বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হল। ভারতের সভাপতিত্বে গঠিত একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী বিনিময়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিশনের সদস্য ছিল পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড। বহু সংগ্রামের পর 38° অক্ষাংশ রেখার লাইন ধরেই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতে বাধ্য হন। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই একটি শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা হবে। 1954 খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে জেনেভা শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই সম্মেলনে কোরিয়ার ঐক্য স্থাপনের প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়।

কাশ্মীর সমস্যা

1947 খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন জম্মু ও কাশ্মীরের মত বিভিন্ন করদ রাজ্যগুলির (Indian Native States) উপরও বৃটিশের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়। সেই সব রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অথবা স্বাধীনতা ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষত্ব হল যে এখানের রাজা ছিলেন হিন্দু কিন্তু অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। এই রাজ্য প্রথম দিকে ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ না সাময়িক ভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য একটি চুক্তিতে (Standstill Agreement) আবদ্ধ হয়। কিন্তু শীঘ্রই পাকিস্তানের দিক থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি ইত্যাদি জিনিষপত্র কাশ্মীরে যাওয়ার পথে নানা রকমের বাধা দেওয়া আরম্ভ হয়। পরে পাকিস্তান থেকে উপজাতীয় দলের হাজার হাজার লোক সশস্ত্র ভাবে কাশ্মীরে প্রবেশ করে গোলযোগ আরম্ভ করে এবং তারা রাজধানী শ্রীনগরের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না এবং সেই কারণে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কাশ্মীর তখনও ভারতে যোগদান না করায় ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষ কাশ্মীরের মহারাজকে সেই সিদ্ধান্ত জানাবার পর কাশ্মীর 1947 খৃষ্টাব্দের 26 অক্টোবর ভারতবর্ষে যোগদান করে। কাশ্মীর ভারতে যোগদান করার পরে ভারতের মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে কাশ্মীরের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর ভারতবর্ষে কাশ্মীরে যোগদান সম্পর্কে কাশ্মীরী জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হবে। এই কথা তিনি রাজনৈতিক কারণেই বলেছিলেন—আইনগত কারণে নয়। 1947 খৃষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে (Indian Independence Act) করদ রাজ্যসমূহের ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার কোন কথা উল্লিখিত নেই।

1948 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 35 নং ধারা অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। কাশ্মীরের উপর উপজাতীয়দের আক্রমণকে নানাভাবে সাহায্য করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—এই ছিল ভারতের অভিযোগ। 20 জানুয়ারী (1948) এই সমস্যা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য (সনদের 34 নং ধারা অনুযায়ী) এবং দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য একটি কমিশন স্থাপন করা হয়। 2 এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য এবং কাশ্মীরে বসবাস করে না এমন সমস্ত উপজাতীয় লোককে কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। পরিষদ স্থির করে যে গোলযোগ বন্ধ হলে কাশ্মীরে ভারতের সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করে আনা হবে—আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত রাখা হবে না। পরে জনসাধারণের ভোট নিয়ে কাশ্মীর ভারতবর্ষে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবে তা স্থির করার ব্যবস্থা হবে। এই গণভোট নেওয়ার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন প্রশাসক (Plebiscite Administrator) নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মহাসচিবকে সেই প্রশাসকের নাম ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হল। নিরাপত্তা পরিষদ উপরি-উক্ত কমিশনকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে গিয়ে সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দেয়। 1948 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই কমিশন ভারতে এসে কাশ্মীরে পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। এই কমিশনের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান 1949 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজী হয়। পরে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর এড্‌মিরাল চেষ্টার নিমিজ (Admiral Chester Nimitz)-কে Plebiscite Administrator হিসেবে নিযুক্ত করেন। গণভোট নেওয়ার পূর্বে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই বিষয়ে কোন ঐক্যমতে পৌছান সম্ভব হয় না। 1949 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কমিশন এই বিষয়ে ব্যর্থতার কথা নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দেয় এবং এই অভিমত প্রকাশ করে যে কোন কমিশনের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রতিনিধির পক্ষে এই বিষয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে। সেই সময় কানাডার জেনারেল ম্যাকনটন (General McNaughton) ছিলেন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি। তিনি নিজে এই বিষয়ে বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের চেষ্টা করে বিফল হন। পরে অষ্ট্রেলিয়া হাইকোর্টের বিচারক Sir Owen Dixon ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তিনিও দুই পক্ষের মধ্যে সৈন্য অপসারণ এবং সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা সম্বন্ধে কোন ঐক্যমত সৃষ্টি করতে পারেন না। 1951 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রেহাম (Dr. Frank Graham)-কে কাশ্মীরে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তিনি দুই পক্ষের সাথে বহু আলোচনা করেও এই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন। কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পরস্পর-বিরোধী। ভারতের দৃষ্টিতে কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং পাকিস্তান সেখানে আক্রমণকারী। কাশ্মীরের প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে সৈন্য মোতায়েন রাখার পূর্ণ অধিকার ভারতের আছে। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়াই প্রধান সমস্যা। এই দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পরিষদ এই সমস্যা সমাধানের জন্য আরও নানাভাবে চেষ্টা করে। 1957 খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিটোর ফলে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন বলেনযে ভারতের ভূখণ্ডে বিদেশী সৈন্য প্রেরণ করার কোন অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেই। পরে 1957 খৃষ্টাব্দে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে সুইডেনের গানার জারিং (Gunnar Jarring) ভারতবর্ষ ও

পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টাও সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়। ভারতবর্ষের প্রধান অভিযোগ ছিল যে পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে তার সৈন্য অপসারণ না করার ফলেই সমস্যা সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে এবং গণভোট গ্রহণ করার মত উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষের দাবী ছিল যে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং পাকিস্তানী সৈন্য কাশ্মীর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত গণভোটের প্রশ্ন তোলা সম্পূর্ণ অবাস্তর। অপর দিকে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপরই পাকিস্তান জোর দেয় এবং কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গ তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাশ্মীরে গণভোট সম্বন্ধে ভারতের ধারণা ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু গণভোটের কথা বলেছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান যখন পশ্চিমী সামরিক জোটের শরিক হয়ে পড়ে তখন তিনি মনে করেন যে সেই নতুন পরিস্থিতিতে গণভোট নেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান তখন ঠাণ্ডা লড়াই (cold war)-তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করছে এবং স্বভাবতঃই পাকিস্তান ও তার বন্ধুরাষ্ট্ররা নিরপেক্ষভাবে কাশ্মীর সমস্যা বিচার না করে আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতেই তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। সেই অবস্থায় গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরে তথা ভারতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে জওহরলাল নেহেরু অসম্মত হন। তা ছাড়া 1954 খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের গণ পরিষদ কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবেই স্বীকার করে নেয়। তারপর থেকে ভারতবর্ষ কাশ্মীরে গণভোটের প্রশ্নকে অবাস্তর বলেই মনে করে।

1957 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে ডঃ গ্রাহাম পুনরায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে এসে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সরকারের কাছে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করেন ভারত সরকার তা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তাঁর প্রস্তাবে কাশ্মীরে গণভোট, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, ডঃ গ্রাহামের মধ্যস্থতায় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ইত্যাদি কথা বলা হয়েছিল। 1957 খৃষ্টাব্দের পর থেকে জাতিপুঞ্জ কাশ্মীরের ব্যাপারে আর নতুন করে বিশেষ কোন প্রস্তাব দেয় নি। 1962 খৃষ্টাব্দে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত ও পাকিস্তানের

মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়, কিন্তু সেই সব আলোচনাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই একটি রাজ্যে পরিণত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভারত ও পাকিস্তান সরাসরি আলোচনা করেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যার আর কোন অস্তিত্ব নেই—কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান তা মেনে নিতে রাজী নয়। 1965 খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান যুদ্ধ করে কাশ্মীর অধিকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো এখনও কাশ্মীর সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি চীনের সমর্থন লাভ করতে সমর্থন হয়েছেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলেও এই কথা অস্বীকার করা উচিত নয় যে নিরাপত্তা পরিষদের চেষ্টার ফলেই সেখানে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর রাজনীতি কাশ্মীর সমস্যাকে জটিল করে তোলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যাপারে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ নিরাশ করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটে যোগদান করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু চীন-ভারত বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব যেখানে বেশী স্বভাবতঃই আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষমতা সেখানে দুর্বল।

চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যা:

1948 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চেকোস্লোভাকিয়াতে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। এই শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তৎকালীন চেক সরকারের প্রতিনিধি পাপানেক (Mr. Papanek) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে মহাসচিবের নিকট এক পত্র পাঠান। মার্চ মাসে চিলি নিরাপত্তা পরিষদকে সেই সব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার নতুন কম্যুনিষ্ট সরকার পাপনেকের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা নেয়। তবুও নিরাপত্তা পরিষদ পাপানেকের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা স্থির করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রাইন এবং চেকোস্লোভাকিয়ার

কম্যুনিষ্ট সরকার এই আলোচনাকে চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করে এবং তাই এই আলোচনার বিরোধিতা করে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় অনেকে পাপানেকের চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিটো দিয়ে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। এই আলোচনার ফলে কার্যতঃ কিছুই করা সম্ভব হয় না—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয় মাত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে মানব অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ :

ভিন্ন দেশের নাগরিকদের সাথে বিবাহিত সোভিয়েত মহিলাদের সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় 1948 খৃষ্টাব্দের মে মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় চিলির প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মৌলিক মানব অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনে। মানব অধিকার বিরোধী আইন পরিবর্তন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুরোধ করে সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাবও পাশ হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মত প্রকাশ করে যে এই সব বিষয় তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই এই সব বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব বা সুপারিশ পাশ করার ক্ষমতা নেই। পরে 1949 খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে ক্যাথলিক যাজকদের বিচার এবং বুলগেরিয়াতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট যাজকদের বিচার উপলক্ষে সেই সব দেশের বিরুদ্ধেও মানব অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। রুমেনিয়ার বিরুদ্ধেও এই ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রই এই সব ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার অস্বীকার করে, কারণ তাদের মতে এই সব ব্যাপার বিভিন্ন রাষ্ট্রর অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

ঠাণ্ডা লড়াই এবং পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করা উচিত।

আফ্রিকাতে ইতালীর কলোনী সম্বন্ধে সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকাতে ইতালীর লিবিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ড এই তিনটি কলোনির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রথমতঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের

কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত) আলাপ আলোচনা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন একক ভাবে অথবা অন্য দেশের সাথে যুক্ত ভাবে এই সব 'কলোনী' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অছি অঞ্চল হিসেবে শাসন করার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হয়, কারণ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের তীরে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েতের কর্তৃত্ব স্থাপন তাদের স্বার্থের বিরোধী ছিল। আরব দেশগুলি এই সব অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবী করে এবং কোন কোন রাষ্ট্র এই সব অঞ্চলে ইতালীর কর্তৃত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। শেষ পর্যন্ত 1948 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এই সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় উত্থিত হল এবং সংশ্লিষ্ট চারটি দেশই সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়। সাধারণ সভা এই তিনটি কলোনীর জন্য তিন রকমের ব্যবস্থা সুপারিশ করে। লিবিয়াতে প্রথমতঃ জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে একজন কমিশনারের শাসন প্রবর্তন করা হয়, এবং স্থির হয় যে 1952 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে এই শাসনের অবসান ঘটিয়ে লিবিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ইরিত্রিয়ার সমস্যা বিবেচনা করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং সেই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির হয় যে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার সাথে মিলিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সোমালিল্যাণ্ডকে 10 বৎসরের জন্য অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা হয়। সাধারণ সভার এই সিদ্ধান্ত সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করে নেয়।

বার্লিন অবরোধের সমস্যা :

1945 খৃষ্টাব্দের পোট্সডাম (Potsdam) সম্মেলনে স্থির হয় যে আপাততঃ সমস্ত জার্মানীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই চারটি দেশের শাসনই প্রবর্তিত হবে। যদিও বার্লিন শহর সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর মধ্যে অবস্থিত ছিল তবুও এই শহরের উপরেও চারটি দেশের শাসনই প্রবর্তিত হ'ল। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পশ্চিমী তিনটি দেশের বিভিন্ন কারণে—বিশেষ করে জার্মানীতে প্রচলিত মুদ্রা বা কারেন্সী সমস্যা নিয়ে —মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং 1948 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিনে

প্রবেশ করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। বার্লিনে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল ছিল, কিন্তু সেখানে যেতে হ'লে সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর ভেতর দিয়েই যেতে হ'ত। এখন সেই পথ সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধ করে দেয় এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় তখন একমাত্র বিমান পথে বার্লিনের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে চলে।

বার্লিনের এই সমস্যা 1948 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমের তিনটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 39 নং ধারা অনুযায়ী (শান্তির পথে বিঘ্ন) নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ এই নিয়ে আলোচনা করে এবং বার্লিনের অবরোধ এবং মুদ্রা বা কারেন্সী সমস্যার যুগপৎ সমাধানের জন্য একটি প্রস্তাব রচনা করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো'তে সেই প্রস্তাব পাশ হতে পারে না। সাধারণ সভা তখন এই চারটি বৃহৎ শক্তিকে বার্লিনের সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্রামুগ্‌লিয়া (Bramuglia)-র নেতৃত্বে (ব্রামুগ্‌লিয়া ছিলেন আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি এবং তখন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি) এই চারটি শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা হয় এবং কারেন্সী বা মুদ্রা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এই সমস্যার সমাধান করে নেয় এবং 1949 খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই চারটি রাষ্ট্র বার্লিন অবরোধের অবসান সম্বন্ধে তাদের চুক্তি নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোনই অবদান নেই তা মনে করা ঠিক নয়। নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভার আলোচনায় উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে এবং তার ফলে এক পক্ষ অপর পক্ষের চুক্তি সুষ্ঠু ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। তা ছাড়া আনুষ্ঠানিক বিতর্কের বাইরেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায় এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

ইরানের বিরুদ্ধে বৃটেনের অভিযোগ :

1951 খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহম্মদ মোসাদেগ (Mossadegh)-এর নেতৃত্বে

ইরান তৈল জাতীয়করণ আইন (Oil Nationalization Act) পাশ করে। তার ফলে 1933 খৃষ্টাব্দে Anglo-Iranian Oil Company-কে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। বৃটেন (এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) নানাভাবে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইরানের যুক্তি হ'ল যে তৈল জাতীয়করণ সম্পূর্ণরূপে তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বৃটেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে আবেদন জানায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিচারালয় স্থির করে যে এই বিষয়ে তাদের বিচার করার কোন অধিকার নেই। সেপ্টেম্বরে বৃটেন এই প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। মোসাদেগ তখন নিজে নিরাপত্তা পরিষদে গিয়ে বলেন যে তৈল কোম্পানীর জাতীয়করণ ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অন্তর্গত।

ইরানের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলেই এই সমস্যার এক রকম সমাধান হয়ে যায়। জাতীয়করণের পরে ইরানের পক্ষে বিদেশী কারিগর এবং অর্থ ভিন্ন তৈল কোম্পানী চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবাদান (Abadan) থেকে তৈল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। মোসাদেগ কম্যুনিষ্ট দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন এই দুই বৎসর তাঁকে কারাগারে বাস করতে হয়। পরে বৃটিশ কোম্পানীকে ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হয় এবং বিদেশীদের (বৃটেন সহ) সাহায্যে ইরানের তৈল কোম্পানী চালাবার ব্যবস্থা হ'ল।

উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয়। 1951 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ইজিপ্ট এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র মরোক্কোতে ফ্রান্সের নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ সভায় এক অভিযোগ আনে। সেই অভিযোগে বলা হয় যে 1912 খৃষ্টাব্দে মরোক্কোর শাসনভার গ্রহণ করার সময় ফ্রান্স যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ফ্রান্স পালন করে নি। সেই সময় ফ্রান্স স্বীকার করে নিয়েছিল যে মরোক্কোর সুলতান স্বাধীন থাকবেন এবং তাঁর রাজ্যের সীমা অপরিবর্তিত রাখা হবে। এই অভিযোগের উত্তরে ফ্রান্স বলে যে মরোক্কো ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার কোন অধিকার সাধারণ সভার নেই।

তা ছাড়া ফ্রান্সের যুক্তি ছিল যে মরোক্কোতে যে সব সংস্কার সাধন করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ তা ব্যাহত হবে। 1952 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 15টি আফ্রো-এশিয়ান দেশ সাধারণ সভায় টিউনিসে ফ্রান্সের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন করে। সেই অভিযোগে বলা হয় যে ফ্রান্স টিউনিসের শাসক বে (Bey)-কে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার নীতি অবলম্বন করেছে। ফ্রান্স তার নিজের সমর্থনে বলে যে ফ্রান্স এবং টিউনিস শাসক (Bey)-র মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং তাই টিউনিসে কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই। 1955 খৃষ্টাব্দে আলজেরিয়াতে ফরাসী নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ফ্রান্স আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অংশ বলে দাবী করে এবং এই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ করার অধিকার অস্বীকার করে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নাই। সাধারণ সভা দুই পক্ষকে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানায় মাত্র। আরব এবং এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র এই বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হ'তে সঠিক নেতৃত্ব এবং কার্যকরী ব্যবস্থা দাবী করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও সেই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। বৃটেন সাধারণতঃ ফ্রান্সের নীতিকেই সমর্থন করে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের বন্ধু দেশ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত রাষ্ট্রসমূহ উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে।

হাঙ্গেরীর সমস্যা :

1956 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন শুরু হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন দমন করা হ'ল। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয় যে হাঙ্গেরীর প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়েছে এবং হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ইম্রে নাগি (Imre Nagy) সহ অনেক মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জানোস কাদার (Janos Kadar)-এর নেতৃত্বে এক নতুন বৈপ্লবিক সরকার গঠিত হয়েছে। কাদার ছিলেন হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী। মস্কো থেকে আরও বলা হয় যে কাদারের নেতৃত্বে গঠিত

নতুন বৈপ্লবিক সরকার বিদ্রোহীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সহযোগিতা আহ্বান করেছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাঙ্গেরীর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে, কিন্তু সোভিয়েতের 'ভিটো'তে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ সভার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানায়। 9 নভেম্বর (1956) সাধারণ সভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাঙ্গেরী থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, এবং হাঙ্গেরীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণ সভাকে জানায় যে হাঙ্গেরীর অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরেই হাঙ্গেরী সরকারের সাথে আলোচনা করে সোভিয়েত সৈন্য বুদাপেষ্ট (হাঙ্গেরীর রাজধানী) ছেড়ে চলে আসবে এবং ওয়ার্স চুক্তি (Warsaw Treaty) অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত সৈন্য রাখা হবে কি না তা হাঙ্গেরীর সরকারের সাথে আলোচনা করে স্থির করা হবে। তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মত প্রকাশ করে যে হাঙ্গেরীর বর্তমান সমস্যা সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেই বিষয় আলোচনা করার কোন অধিকার নেই। হাঙ্গেরীর সরকারও এই মত সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন অনুসন্ধান সমিতিকে হাঙ্গেরীতে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে।

1956 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করে এবং হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য পুনরায় আহ্বান জানায়। 1957 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হাঙ্গেরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, দেন্মার্ক, টিউনিসিয়া এবং উরুগুয়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং জুন মাসে সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। হাঙ্গেরীতে এই কমিটি প্রবেশ করতে পারে না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তার ভিত্তিতে এই কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাঙ্গেরীর স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় আন্দোলনকে দমন করার জন্য দায়ী করে। সেপ্টেম্বর মাসে (1957) সাধারণ সভা এই কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন সহ 36টি দেশ এই রিপোর্টের ভিত্তিতের হাঙ্গেরীর সমস্যার জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কাদার সরকারকে দায়ী করে এক প্রস্তাব আনে। হাঙ্গেরী সরকারের প্রতিনিধি কমিটির রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন এবং সাধারণ সভার আলোচনা সূচী থেকে হাঙ্গেরী সমস্যা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানান। সোভিয়েত ইউনিয়নও স্বভাবতঃই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

1958 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এক গোপন বিচারের পর হাঙ্গেরীর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাঙ্গেরীতে জনসাধারণের মধ্যে রিলিফ বা ত্রাণকার্যের জন্য এবং যে সব লোক হাঙ্গেরী থেকে পলায়ন করে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল সেই সব শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে।

কঙ্গো সমস্যা ঃ

1960 খৃষ্টাব্দের 30 জুন বেলজিয়াম কঙ্গো ছেড়ে চলে যায় এবং কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরে সেখানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কঙ্গোর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য এবং ফলে দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার উপর 11 জুলাই (1960) শোম্বের (Tshombe) নেতৃত্বে কঙ্গোর কাতাংগা অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের জন্য কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কাতাংগার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায়কঙ্গোতে যে সব বেলজিয়ানরা বাস করতেন তারা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং বেলজিয়াম তাদের দেশবাসীদের রক্ষা করার নামে পুনরায় কঙ্গোতে ফিরে আসে। শোম্বে এদিকে সরাসরি ভাবে বেলজিয়ামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বেলজিয়াম শোম্বেকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে এবং ফলে কঙ্গোর স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হয়। বিদেশ থেকে—বিশেষ করে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স থেকে—কয়েকশত সৈন্য উচ্চ বেতনে

কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। 1904-05 খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে এবং কোরিয়াতে তখন জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 1910 খৃষ্টাব্দে জাপান সম্পূর্ণ ভাবে কোরিয়া অধিকার করে নেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট, চার্চিল, এবং চিয়াং কাই শেক 1943 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে স্থির করেন যে কোরিয়াকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। 1945 খৃষ্টাব্দে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নও কোরিয়া সম্বন্ধে এই নীতি স্বীকার করে নেয়। ঐ বৎসরই অগাষ্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পন করে এবং স্থির হয় যে কোরিয়ার 38° অক্ষাংশ রেখার উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এবং দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করবে। এই ভাবেই কোরিয়া দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং তার ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। কোরিয়ার দুই অংশে ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন মীমাংসায় পৌছতে না পারায় শেষ পর্যন্ত 1947 খৃষ্টাব্দে মার্কিন সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই সমস্যাটি উত্থাপন করে। জাতিপুঞ্জ কোরিয়ার জন্য একটি সাময়িক কমিশন (UN Temporary Commission on Korea—UNTCOK) গঠন করে এবং সেই কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কোরিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠন করার পরিকল্পনা নেয়। উদ্দেশ্য ছিল যে এই ভাবে সমস্ত দেশে একটি সরকার স্থাপন করতে পারলে কোরিয়ার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা এবং কোরিয়া থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং ইউক্রেনিয়ান রিপাবলিকের প্রতিনিধি সাময়িক কমিশন (UNTCOK) যোগ দিতে অস্বীকার করেন। উত্তর কোরিয়াতে এই কমিশনকে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হ'ল না। তাই এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে 10 মে (1948) কেবল মাত্র দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অঞ্চলে আগষ্ট মাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (Republic of Korea) সরকার গঠিত হ'ল। এই দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হলেন সিংম্যান রী (Singhman Rhee)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা তখন কোরিয়ার জন্য একটি নতুন কমিশন (United Nations Commission on Korea—UNCOK) গঠন করে। বিদেশী সৈন্য অপসারণ করে

কোরিয়াকে কি ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে কি ভাবে ঐক্য স্থাপন করা যায় সেই সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করার জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের চেষ্টায় 'গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democra‘ic People's Republic) স্থাপিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারিত হওয়ার পূর্বেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী উত্তর কোরিয়া পরিত্যাগ করে চলে যায়। দুই কোরিয়া স্বাধীন হ'লেও দক্ষিণ অঞ্চল মার্কিন প্রভাবাধীনে এবং উত্তর অঞ্চল সোভিয়েত প্রভাবাধীনে থাকে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চরম তিক্ততায় পরিণত হয়। এমন অবস্থায় 1950 খৃষ্টাব্দের 25 জুন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পরেই মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ফরমোসার (তাইওয়ান) চিয়াং কাইশেক সরকারকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চীনের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করার প্রতিবাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানুয়ারী মাস (1950) থেকে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে। অতএব নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত 'ভিটো'র কোন ভয় তখন ছিল না। 25 জুন নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের দক্ষিণ করিয়া পরিত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ পালিত না হওয়ায় 27 জুন নিরাপত্তা পরিষদ জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগণকে এই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করার জন্য সুপারিশ করে। 7 জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের পরিচালনায় কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান সেনানায়কের নাম ঘোষণা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাক্ আর্থারকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুপস্থিত থাকায় নিরাপত্তা পরিষদে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানই প্রধান, তবে প্রায় 45টি সদস্যরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সুপারিশে সাড়া দিয়েছিল। তার মধ্যে 16টি রাষ্ট্র সৈন্যবাহিনী দিয়ে জাতিপুঞ্জকে সাহায্য করে এবং অন্যান্য দেশ খাদ্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি

প্রেরণ করে। সকল দেশের সমস্ত সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। জাতিসংঘ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে এই প্রথম আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক বল প্রয়োগ করার উদাহরণ। এই বল প্রয়োগ করা হয়েছিল জাতিপুঞ্জ সনদের 39 নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ফলে।

পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয় এবং তীব্র ভাষায় কোরিয়াতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর নিন্দা করে। এর পর থেকে সোভিয়েত ভিটোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তখন সাধারণ সভা Uniting For Peace Resolution অনুযায়ী কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। কোরিয়ার যুদ্ধের প্রথম দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী পরাজিত হলেও সেপ্টেম্বরের (1950) পর উত্তর কোরিয়া দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করে। তখন প্রশ্ন উঠে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী 38° অক্ষাংশরেখা অতিক্রম করে আরও উত্তরে অগ্রসর হবে কি না। 1950 খৃষ্টাব্দের 7 অক্টোবর সাধারণ সভা ঘোষণা করে যে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া স্থাপন করাই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য এবং সেই অনুযায়ী United Nations Commission for Unification and Rehabiliation of Korea (UNCURK) নামে একটি নতুন কমিশন গঠন করা হ'ল। 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করাই যে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করার বিপদ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ জাতিপুঞ্জকে সতর্ক করে দেয়। পিকিং-এ নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে 38° অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করা হ'লে কম্যুনিষ্ট চীন যুদ্ধ যোগদান করতে বাধ্য হবে এবং তার ফলে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। কম্যুনিষ্ট চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। ফরমোসা বা তাইওয়ানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করতে কম্যুনিষ্ট চীন তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠে। জাতিপুঞ্জের বাহিনী 38° অক্ষাংশ অতিক্রম করার পর চীনের সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকের ভয় হয়েছিল যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অবিলম্বে কোরিয়া থেকে চীনের সৈন্য অপসারণ দাবী করে নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবে ভিটো প্রদান করে এবং ভারতবর্ষ ভোট দানে বিরত

থাকে। নিরপত্তা পরিষদের অপর নয় সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেয়। ভারতের নেতৃত্বে 13টি আফ্রোএশীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী 14 ডিসেম্বর (1950) সাধারণ সভা 3জন সদস্য বিশিষ্ট একটি যুদ্ধ বিরতি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ভারতবর্ষ, কানাডা ইরানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটির পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব হয় না। কারণ কম্যুনিষ্টরা এই কমিটির সাথে কোন আলাপ আলোচনা করতে রাজী হয় না। পরে 1951 খৃষ্টাব্দের 2 ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা কম্যুনিষ্ট চীনকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। 44জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, 5জন বিপক্ষে এবং 9জন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ 5টি কম্যুনিষ্ট দেশ ছাড়া ভারত ও ব্রহ্মদেশ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। আফগানিস্তান, ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সুইডেন, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং যুগোস্লাভিয়া কোন পক্ষেই ভোট দেয় না। এদিকে কোরিয়ায় চীনাবাহিনীকে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে প্রায় বিতাড়িত করা হয় এবং জাতিপুঞ্জের অনেক সদস্য রাষ্ট্রই 38° অক্ষাংশ রেখা পুনরায় অতিক্রম করে যাওয়ার পূর্বে এই সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু জেনারেল ম্যাক্ আর্থার চীনের ভূখণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে পদ-চ্যুত করে সেই স্থানে জেনারেল রিজওয়ে (General Ridgway)-কে নিযুক্ত করেন।

1951 খৃষ্টাব্দের মে মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কম্যুনিষ্ট চীনে সমস্ত রকম সমরোপকরণ প্রেরণ করা বন্ধ করে দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক অবরোধ সম্বন্ধে সাধারণ সভার এটাই প্রথম সুপারিশ। জুন মাসে (1951) নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি জেকব মালিক তাঁর বেতার ভাষণে শান্তির কথা বলেন এবং যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করার জন্য আবেদন জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে জেনারেল রিজওয়েকে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রথমে কাইসং এবং পরে পান্‌মুন্‌জনে দুই পক্ষের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা হয় শেষ পর্যন্ত 1953 খৃষ্টাব্দের 27 জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার পথে যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাই

শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বন্দী এমন অনেকে উত্তর কোরিয়ায় ফিরে যেতে রাজী ছিল না বলে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু জুন মাসে (1953) এই বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হল। ভারতের সভাপতিত্বে গঠিত একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী বিনিময়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিশনের সদস্য ছিল পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড। বহু সংগ্রামের পর 38° অক্ষাংশ রেখার লাইন ধরেই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতে বাধ্য হন। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই একটি শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা হবে। 1954 খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে জেনেভা শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই সম্মেলনে কোরিয়ার ঐক্য স্থাপনের প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়।

কাশ্মীর সমস্যা

1947 খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন জম্মু ও কাশ্মীরের মত বিভিন্ন করদ রাজ্যগুলির (Indian Native States) উপরও বৃটিশের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়। সেই সব রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অথবা স্বাধীনতা ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষত্ব হল যে এখানের রাজা ছিলেন হিন্দু কিন্তু অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। এই রাজ্য প্রথম দিকে ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ না সাময়িক ভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য একটি চুক্তিতে (Standstill Agreement) আবদ্ধ হয়। কিন্তু শীঘ্রই পাকিস্তানের দিক থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি ইত্যাদি জিনিষপত্র কাশ্মীরে যাওয়ার পথে নানা রকমের বাধা দেওয়া আরম্ভ হয়। পরে পাকিস্তান থেকে উপজাতীয় দলের হাজার হাজার লোক সশস্ত্র ভাবে কাশ্মীরে প্রবেশ করে গোলযোগ আরম্ভ করে এবং তারা রাজধানী শ্রীনগরের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না এবং সেই কারণে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কাশ্মীর তখনও ভারতে যোগদান না করায় ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষ কাশ্মীরের মহারাজকে সেই সিদ্ধান্ত জানাবার পর কাশ্মীর 1947 খৃষ্টাব্দের 26 অক্টোবর ভারতবর্ষে যোগদান করে। কাশ্মীর ভারতে যোগদান করার পরে ভারতের মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে কাশ্মীরের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর ভারতবর্ষে কাশ্মীরে যোগদান সম্পর্কে কাশ্মীরী জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হবে। এই কথা তিনি রাজনৈতিক কারণেই বলেছিলেন—আইনগত কারণে নয়। 1947 খৃষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে (Indian Independence Act) করদ রাজ্যসমূহের ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার কোন কথা উল্লিখিত নেই।

1948 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 35 নং ধারা অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। কাশ্মীরের উপর উপজাতীয়দের আক্রমণকে নানাভাবে সাহায্য করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—এই ছিল ভারতের অভিযোগ। 20 জানুয়ারী (1948) এই সমস্যা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য (সনদের 34 নং ধারা অনুযায়ী) এবং দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য একটি কমিশন স্থাপন করা হয়। 2 এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য এবং কাশ্মীরে বসবাস করে না এমন সমস্ত উপজাতীয় লোককে কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। পরিষদ স্থির করে যে গোলযোগ বন্ধ হলে কাশ্মীরে ভারতের সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করে আনা হবে—আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত রাখা হবে না। পরে জনসাধারণের ভোট নিয়ে কাশ্মীর ভারতবর্ষে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবে তা স্থির করার ব্যবস্থা হবে। এই গণভোট নেওয়ার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন প্রশাসক (Plebiscite Administrator) নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং মহাসচিবকে সেই প্রশাসকের নাম ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হল। নিরাপত্তা পরিষদ উপরি-উক্ত কমিশনকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে গিয়ে সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দেয়। 1948 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই কমিশন ভারতে এসে কাশ্মীরে পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। এই কমিশনের চেষ্টায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান 1949 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজী হয়। পরে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর এড্‌মিরাল চেষ্টার নিমিজ (Admiral Chester Nimitz)-কে Plebiscite Administrator হিসেবে নিযুক্ত করেন। গণভোট নেওয়ার পূর্বে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই বিষয়ে কোন ঐক্যমতে পৌছান সম্ভব হয় না। 1949 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কমিশন এই বিষয়ে ব্যর্থতার কথা নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দেয় এবং এই অভিমত প্রকাশ করে যে কোন কমিশনের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রতিনিধির পক্ষে এই বিষয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে। সেই সময় কানাডার জেনারেল ম্যাকনটন (General McNaughton) ছিলেন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি। তিনি নিজে এই বিষয়ে বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের চেষ্টা করে বিফল হন। পরে অষ্ট্রেলিয়া হাইকোর্টের বিচারক Sir Owen Dixon ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তিনিও দুই পক্ষের মধ্যে সৈন্য অপসারণ এবং সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা সম্বন্ধে কোন ঐক্যমত সৃষ্টি করতে পারেন না। 1951 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রেহাম (Dr. Frank Graham)-কে কাশ্মীরে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তিনি দুই পক্ষের সাথে বহু আলোচনা করেও এই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন। কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পরস্পর-বিরোধী। ভারতের দৃষ্টিতে কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং পাকিস্তান সেখানে আক্রমণকারী। কাশ্মীরের প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে সৈন্য মোতায়েন রাখার পূর্ণ অধিকার ভারতের আছে। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের ভারতে যোগদান সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়াই প্রধান সমস্যা। এই দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পরিষদ এই সমস্যা সমাধানের জন্য আরও নানাভাবে চেষ্টা করে। 1957 খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কাশ্মীরে গণভোট নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিটোর ফলে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন বলেনযে ভারতের ভূখণ্ডে বিদেশী সৈন্য প্রেরণ করার কোন অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেই। পরে 1957 খৃষ্টাব্দে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে সুইডেনের গানার জারিং (Gunnar Jarring) ভারতবর্ষ ও

পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টাও সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়। ভারতবর্ষের প্রধান অভিযোগ ছিল যে পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে তার সৈন্য অপসারণ না করার ফলেই সমস্যা সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে এবং গণভোট গ্রহণ করার মত উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষের দাবি ছিল যে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং পাকিস্তানী সৈন্য কাশ্মীর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত গণভোটের প্রশ্ন তোলা সম্পূর্ণ অবান্তর। অপর দিকে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপরই পাকিস্তান জোর দেয় এবং কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গ তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাশ্মীরে গণভোট সম্বন্ধে ভারতের ধারণা ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু গণভোটের কথা বলেছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান যখন পশ্চিমী সামরিক জোটের শরিক হয়ে পড়ে তখন তিনি মনে করেন যে সেই নতুন পরিস্থিতিতে গণভোট নেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান তখন ঠাণ্ডা লড়াই (cold war)-তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করছে এবং স্বভাবতঃই পাকিস্তান ও তার বন্ধুরাষ্ট্ররা নিরপেক্ষভাবে কাশ্মীর সমস্যা বিচার না করে আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতেই তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। সেই অবস্থায় গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরে তথা ভারতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে জওহরলাল নেহেরু অসম্মত হন। তা ছাড়া 1954 খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের গণ পরিষদ কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবেই স্বীকার করে নেয়। তারপর থেকে ভারতবর্ষ কাশ্মীরে গণভোটের প্রশ্নকে অবান্তর বলেই মনে করে।

1957 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে ডঃ গ্রাহাম পুনরায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে এসে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি ভারতর্ষ ও পাকিস্তান সরকারের কাছে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করেন ভারত সরকার তা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তাঁর প্রস্তাবে কাশ্মীরে গণভোট, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, ডঃ গ্রাহামের মধ্যস্থতায় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ইত্যাদি কথা বলা হয়েছিল। 1957 খৃষ্টাব্দের পর থেকে জাতিপুঞ্জ কাশ্মীরের ব্যাপারে আর নতুন করে বিশেষ কোন প্রস্তাব দেয় নি। 1962 খৃষ্টাব্দে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত ও পাকিস্তানের

মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়, কিন্তু সেই সব আলোচনাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই একটি রাজ্যে পরিণত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভারত ও পাকিস্তান সরাসরি আলোচনা করেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যার আর কোন অস্তিত্ব নেই—কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান তা মেনে নিতে রাজী নয়। 1965 খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান যুদ্ধ করে কাশ্মীর অধিকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো এখনও কাশ্মীর সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি চীনের সমর্থন লাভ করতে সমর্থন হয়েছেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলেও এই কথা অস্বীকার করা উচিত নয় যে নিরাপত্তা পরিষদের চেষ্টার ফলেই সেখানে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর রাজনীতি কাশ্মীর সমস্যাকে জটিল করে তোলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যাপারে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ নিরাশ করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটে যোগদান করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু চীন-ভারত বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব যেখানে বেশী স্বভাবতঃই আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষমতা সেখানে দুর্বল।

চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যা:

1948 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চেকোস্লোভাকিয়াতে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। এই শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তৎকালীন চেক সরকারের প্রতিনিধি পাপানেক (Mr. Papanek) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে মহাসচিবের নিকট এক পত্র পাঠান। মার্চ মাসে চিলি নিরাপত্তা পরিষদকে সেই সব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার নতুন কম্যুনিষ্ট সরকার পাপনেকের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা নেয়। তবুও নিরাপত্তা পরিষদ পাপানেকের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা স্থির করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রাইন এবং চেকোস্লোভাকিয়ার

কম্যুনিষ্ট সরকার এই আলোচনাকে চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করে এবং তাই এই আলোচনার বিরোধিতা করে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় অনেকে পাপানেকের চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিটো দিয়ে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। এই আলোচনার ফলে কার্যতঃ কিছুই করা সম্ভব হয় না—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয় মাত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে মানব অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ:

ভিন্ন দেশের নাগরিকদের সাথে বিবাহিত সোভিয়েত মহিলাদের সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় 1948 খৃষ্টাব্দের মে মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় চিলির প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মৌলিক মানব অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনে। মানব অধিকার বিরোধী আইন পরিবর্তন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুরোধ করে সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাবও পাশ হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মত প্রকাশ করে যে এই সব বিষয় তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই এই সব বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব বা সুপারিশ পাশ করার ক্ষমতা নেই। পরে 1949 খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে ক্যাথলিক যাজকদের বিচার এবং বুলগেরিয়াতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট যাজকদের বিচার উপলক্ষে সেই সব দেশের বিরুদ্ধেও মানব অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। রুমেনিয়ার বিরুদ্ধেও এই ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রই এই সব ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার অস্বীকার করে, কারণ তাদের মতে এই সব ব্যাপার বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

ঠাণ্ডা লড়াই এবং পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করা উচিত।

আফ্রিকাতে ইতালীর কলোনী সম্বন্ধে সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকাতে ইতালীর লিবিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ড এই তিনটি কলোনির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রথমতঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের

কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত) আলাপ আলোচনা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন একক ভাবে অথবা অন্য দেশের সাথে যুক্ত ভাবে এই সব 'কলোনী' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অছি অঞ্চল হিসেবে শাসন করার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হয়, কারণ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের তীরে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েতের কর্তৃত্ব স্থাপন তাদের স্বার্থের বিরোধী ছিল। আরব দেশগুলি এই সব অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবী করে এবং কোন কোন রাষ্ট্র এই সব অঞ্চলে ইতালীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। শেষ পর্যন্ত 1948 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এই সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় উত্থিত হল এবং সংশ্লিষ্ট চারটি দেশই সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়। সাধারণ সভা এই তিনটি কলোনীর জন্য তিন রকমের ব্যবস্থা সুপারিশ করে। লিবিয়াতে প্রথমতঃ জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে একজন কমিশনারের শাসন প্রবর্তন করা হয়, এবং স্থির হয় যে 1952 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে এই শাসনের অবসান ঘটিয়ে লিবিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ইরিত্রিয়ার সমস্যা বিবেচনা করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং সেই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির হয় যে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার সাথে মিলিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সোমালিল্যাণ্ডকে 10 বৎসরের জন্য অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাখায় ব্যবস্থা হয়। সাধারণ সভার এই সিদ্ধান্ত সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করে নেয়।

বার্লিন অবরোধের সমস্যা :

1945 খৃষ্টাব্দের পোট্‌স্ডাম (Potsdam) সম্মেলনে স্থির হয় যে আপাততঃ সমস্ত জার্মানীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই চারটি দেশের শাসনই প্রবর্তিত হবে। যদিও বার্লিন শহর সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর মধ্যে অবস্থিত ছিল তবুও এই শহরের উপরেও চারটি দেশের শাসনই প্রবর্তিত হ'ল। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পশ্চিমী তিনটি দেশের বিভিন্ন কারণে—বিশেষ করে জার্মানীতে প্রচলিত মুদ্রা বা কারেন্সী সমস্যা নিয়ে —মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং 1948 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিনে

প্রবেশ করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। বার্লিনে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল ছিল, কিন্তু সেখানে যেতে হ'লে সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর ভেতর দিয়েই যেতে হ'ত। এখন সেই পথ সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধ করে দেয় এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় তখন একমাত্র বিমান পথে বার্লিনের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে চলে।

বার্লিনের এই সমস্যা 1948 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমের তিনটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের 39 নং ধারা অনুযায়ী (শান্তির পথে বিঘ্ন) নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদ এই নিয়ে আলোচনা করে এবং বার্লিনের অবরোধ এবং মুদ্রা বা কারেন্সী সমস্যার যুগপৎ সমাধানের জন্য একটি প্রস্তাব রচনা করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো'তে সেই প্রস্তাব পাশ হতে পারে না। সাধারণ সভা তখন এই চারটি বৃহৎ শক্তিকে বার্লিনের সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্রামুগ্‌লিয়া (Bramuglia)-র নেতৃত্বে (ব্রামুগ্‌লিয়া ছিলেন আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি এবং তখন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি) এই চারটি শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা হয় এবং কারেন্সী বা মুদ্রা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এই সমস্যার সমাধান করে নেয় এবং 1949 খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই চারটি রাষ্ট্র বার্লিন অবরোধের অবসান সম্বন্ধে তাদের চুক্তি নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোনই অবদান নেই তা মনে করা ঠিক নয়। নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভার আলোচনায় উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে এবং তার ফলে এক পক্ষ অপর পক্ষের চুক্তি সুষ্ঠু ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। তা ছাড়া আনুষ্ঠানিক বিতর্কের বাইরেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায় এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

ইরানের বিরুদ্ধে বৃটেনের অভিযোগ :

1951 খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহম্মদ মোসাদেগ (Mossadegh)-এর নেতৃত্বে

ইরান তৈল জাতীয়করণ আইন (Oil Nationalization Act) পাশ করে। তার ফলে 1933 খৃষ্টাব্দে Anglo-Iranian Oil Company-কে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। বৃটেন (এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) নানাভাবে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইরানের যুক্তি হ'ল যে তৈল জাতীয়করণ সম্পূর্ণরূপে তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বৃটেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে আবেদন জানায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিচারালয় স্থির করে যে এই বিষয়ে তাদের বিচার করার কোন অধিকার নেই। সেপ্টেম্বরে বৃটেন এই প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। মোসাদেগ তখন নিজে নিরাপত্তা পরিষদে গিয়ে বলেন যে তৈল কোম্পানীর জাতীয়করণ ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অন্তর্গত।

ইরানের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলেই এই সমস্যার এক রকম সমাধান হয়ে যায়। জাতীয়করণের পরে ইরানের পক্ষে বিদেশী কারিগর এবং অর্থ ভিন্ন তৈল কোম্পানী চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবাদান (Abadan) থেকে তৈল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। মোসাদেগ কম্যুনিষ্ট দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন এই দুই বৎসর তাঁকে কারাগারে বাস করতে হয়। পরে বৃটিশ কোম্পানীকে ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হয় এবং বিদেশীদের (বৃটেন সহ) সাহায্যে ইরানের তৈল কোম্পানী চালাবার ব্যবস্থা হ'ল।

উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয়। 1951 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ইজিপ্ট এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র মরোক্কোতে ফ্রান্সের নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ সভায় এক অভিযোগ আনে। সেই অভিযোগে বলা হয় যে 1912 খৃষ্টাব্দে মরোক্কোর শাসনভার গ্রহণ করার সময় ফ্রান্স যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ফ্রান্স পালন করে নি। সেই সময় ফ্রান্স স্বীকার করে নিয়েছিল যে মরোক্কোর সুলতান স্বাধীন থাকবেন এবং তাঁর রাজ্যের সীমা অপরিবর্তিত রাখা হবে। এই অভিযোগের উত্তরে ফ্রান্স বলে যে মরোক্কো ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার কোন অধিকার সাধারণ সভার নেই।

তা ছাড়া ফ্রান্সের যুক্তি ছিল যে মরোক্কোতে যে সব সংস্কার সাধন করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ তা ব্যাহত হবে। 1952 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 15টি আফ্রো-এশিয়ান দেশ সাধারণ সভায় টিউনিসে ফ্রান্সের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন করে। সেই অভিযোগে বলা হয় যে ফ্রান্স টিউনিসের শাসক বে (Bey)-কে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার নীতি অবলম্বন করেছে। ফ্রান্স তার নিজের সমর্থনে বলে যে ফ্রান্স এবং টিউনিস শাসক (Bey)-র মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং তাই টিউনিসে কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই। 1955 খৃষ্টাব্দে আলজেরিয়াতে ফরাসী নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ফ্রান্স আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অংশ বলে দাবী করে এবং এই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ করার অধিকার অস্বীকার করে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নাই। সাধারণ সভা দুই পক্ষকে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানায় মাত্র। আরব এবং এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র এই বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হ'তে সঠিক নেতৃত্ব এবং কার্যকরী ব্যবস্থা দাবী করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও সেই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। বৃটেন সাধারণতঃ ফ্রান্সের নীতিকেই সমর্থন করে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের বন্ধু দেশ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত রাষ্ট্রসমূহ উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে।

হাঙ্গেরীর সমস্যা:

1956 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন শুরু হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন দমন করা হ'ল। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয় যে হাঙ্গেরীর প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়েছে এবং হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ইম্রে নাগি (Imre Nagy) সহ অনেক মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জানোস কাদার (Janos Kadar)-এর নেতৃত্বে এক নতুন বৈপ্লবিক সরকার গঠিত হয়েছে। কাদার ছিলেন হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী। মস্কো থেকে আরও বলা হয় যে কাদারের নেতৃত্বে গঠিত

নতুন বৈপ্লবিক সরকার বিদ্রোহীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সহযোগিতা আহ্বান করেছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাঙ্গেরীর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে, কিন্তু সোভিয়েতের 'ভিটো'তে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ সভার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানায়। 9 নভেম্বর (1956) সাধারণ সভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাঙ্গেরী থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, এবং হাঙ্গেরীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণ সভাকে জানায় যে হাঙ্গেরীর অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরেই হাঙ্গেরী সরকারের সাথে আলোচনা করে সোভিয়েত সৈন্য বুদাপেষ্ট (হাঙ্গেরীর রাজধানী) ছেড়ে চলে আসবে এবং ওয়ার্স চুক্তি (Warsaw Treaty) অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত সৈন্য রাখা হবে কি না তা হাঙ্গেরীর সরকারের সাথে আলোচনা করে স্থির করা হবে। তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মত প্রকাশ করে যে হাঙ্গেরীর বর্তমান সমস্যা সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেই বিষয় আলোচনা করার কোন অধিকার নেই। হাঙ্গেরীর সরকারও এই মত সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে এবং সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের কোন অনুসন্ধান সমিতিকে হাঙ্গেরীতে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে।

1956 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করে এবং হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য পুনরায় আহ্বান জানায়। 1957 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হাঙ্গেরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, দেন্মার্ক, টিউনিসিয়া এবং উরুগুয়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং জুন মাসে সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। হাঙ্গেরীতে এই কমিটি প্রবেশ করতে পারে না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তার ভিত্তিতে এই কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাঙ্গেরীর স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় আন্দোলনকে দমন করার জন্য দায়ী করে। সেপ্টেম্বর মাসে (1957) সাধারণ সভা এই কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন সহ 36টি দেশ এই রিপোর্টের ভিত্তিতের হাঙ্গেরীর সমস্যার জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কাদার সরকারকে দায়ী করে এক প্রস্তাব আনে। হাঙ্গেরী সরকারের প্রতিনিধি কমিটির রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন এবং সাধারণ সভার আলোচনা সূচী থেকে হাঙ্গেরী সমস্যা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানান। সোভিয়েত ইউনিয়নও স্বভাবতঃই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

1958 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এক গোপন বিচারের পর হাঙ্গেরীর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাঙ্গেরীতে জনসাধারণের মধ্যে রিলিফ বা ত্রাণকার্যের জন্য এবং যে সব লোক হাঙ্গেরী থেকে পলায়ন করে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল সেই সব শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে।

কঙ্গো সমস্যা :

1960 খৃষ্টাব্দের 30 জুন বেলজিয়াম কঙ্গো ছেড়ে চলে যায় এবং কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরে সেখানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কঙ্গোর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য এবং ফলে দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার উপর 11 জুলাই (1960) শোম্বের (Tshombe) নেতৃত্বে কঙ্গোর কাতাংগা অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের জন্য কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কাতাংগার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কঙ্গোতে যে সব বেলজিয়ানরা বাস করতেন তারা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং বেলজিয়াম তাদের দেশবাসীদের রক্ষা করার নামে পুনরায় কঙ্গোতে ফিরে আসে। শোম্বে এদিকে সরাসরি ভাবে বেলজিয়ামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বেলজিয়াম শোম্বেকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে এবং ফলে কঙ্গোর স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হয়। বিদেশ থেকে—বিশেষ করে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স থেকে—কয়েকশত সৈন্য উচ্চ বেতনে

কাতাংগার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী পেট্রিস্ লুমুম্বা (Patrice Lumumba) দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সেই অবস্থায় কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট কাছাবুবু (Kasavubu) এবং প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বা জুলাই মাসে (1960) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে তাঁরা কারিগরী সাহায্য এবং দেশের রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু দুই এক দিন পরেই কঙ্গো সরকার বেলজিয়ামের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব Hammarskjold তখন সনদের 99 নং ধারা অনুযায়ী এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে কঙ্গোর সমস্যা আলোচনা করতে আহ্বান করেন। পরিষদ কঙ্গোতে সামরিক সাহায্য পাঠাতে রাজী হয় এবং স্থির হয় যে আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কারণে জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী বলপ্রয়োগ করতে বিরত থাকবে। Hammarskjold উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নিকট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সামরিক এবং অন্যান্য ভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান এবং পরে এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশের কাছেও এই আবেদন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বৃটেনের বিমান বাহিনীর সাহায্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কঙ্গোতে এসে পৌছে। 20 জুলাই (1960) নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বেলজিয়ামকে কঙ্গো পরিত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এবং বেলজিয়ানরা শীঘ্রই কাতাংগা ছাড়া সমস্ত কঙ্গো পরিত্যাগ করে চলে যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কাতাংগাতে প্রবেশ করবে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে কোন নির্দেশ ছিল না এবং কাতাংগার সরকার ঘোষণা করে যে জাতিপুঞ্জের বাহিনী তাদের রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করা হবে। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীকে সরাসরি কাতাংগায় প্রবেশ করার নির্দেশ না দিয়ে Hammarskjold নিরাপত্তা পরিষদের সাথে পরামর্শ করার জন্য নিউইয়র্কে চলে আসেন। কাতাংগায় প্রবেশ করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই দ্বিধা লুমুম্বাকে বিচলিত করে তোলে। তিনি মনে করেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোর স্বাধীনতা ও জাতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। লুমুম্বা তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে বিশেষ কোন সহযোগিতা করতে চাইলেন না। এদিকে আগষ্ট মাসে (1960) নিরাপত্তা পরিষদ (ফ্রান্স ও ইতালী ভোট দানে বিরত থাকে) পুনরায় বেলজিয়ামকে

অবিলম্বে সমস্ত কঙ্গো পরিত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীকে কাতাংগায় প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবে অবশ্য বলা হয়েছিল যে জাতিপুঞ্জের বাহিনী কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রস্তাবের এই অংশ খুব স্পষ্ট ছিল না, কারণ কাতাংগায় জাতিপুঞ্জের বাহিনী যদি প্রবেশ করে তবে একদিকে যেমন বেলজিয়ানরা কাতাংগা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে তেমনি কাতাংগার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। যাই হোক Hammarskjold ফিরে এসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীকে কাতাংগায় প্রবেশ করার নির্দেশ দেন, কিন্তু লুমুম্বা সরকারের কোন প্রতিনিধিকে তাদের সংগে যেতে দিতে রাজী হলেন না। ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লুমুম্বার সন্দেহ বৃদ্ধি পায় এবং লুমুম্বা ও Hammarskjold এর সম্পর্ক তিক্ততায় পরিণত হয়। লুমুম্বা কিছু পরিমাণে বামপন্থী বা কম্যুনিষ্টপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সাথে Hammarskjold-এর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নও Hammarskjold-এর বিরোধিতা করে। আগষ্ট মাসে (1960) নিরাপত্তা পরিষদে Hammarskjold-এর সমর্থনে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। পরে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট কাছাবুবু (Kasavubu) লুমুম্বাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন (যদিও কঙ্গোর পার্লামেণ্টে লুমুম্বার সমর্থকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ) এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কাতাঙ্গার রাজধানীতে (Elisabethville) নিহত হন। কঙ্গোর অবস্থার তখন খুব অবনতি ঘটে— বেলজিয়াম কঙ্গোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে (1960) যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ নিজে মহাসচিব Hammarskjold-কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

ইতিমধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কাতাংগায় প্রবেশ করে অগ্রসর হতে থাকে এবং তার ফলে যথেষ্ট রক্তপাত হয়। 1971 খৃষ্টাব্দে 17 সেপ্টেম্বর বিমান দুর্ঘটনার ফলে Hammarskjold নিহত হন এবং U Thant (ইউ থাণ্ট) তাঁর স্থানে মহাসচিব হিসাবে নিযুক্ত হলেন। নিরাপত্তা পরিষদ কাতাংগা থেকে বৈদেশিক সৈন্য এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের বলপূর্বক বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে (1961 খৃষ্টাব্দের) ডিসেম্বর মাসে

শোম্বের (Tshombe) সাথে কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের এক চুক্তি হয় এবং শোম্বে পৃথক কাতাংগার দাবী প্রত্যাহার করেন। 1964 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কঙ্গো ছেড়ে চলে যায়।

কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য অনস্বীকার্য। যে সব বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে ফিরে আসে তাদের সহজেই কঙ্গো (কাতাংগা ছাড়া) থেকে বিতাড়ন করা সম্ভব হয়। কঙ্গোর রাজনীতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ না করলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নিজেদের স্বার্থে এই সমস্যাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করত এবং ফলে আফ্রিকাতে প্রত্যক্ষ ভাবে ঠাণ্ডা লড়াই-এর আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ত। তা ছাড়া কঙ্গোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নতির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদানও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুয়েজ খাল সমস্যা এবং আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজিপ্টকে নীল নদে আসওয়ান বাঁধ (Aswan Dam) তৈরী করার জন্য অর্থ ঋণ দিতে রাজী হয়, কিন্তু মধ্য প্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থার (Middle East Defence Organization) বিরোধিতা করায় এবং 1956 খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কেনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজিপ্টকে সেই ঋণ দিতে অস্বীকার করে। চেকোস্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার ফলে ইজিপ্টকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং তাই ইজিপ্টের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না—এই যুক্তি দেখান হয়। ইজিপ্টের নেতা নাসের তখন 1956 খৃষ্টাব্দের 26 জুলাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। সুয়েজ খাল ইজিপ্টের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই অবস্থিত, কিন্তু ইজিপ্ট Universal Suez Canal Company-কে 99 বৎসর পর্যন্ত এই খাল পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করে।[1] সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সময় ইজিপ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয় এবং তাই এই কাজকে বে-আইনী বলা চলে না। যাই হোক এই খাল জাতীয়করণের ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইসরাইল, ফ্রান্স ও বৃটেন ইজিপ্টকে আক্রমণ করে। ইজিপ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইসরাইল পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। সিনাই উপদ্বীপ (Sinai Peninsula)

1. প্রথমে এই ক্ষমতা সুয়েজ খাল খননের প্রধান পরিচালক Ferdinand de Lesseps-কে দেওয়া হয় এবং পরে কোম্পানী এই ক্ষমতা লাভ করে।

হতে আরবরা বারবার ইসরাইলের ভেতর অনুপ্রবেশ করে ইসরাইলকে বিব্রত করে তোলে। আকাবা (Aqaba) উপসাগর আরবরা অবরোধ করে রাখে এবং ফলে এই উপসাগরের তীরে অবস্থিত এইলাৎ (Eilat) বন্দর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে। এই বন্দর থেকে ইসরাইলের পক্ষে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করা সম্ভব। আকাবা উপসাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত তিরান প্রণালী (Straits of Tiran) যদি খোলা যায় তবে ইসরাইলকে ইজিপ্ট সুয়েজ খাল ব্যবহার করতে না দিলেও ইসরাইলের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তখন ইসরাইলের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য ভিন্ন ইজিপ্ট এবং অন্যান্য আরব দেশের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণের পর ফ্রান্স ও বৃটেনের সহায়তায় ইসরাইল 29 অক্টোবর (1946) ইজিপ্টকে আক্রমণ করে। 4/5 দিনের মধ্যেই ইসরাইল ইজিপ্টকে কয়েকটি যুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

ইসরাইলের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির জন্য এবং ইসরাইলকে তার রাজ্যের সীমানার মধ্যে ফিরে আসার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করে, কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের 'ভিটো'তে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তখন Uniting for Peace প্রস্তাব অনুযায়ী পয়লা নভেম্বর (1956) সাধারণ সভার বৈঠক আহ্বান করা হল। 2 নভেম্বর সাধারণ সভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সৈন্য অপসারণ এবং সেই অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার কথা বলতে হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স জানায় যে সীমান্তে শান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী মোতায়েন রাখার প্রস্তাবে ইজিপ্ট এবং ইসরাইল যদি রাজী হয় তবেই তারা তাদের সৈন্য অপসারণ করে নেবে। 5 নভেম্বর সাধারণ সভা সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই দশটি দেশের সেনাদলের সাহায্যে জাতিপুঞ্জ তার বাহিনী গড়ে তোলে। ইতালীতে সেই বাহিনী সমবেত হয় এবং 15 নভেম্বর সেই বাহিনী United Nations Emergency Force—UNEF) ইজিপ্টে এসে উপস্থিত হল। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকট যখন দেখা দেয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ

দমনে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। 5 নভেম্বর সাধারণ সভায় সোভিয়েত প্রতিনিধি বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতির তীব্র সমালোচনা করে এবং এই দুই দেশের বিরুদ্ধে 'রকেট' ব্যবহার করার ইঙ্গিতও দেয়। মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যেতে পারে, এমন কথাও কয়েকবার বলা হয়। এই কঠোর নীতির ফলে আরব দেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়। যাই হোক যুদ্ধবিরতির পূর্বেই ইসরাইল সিনাই উপদ্বীপ এবং ইং-ফরাসী সৈন্য সুয়েজ খালের উত্তর দিকের অংশ অধিকার করে নেয়। ধীরে ধীরে ইসরাইল এবং ইং-ফরাসী সৈন্য অপসারিত হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী সীমান্তে এসে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সীমান্তে শান্তি স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু আরব-ইসরাইল সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটে না।

1956 খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর ইসরাইলের অনেক সুবিধা হ'ল, কিন্তু আরব রাষ্ট্রদের সঙ্গে সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটে না। সীমান্তে শান্তি ফিরে আসে এবং ইসরাইলের অভ্যন্তরে আরবদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়। এইলাৎ (Eilat) বন্দর সক্রিয় হয়ে উঠে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ইসরাইলের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং যাতায়াতের জন্য আকাবা উপসাগর (Gulf of Aqaba) এবং তিরান প্রণালীকে (Straits of Tiran) উন্মুক্ত রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আরবদের মধ্যে ইসরাইলকে ধ্বংস করার প্রচার অবশ্য পূর্ণোদ্যমেই চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটে। 1959 খৃষ্টাব্দে মহাসচিব সাধারণ সভায় বলেন যে আরব-ইসরাইল সীমান্তে মোটামুটি ভাবে শান্তি বজায় থাকলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীকে অপসারণ করলে আবার সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সিরিয়ার সহায়তায় সেখানে এল্ ফাতাহ (El Fatah) নামে এক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠে এবং ইসরাইলের অভ্যন্তরে আবার অনু-প্রবেশের চেষ্টা আরম্ভ হয়। 1955 খৃষ্টাব্দ থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে আরম্ভ করে এবং ইসরাইলের সেনাবাহিনী জর্ডন ও লেবাননের গ্রামের ভেতর এই সন্ত্রাসবাদীদের কেন্দ্রগুলি আক্রমণ করতে থাকে। আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। নাসের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সৈন্য সমাবেশ করতে আরম্ভ করলেন এবং 1957 খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাসচিব ইউ থাণ্ট (U Thant)-কে সিনাই উপদ্বীপ এবং গাজা (Gaza Strip) থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীকে অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইজিপ্টের এই অনুরোধের

ফলে ইউ থাণ্ট জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী অপসারণ করতে বাধ্য হলেন। নাসের তিরান প্রণালী (Straits of Tiran) অবরোধ করে সিনাইতে বিপুল ভাবে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। তিরান প্রণালীকে উন্মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজন হ'লে ইসরাইল যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত—ইসরাইল সরকার স্পষ্ট ভাবে কয়েকবার এই কথা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সও এই প্রণালী উন্মুক্ত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এমন অবস্থায় 5 জুন (1957) ইসরাইল ইজিপ্ট আক্রমণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইজিপ্টের বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। ইজিপ্টের সামরিক বাহিনী এবং জর্ডন ও সিরিয়ার বাহিনীকেও ইসরাইল সহজেই পরাজিত করে। ছয় দিনের যুদ্ধে আরবদেশসমূহ শোচনীয় ভাবে ইসরাইলের কাছে পরাজিত হ'ল। এই পরাজয়ের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধবিরতির এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বের সীমান্তে ইসরাইলকে তার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করার নির্দেশ দেয়। ইসরাইল সিনাই অঞ্চল থেকে তার সেনাবাহিনী অপসারণ করতে রাজী হয় না এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অনেক চেষ্টা করেও এ বিষয়ে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে না। 1953 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় আরব-ইসরাইল সংগ্রাম আরম্ভ হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। সীমান্তে শান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যও সেখানে প্রেরণ করা হয়। জেনেভাতে দুই পক্ষে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য কার্যাবলী

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কাজ হ'লেও তা একমাত্র কাজ নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সমস্ত দেশের উন্নতি সাধন করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সব কাজ আমাদের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট না করলেও তাদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং জাতিপুঞ্জের মূল্যায়নের সময় এই সব কার্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। নিম্নে এই সব কার্যাবলীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করার জন্য 1943 সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization—FAO)

নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে চুক্তি করে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতিপুঞ্জের সাথে যুক্ত একটি বিশেষ সংস্থায় (specialized agency) পরিণত করা হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নিজস্ব সংবিধান ও সদস্য আছে এবং এই সদস্যরা সংস্থার জন্য পৃথক ভাবে চাঁদা দিয়ে থাকে। দুই বৎসর অন্তর এই সংস্থার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন পোকার উপদ্রব থেকে কৃষি উৎপাদন রক্ষা, রোগের হাত থেকে উদ্ভিদ ও ও জীবজন্তুকে বাঁচান, খাদ্য ভালভাবে সঞ্চয় করে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য এই সংস্থা বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করে। জমির উন্নতি সাধন এবং সার প্রয়োগ সম্বন্ধে এই সংস্থা বিভিন্ন দেশকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। বিদেশে গিয়ে উন্নত ধরনের চাষ প্রণালী শিক্ষার জন্য এই সংস্থা অর্থ সাহায্যও দিয়ে থাকে। কৃষি, মৎস্য, বনসম্পদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সম্বলিত পুস্তকপুস্তিকা এই সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাহায্যে অনুন্নত দেশগুলির উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপারেও এই সংস্থা বিভিন্ন দেশকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

1946 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization—WHO) স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয় এবং 1948 খৃষ্টাব্দের 7 এপ্রিল স্থায়ী ভাবে এই সংস্থাকে গড়ে তোলা হ'ল। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 7 এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই সংস্থা সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে বিভিন্ন রোগ দূর করে জনস্বাস্থ্য উন্নত করার কাজে সাহায্য করে। ম্যালেরিয়া, ক্ষয়রোগ, সিফিলিস, কুষ্ঠ, টাইফাস, ডিপ্থেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে এই সংস্থা যে অভিযান শুরু করেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। 1955 খৃষ্টাব্দে পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ আরম্ভ করে। এই সংস্থার চেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ আরম্ভ করে। এই সংস্থার চেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ রূপে দূর করা সম্ভব হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতে ডাক্তারী শিক্ষা প্রসারের জন্য এই সংস্থা নানাভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। অনুন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হলেও উন্নত রাজ্যগুলির নানাবিধ নতুন সমস্যা নিয়েও এই সংস্থাকে কাজ করতে হয়। অধিক শিল্পোন্নতির ফলে সেই সব দেশে নানাধরনের নতুন রোগ—বিশেষ করে মানসিক রোগ—দেখা দিয়েছে। কল কারখানার কাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাতাস দূষিত হয়ে যায় এবং তার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এই সব সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়েও বিশ্বস্বাস্থ্য বিভিন্ন আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে। এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ক্যানসার ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়েছে। মানুষের দেহে অতিরিক্ত ধূমপান, তাম্বূল সেবন এবং বিশেষ ধরনের ঔষধপত্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও নানাধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। তাই মানবসমাজের পক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

শিশুদের নানাভাবে সাহায্য করার জন্য 1946 খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা একটি বিশেষ সংস্থা সৃষ্টি করে। এই সংস্থা United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) নামে পরিচিত। যুদ্ধে বিধ্বস্ত অসংখ্য পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা (United Nations Relief and Rehabilitation Administration—UNRRA) নামে প্রথমতঃ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিল। 1946 খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং যে সব শিশুদের তখনও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাদের জন্য এই নতুন সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। UNICEF বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্য, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ সাহায্য দিয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা, গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে প্রয়োজনীয় বিষয়ে মা ও ধাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া, শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, শিশুদের লালনপালন করার উন্নততর প্রণালী শিক্ষা দেওয়া—এই সব বিষয়ে UNICEF-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা অনেক ক্ষেত্রেই WHO এবং FAO-এর সহযোগিতায় কাজ করে থাকে। 1953 খৃষ্টাব্দে এই সংস্থাকে UN Children's Fund নাম দেওয়া হয় তবে UNICEF নামও প্রচলিত আছে।

1945 খৃষ্টাব্দে নভেম্বরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংস্থার (United Nations Educational Scientific Cultural Organization—UNESCO) সংবিধান রচনা করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এই সংস্থার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত। জাতিপুঞ্জের সদস্য না হয়েও এই সংস্থার সদস্য হওয়া সম্ভব। অর্থের জন্য UNESCO জাতিপুঞ্জের উপর নির্ভরশীল নয়—সদস্যরাষ্ট্ররা প্রত্যক্ষ ভাবে এই সংস্থাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। দুই বৎসরে একবার করে UNESCOর সাধারণ সম্মেলন (General Conference) অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনেই বাজেট এবং সদস্যরাষ্ট্রদের দেয় চাঁদার হার স্থির করা হয়। 30 জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কার্যকরী সমিতি সংস্থার কার্য পরিচালনা করে।

অনুন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করা এই সংস্থার একটি অন্যতম প্রধান কার্য। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এই সংস্থার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব দেশে উপযুক্ত শিক্ষক, বিদ্যালয় গৃহ, পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয় পরিচালক গড়ে তোলার জন্যও UNESCO নানাভাবে চেষ্টা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষার জন্য কয়েকটি আধুনিক শিক্ষায়তনও UNESCOর চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক রচনা, প্রকাশ এবং বিতরণের জন্য এই সংস্থা 1955 খৃষ্টাব্দে করাচীতে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কেন্দ্রের কার্য কেবল মাত্র পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকে না—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পারস্য, আফগানিস্তান, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, এই সব দেশে এই কেন্দ্রের কার্য প্রসার লাভ করে। কয়েকটি দেশে UNESCO সর্বসাধারণের জন্য লাইব্রেরীও স্থাপন করেছে।

বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার জন্য UNESCO বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন আহ্বান করে থাকে। 1960 খৃষ্টাব্দে UNESCOর পরিচালনায় ভারত মহাসাগরকে বিশদ ভাবে পরীক্ষা করে দেখার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের 40টি জাহাজ এই কাজ আরম্ভ করে। এই মহাসাগরের নীচে কোথায় পাহাড় আছে, কোথায় কি খনিজ সম্পদ থাকা সম্ভব, স্রোতের গতি কোথায় কি রকম ইত্যাদি বিষয় এত বিশদ পরীক্ষানিরীক্ষা পূর্বে কখনও হয় নি। ভূমিকম্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য UNESCO টোকিওতে একটি বিশেষ

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই গবেষণার ফলে কখন ভূমিকম্প হ'তে পারে তা সঠিক ভাবে পূর্ব থেকেই জানা হয়ত সম্ভব হবে এবং ভূমিকম্পে ক্ষতি হবে না এমন ভাবে গৃহ নির্মাণ করার মত ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ইতিমধ্যেই অনেকখানি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে মিলন সেতু রচনা করে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগরিত করা UNESCO-র প্রধান আদর্শ। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং race সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস দূর করার জন্য UNESCO জাতি ব' race সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছে। এই সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত *Cultural and Scientific History of Mankind* পুস্তক সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত এবং মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্থা যুক্ত আছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development) সদস্য রাষ্ট্রের সরকার বা সরকারী কোন সংস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পকে প্রয়োজনমত অর্থ ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। সরকার ঋণ শোধের দায়িত্ব নিলে এই ব্যাঙ্ক অনেক সময় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য করে থাকে। ভারতবর্ষের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এই ব্যাঙ্ক থেকে বহু অর্থ সাহায্য পেয়েছে। রেঙ্গুনে একটি নতুন বন্দর স্থাপন করার কাজে, ইথিওপিয়ার জাতীয় পথ তৈরী করার জন্য, মেক্সিকোর জলসরবরাহ বৃদ্ধি করার প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই অর্থ প্রদান করে নানা দেশকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ মীমাংসা করতেও এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করে। ইজিপ্ট যখন সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে তখন এই খাল কোম্পানীর মালিকদের কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া প্রয়োজন তা এই ব্যাঙ্ক স্থির করে। দেয়। সিন্ধু নদীর জল নিয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে এই ব্যাঙ্কের সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশন (Internationai Finance Corporation—IFC) অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিতে বে-সরকারী উদ্যোগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। 1956 সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association—IDA) বিভিন্ন দেশকে রাস্তাঘাট, কৃষি, জলসরবরাহ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি

সাধনের জন্য অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। এই সংস্থা 1960 সালে স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধার সময় সদস্য রাষ্ট্রগুলি International Monetary Fund (IMF) থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। 1947 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং সেই সম্মেলনে শুল্ক ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়। সেই নীতিগুলি General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) নামে পরিচিত। উন্নতশীল দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অনেক বিষয়ে শুল্ক হ্রাস করতে রাজী হয় এবং অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ শুল্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে নেয়।

প্রত্যেক দেশের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গঠিত কয়েকটি সংস্থা বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির নাম হ'ল : International Telecommunication Union অথবা ITU (1865 খৃষ্টাব্দে স্থাপিত), Universal Postal Union অথবা UPU (1875 খৃষ্টাব্দে স্থাপিত), International Civil Aviation Organization অথবা ICAO (1947 খৃষ্টাব্দে স্থাপিত), World Meteorological Organization অথবা WMO, Intergovernmental Maritime Consultative Organization অথবা IMCO. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চারটি আঞ্চলিক কমিশন গঠন করেছে—একটি ইউরোপের জন্য (Economic Commission for Europe অথবা ECE), একটি এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য (Economic Commission for Asia and the Far East অথবা ECAFE), একটি ল্যাটিন আমেরিকার জন্য (Economic Commission for Latin America অথবা ECLA) এবং চতুর্থটি আফ্রিকার জন্য (Economic Commission for Africa অথবা ECA)।

অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের নাগরিকদের মৌলিক ও মানবিক অধিকার রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার নির্দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে 1946 খৃষ্টাব্দে মানবিক অধিকার সম্বন্ধে একটি

কমিশন (Commission on Human Rights) স্থাপন করে। 1948 খৃষ্টাব্দের 10 ডিসেম্বর সাধারণ সভা এই কমিশন কর্তৃক রচিত মানব অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) গ্রহণ করে এবং 1950 খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর 10 ডিসেম্বর মানব অধিকার দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হয়। 1955 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা মানব অধিকার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 1948 খৃষ্টাব্দের 9 ডিসেম্বর সাধারণ সভা গণহত্যা বা genocide সম্বন্ধে একটি বিশেষ দলিল গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানায়। যে সব রাষ্ট্রএই ঘোষণা গ্রহণ করে তারা তাদের সরকারী কর্মচারীসহ সমস্ত নাগরিকদের গণহত্যা সংক্রান্ত কার্য কলাপে লিপ্ত থাকলে সেই অপরাধে শাস্তি প্রদান করতে রাজী হয়। 1946 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে একটি কমিশন (Commission on the Status of Women) স্থাপন করে এবং 1952 খৃষ্টাব্দের 20 ডিসেম্বর নারীজাতির রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে একটি ঘোষণা (Convention on the Political Rights of Women) সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। সাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রকে সেই ঘোষণা মেনে চলার জন্য আবেদন জানায়। শিশুদের অধিকার সম্বন্ধেও একটি ঘোষণা 1959 সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ সভা গ্রহণ করে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-রক্ষা এবং শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। শরণার্থীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হন এবং 1951 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে এই দপ্তরের কাজ শুরু হয়।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদানও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘ ভেঙ্গে গেলেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organization) প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই বেঁচে থাকে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের একটি অন্যতম বিশেষ সংস্থা রূপে (specialized agency) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের জন্য এই সংঘ কারিগরী এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 1956 খৃষ্টাব্দ থেকে এই সংঘ automation এবং এই ধরনের

অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকশ্রেণী কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা নিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে, এবং উন্নতশীল বা উন্নয়নশীল সব দেশেই যেখানে শ্রমিক স্বার্থ এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ব্যাহত হয়েছে সেখানে এই সংঘ নানাভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। এই সংঘের চেষ্টায় International Institute for Labour Studies নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক ইউনিয়ন ও শিল্প পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং জনহিতকর অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ব্যাপক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিপুঞ্জের এই সব কার্যাবলী আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন

জাতিসংঘের মতই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে প্রচলিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির রীতিনীতি মেনে নিয়েই তার মধ্যে কাজ করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের ফলে রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয় নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে বিশ্বরাষ্ট্রের ভূমিকাপালন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। জাতিসংঘের মতই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের—বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির—সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। জাতিপুঞ্জের নিজস্ব ক্ষমতা জাতিসংঘের মতই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

জাতিসংঘের আদর্শেই যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গড়ে তোলা হয়ে থাকে তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে নতুন করে আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কি প্রয়োজন ছিল? জাতিসংঘকেই আবার সক্রিয় করে তোলা সম্ভব ছিল না কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাতিসংঘের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এই সংঘকে আবার সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হ'লেও তা উচিত হ'ত কি না সন্দেহ। তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও জাতিসংঘের সদস্য ছিল না এবং জাতিসংঘের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নেরও নিবিড় ও ঐকান্তিক সম্পর্ক কখনও গড়ে উঠে নি। সেই অবস্থায় একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলাই বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

জাতিসংঘের আদর্শে গঠিত হ'লেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে জাতি-সংঘের কোন পার্থক্য নেই তা বলা যায় না। তৎকালীন যুগের বৃহৎ শক্তিগুলি একই সাথে জাতিসংঘের সদস্য কখনও ছিল না. কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান শক্তিই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চীন) এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে। বর্তমানে কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণ করার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান শক্তিগুলি এই সংগঠনের সদস্য হয়ে এক সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাউন্সিলে বৃহৎ শক্তিগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে ভিটো প্রদান করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা নানাভাবে সমালোচনা করা যায় বটে কিন্তু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে এই নীতির প্রয়োজন ছিল। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বৃহৎ শক্তিগুলি নীতির উপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। এই বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যদি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সনদে বৃহৎ শক্তিগুলির বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘের তুলনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা অনেক 'বেশী ব্যাপক'— বিশেষ করে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জনহিতকর অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হ'লেও এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ও দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত দিকেই প্রসারিত। সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে পার্থক্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অনেক বেশী স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। নিরাপত্তা পরিষদে 'ভিটো' প্রথা থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভোট গ্রহণের পদ্ধতি অনেক বেশী সহজ এবং গণতন্ত্রসম্মত। জাতিসংঘ সর্বসম্মতিক্রমে ভোট গ্রহণের পদ্ধতিই সাধারণ ভাবে গৃহীত হয়েছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার অনেক উদাহরণ সহজেই দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রধানতঃ মানুষের আন্তর্জাতিক মনোভাব এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর। জাতিপুঞ্জ এই মনোভাব ও সহযোগিতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক কিনা সেটাই বিবেচ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে প্রচলিত

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়—প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির সাথে নতুন একটি পদ্ধতির সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য অন্তত: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে দায়ী করা চলে না।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বরাষ্ট্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা যে সম্ভব নয় সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই অনেকে মনে করেন যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের উপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারলে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু বর্তমান জাতীয় সার্বভৌমত্বের যুগে বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করা কি সম্ভব?

একটি জাতীয় রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি ভাবে রক্ষা করতে পারে। একটি দেশের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণী, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানা রকমের বিরোধ দেখা দেয়, কিন্তু সেই সব বিরোধ সত্ত্বেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকের মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ বর্তমান থাকে। একটি দেশের সমস্ত নাগরিকের ভাগ্য ও স্বার্থ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার উপরই নির্ভরশীল। এই ঐক্যবোধ ও বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থাকায় একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সাধারণতঃ যুদ্ধের আকার ধারণ করে না। তা ছাড়া একটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষ জাতীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে ন্যায় বিচার এবং তাদের ন্যায্য দাবী পূরণের আশা রাখে। প্রত্যেক দেশের সংবিধানই ন্যায়নীতি এবং বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোষ্ঠীগত এবং শ্রেণীগত বিরোধ উপস্থিত হ'লে নানা ধরনের কমিশন, অনুসন্ধান সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করে তা দূর করার চেষ্টা হয়। জনমত গঠন করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের নীতি পরিবর্তন করাও কোন ক্ষেত্রে সম্ভব। রাষ্ট্রের পুলিশ ও সামরিক শক্তি রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে বটে কিন্তু মনে রাখা উচিত যে কেবলমাত্র পুলিশ ও সামরিক শক্তি দিয়ে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা ভিন্ন কোন

রাষ্ট্র বা সরকার সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে না। তা সম্ভব হলে পৃথিবীর ইতিহাসে এতগুলি গৃহযুদ্ধ কখনও হত না। মনে রাখা উচিত যে গৃহযুদ্ধের সংখ্যা খুব কম নয় এবং সেগুলিকে নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ব্যতিক্রম মনে করে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়। Quincy Wright তাঁর বিখ্যাত *A Study of War* নামক পুস্তকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে 1800 খৃষ্টাব্দ থেকে 1914 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে 28টি গৃহযুদ্ধ এবং 85টি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন অঞ্চল, গোষ্ঠী, শ্রেণী ও দলের যদি জাতির প্রতি আনুগত্য না থাকে, জাতীয় সরকারের কাছ থেকে ন্যায় বিচার ও ন্যায্যদাবী পূরণের কোন আশাই যদি না থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সাহায্য না করে তবে কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়।

মোটামুটি ভাবে এক জাতিকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুগে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবীতে সেই ধরনের একটি বৃহত্তর রাষ্ট্র স্থাপন করা কি সম্ভব নয়? অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব খর্ব করে সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে একটি বৃহত্তর বিশ্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা কি সম্ভব? একমাত্র এই বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারলেই আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে অনেকে মনে করেন। এই বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করার পথে অন্তরায় কি? প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে রাষ্ট্র বা সরকার একটি কৃত্রিম জিনিষ নয়। একমাত্র যুক্তি দিয়ে বিচার করে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছামত রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যায় না। যন্ত্রকে আমরা যে ভাবে সৃষ্টি করি রাষ্ট্রকে সেই ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্র গড়ে উঠে। মানুষের স্বভাব, প্রেরণা বা প্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করে একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। বর্তমানে বিশ্বসমাজ বলে যদি কিছু থাকে তবে তা হল বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহযোগিতায় গঠিত আন্তর্জাতিক সমাজ। জাতীয় সমাজের উর্ধ্বে বিশ্ব সমাজ এখনও গড়ে উঠে নি এবং তা যতদিন না গড়ে উঠে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে উঠার কোন সম্ভাবনা নেই। নিজের দেশের স্বার্থে মানুষ আজ প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি মানুষের সেইরকম কোন আনুগত্য আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। একটি দেশের নাগরিক দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করতে পারে। দেশের লোকসংখ্যা অনেক বেশী হলেও তার দায়িত্ব দেশকে গ্রহণ করতেই হয়।

কিন্তু একটি রাষ্ট্র—যেমন ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কি অন্য দেশের অধিবাসীকে বিনা বাধায় কোন রকম নিয়ন্ত্রণ না রেখে নিজের দেশে বসবাস করার অধিকার দেবে? একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমস্ত অন্তরায় ও বিধিনিষেধ তুলে নিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র কি রাজী হবে? এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করার মত মনোবৃত্তি এখনও সৃষ্টি হয় নি। বিশ্বরাষ্ট্রের ক্ষমতা যতই সীমিত রাখা হোক না কেন বিশ্বরাষ্ট্রের পক্ষে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সৃষ্টি না হয় তবে সেই রাষ্ট্র কখনও বাস্তবরূপ পেতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে যদি বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা হয় তবে সেখানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হবে, কিন্তু ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা তা মেনে নেবে কি? প্রস্তাবিত বিশ্বরাষ্ট্রে যদি সমস্ত দেশ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলিকে যদি সেখানে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, তবে অন্যান্য রাষ্ট্র কি তা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে? আসলে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের জন্য যে মানসিক প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন তা আজ অনুপস্থিত। এই অবস্থায় আমাদের বিচারবিবেচনায় বিশ্বরাষ্ট্র যতই প্রয়োজনীয় বলে মনে হোক না কেন এই পরিকল্পনাকে অদূর ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ দূর করার সমাধান হিসেবে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা যতই নিখুঁত মনে হোক না কেন তার বাস্তব মূল্য বিশেষ কিছুই নেই। জাতীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ দূর করার সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে—সেই সমাধান নিখুঁত না হলেও তার মূল্য অনেকখানি। তবে সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বরাষ্ট্র কোন দিন সৃষ্টি হবে না এমন কথা বলাও নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1. ঠাণ্ডা লড়াই ও তার বিবর্তন
2. চীন-সোভিয়েত বিরোধ
3. জোটনিরপেক্ষতা

সূচনা

ইতিহাসের পটভূমি ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠ করা যায় না। বিশেষ করে সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো ও মূলনীতিগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয় এবং এই যুগের প্রধান ঘটনাগুলি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান ঘটনা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই। এই লড়াই-এর প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন এই দুই কম্যুনিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। আসলে চীন-সোভিয়েত বিরোধের জন্যই (অন্য কারণও আছে) ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই চীন-সোভিয়েত বিরোধের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। ঠাণ্ডা লড়াই এবং চীন-সোভিয়েত বিরোধের বাইরে থেকে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকার বহুসংখ্যক নতুন রাষ্ট্র জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে। এই জোটনিরপেক্ষতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অধ্যায়ে তাই সমকালীন রাজনীতির নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হ'ল :

1. ঠাণ্ডা লড়াই
2. চীন-সোভিয়েত বিরোধ
3. জোটনিরপেক্ষতা

1. ঠাণ্ডা লড়াই

ঠাণ্ডা লড়াই-এর বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধরনের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেই যুদ্ধ 'ঠাণ্ডা লড়াই' (cold war) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এই 'ঠাণ্ডা লড়াই'কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই লড়াই-এর মূলকথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই দুইটি রাষ্ট্রই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তারা super-power বা মহাশক্তি নামে পরিচিত হয়। তাদের ভেতর যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় তাই ঠাণ্ডা লড়াই নামে অভিহিত। এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর রাজনীতিকে bipolar politics বা দ্বিপক্ষীয় রাজনীতিও বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, উভয় পক্ষই ঠাণ্ডা লড়াই সম্বন্ধে তাদের নীতিকে রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং সাম্যবাদের নামে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে ঠাণ্ডা লড়াই পরিচালনা করে। তার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক মতবাদের লড়াই-এর রূপ ধারণ করে এবং উভয় পক্ষই প্রচারকার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়। চতুর্থতঃ, ঠাণ্ডা লড়াই-এর দুই পক্ষই যথাসম্ভব সামরিক প্রস্তুতি বাড়াবার পরেও প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিরত থাকে। এই লড়াইকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে দুই পক্ষের বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলেও উভয় পক্ষই যুদ্ধকে সেই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য চেষ্টা করে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন এসেছে এবং সমস্ত স্তরে উপরি উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সমান ভাবে গুরুত্ব পায় নি। এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর কারণ ও তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমি

যুদ্ধে জয়লাভের পরে বিজয়ী শক্তিসমূহ সব সময়ই নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। সেই সময় বিভিন্ন বিজয়ী শক্তির মধ্যে মতবিরোধ, ঝগড়াবিবাদ এবং এমনকি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে ভিয়েনা কংগ্রেসে বিভিন্ন বিজয়ী শক্তির মধ্যে তীব্র মতভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বল্কান যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ী শক্তিসমূহের মধ্যে এমন মতবিরোধ দেখা দেয় যে তার ফলে তখনই দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইতালী নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে এবং ফ্রান্সও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় না। তাই যুদ্ধে জয়লাভের পরে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতভেদ এবং বিরোধ মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের যে সব অঞ্চল বিভিন্ন মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয় তারা সাধারণতঃ সেই সব অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করার চেষ্টা করে। পূর্ব ইউরোপ এবং বল্কান অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ প্রবেশ করে এবং সে সব অঞ্চলে সোভিয়েত সরকার স্থায়ী ভাবে নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। ভৌগোলিক ভাবে নিজের দেশের সাথে যুক্ত থাকায় এবং স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতা লাভ করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সেই সব অঞ্চলে নিজের প্রভাব বজায় রাখা এবং সোভিয়েত মনোভাবাপন্ন সরকার স্থাপন করা সম্ভব হয়। বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় বহু পূর্ব থেকেই রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে এবং তুরস্কের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করার নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়া সেই নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার এক সুযোগ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এবং জাতীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রসারের উদ্দেশ্যে বল্কান অঞ্চলে যে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে তার ফলে ইউরোপের শক্তিসাম্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। যুদ্ধের পরে বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। বৃটেন তার সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ফ্রান্সের পক্ষেও সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক বেশী শক্তিশালী এবং জার্মানী ও ইতালী

পরাজিত হওয়ায় ইউরোপের শক্তিসাম্য বজায় রাখা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। পশ্চিমের শক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে সোভিয়েত ভীতি বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হয়। সেই অবস্থায় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পশ্চিমের শক্তিগুলির পক্ষে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ইউরোপে কোন যুদ্ধ আরম্ভ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে পারে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউরোপ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না এবং পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তি-গুলির সাথে চুক্তি স্থাপন করে মার্কিন সরকার সোভিয়েত-বিরোধী এক জোট সৃষ্টি করে। ইউরোপের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তখন এ্যাটম বোমার অধিকারী। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন একদিকে এ্যাটম বোমা প্রস্তুত করার জন্য পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালিয়ে যায় এবং অপর দিকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সাথে সম্পর্ক নিবিড়তর করে প্রচলিত (conventional) পদ্ধতিতে সামরিক প্রস্তুতি বাড়াতে থাকে। ফলে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়।

নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। নাৎসী দল ক্ষমতায় আসার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে একত্র হয়ে নাৎসীবিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স নাৎসী জার্মানী সম্বন্ধে তখন তোষণ-নীতি অবলম্বন করে। সেই তোষণ-নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সোভিয়েতবিরোধী নীতি রূপেই বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা তোষণ-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য পশ্চিমী দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ করে তোলে। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নাৎসী জার্মানীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে বড় শত্রু হিসেবে তখনও মনে করতে পারে নি। সোভিয়েতের সামরিক শক্তি সম্বন্ধেও তাদের সঠিক কোন ধারণা ছিল না। তাই পোল্যাণ্ডের সমস্যা নিয়ে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখনও বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েতের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার

জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করে না। সেই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নিজের নিরাপত্তার জন্য নাৎসী জার্মানীর সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে তখন পশ্চিমের শক্তিগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েতের মনোভাব পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সে সময় জার্মানীকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন বৃটেন ও ফ্রান্স তীব্র ভাবে এবং কঠোর ভাষায় সোভিয়েত সরকারের বিরূপ সমালোচনা করে। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্স সেই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সহযোগিতা করতে রাজী হল। যুদ্ধকালীন সহযোগিতা অতীতের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সমর্থ হয় না। জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার প্রশ্ন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয় তাতেই এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ্যাটম বোমা সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয়তায় সোভিয়েতের সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। কম্যুনিজমের আদর্শ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্টদের সাহায্য করার সোভিয়েত নীতি দুই পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টির পথে একটি বিরাট অন্তরায় ছিল এবং 1943 খৃষ্টাব্দে কমিণ্টার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ বিলুপ্ত হলেও সেই অন্তরায় দূর হয় না। তাই দেখা যায় যে যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তার কোন বলিষ্ঠ ভিত্তি ছিল না। যুদ্ধোত্তর কালে সেই বন্ধুত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হয় না।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধোত্তর কালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে যে সব সম্মেলন আহ্বান করা হয় তার মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমের শক্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্পষ্টই উপলব্ধি করে যে জার্মানীর পরাজয়ের পরে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার জন্য পূর্ব ইউরোপের কোন কোন দেশে সোভিয়েতের প্রভাব তারা নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নিলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশে স্বাধীন নির্বাচনের উপরেও জোর দেওয়া হয় এবং ইয়াল্টা (Yalta) সম্মেলনে (1945) এই সম্বন্ধে 'Declaration on Liberated Europe' বলে একটি

নীতিও ঘোষণা করা হয়।[1] 1944 খৃষ্টাব্দে মস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া হলেও পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে সেখানে কিছু বলা হয় না এবং পোল্যাণ্ডের সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ উপস্থিত হয়। জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পরে পোল্যাণ্ডের সরকার লণ্ডনে আশ্রয় নেয়, কিন্তু নাৎসী সেনাদলকে সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে তখন পোল্যাণ্ডের বে-সামরিক শাসনভার রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত Polish (Lublin) Committee of National Liberation-এর হাতে অর্পণ করে। এই কমিটি লণ্ডনের পোলিশ সরকারকে ফ্যাসিষ্ট বলে অভিহিত করে এবং লণ্ডনের পোলিশ সরকার এই লাবলিন (Lublin) কমিটিকে সোভিয়েতের তাবেদার বলে মনে করত। ইয়াল্টা সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ষ্ট্যালিন লাবলিন (Lublin) কমিটিকেই পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার রূপে স্বীকৃতি দিতে চান কিন্তু রুজভেল্ট ও চার্চিল পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিন পোল্যাণ্ডের অন্যান্য দল ও লণ্ডনস্থিত পোলিশ নেতাদের মধ্য থেকে কিছু সদস্য নিয়ে লাবলিন (Lublin) কমিটির সবকারকে পুনর্গঠন করতে রাজী হন। পশ্চিমী শক্তিগুলি এই সরকারকে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার হিসেবে মেনে নেয় এবং আশা করে যে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যাণ্ডে নতুন সরকার গঠিত হবে। এই অস্থায়ী সরকারের মধ্যে কিছু সংখ্যক অকম্যুনিষ্ট নেতা থাকলেও তা প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনেই ছিল এবং স্বাধীন নির্বাচনের উপর এই সরকার কোন গুরুত্বই আরোপ করে না। এখানে মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও স্বাধীন নির্বাচনের যে রীতি প্রচলিত আছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র ও স্বাধীন নির্বাচন

---

1. সেই Declaration-এর এক জায়গায় বলা হয় যে তাদের উদ্দেশ্য হল "to form interim governmental authorities broadly representative of all democratic elements in the population and pledged to the earliest possible establishment through free elections of governments responsible to the will of the people."

সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পোল্যাণ্ড ছাড়া সোভিয়েত লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও পশ্চিমী শক্তিগুলির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ সে সব দেশে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং সে সব অঞ্চলে পশ্চিমী শক্তিগুলির কোন হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না।

শত্রুপক্ষের বিভিন্ন দেশের সাথে শান্তিচুক্তির খসড়া প্রস্তুত করার জন্য প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব পটস্ডাম (Potsdam) সম্মেলনে (1945) গৃহীত হয়। এই কাউন্সিলের যতগুলি সম্মেলন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভের (Molotov) সাথে অপর চারটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। 1945 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে ইতালীর সাথে চুক্তির খসড়া নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম থেকেই বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। ত্রিয়েস্ট (Trieste) নিয়ে ইতালী ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বিরোধ ছিল এবং মলোটোভ ত্রিয়েস্ট শহরসহ সমস্ত অঞ্চল যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ মলোটোভের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ত্রিয়েস্টকে একটি উন্মুক্ত বন্দরে পরিণত প্রস্তাব দেয়। আফ্রিকায় অবস্থিত ইতালীর উপনিবেশ নিয়েও মতভেদ দেখা দেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্রিপোলী অথবা আফ্রিকার অন্য কোন ইতালীয় উপনিবেশকে শাসন করার অধিকার দাবী করে কিন্তু বৃটেন দৃঢ়তার সাথে সেই দাবীর বিরোধিতা করে। আফ্রিকা অথবা ভূমধ্য মহাসাগরের কোন অংশে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব প্রসারিত হলে বৃটেনের স্বার্থ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ ইতালীকে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হবে তা নিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরোধ শুরু হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও তুমুল মতবিরোধ দেখা দিল এবং 2 অক্টোবর চরম ব্যর্থতার ভেতর লণ্ডনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অধিবেশন শেষ হয়। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের পদ্ধতি মোটামুটি ভাবে স্থির করা সম্ভব হয়।

1946 খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বিতীয় অধিবেশন প্যারিসে শুরু হয়। এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে মার্চ মাসে ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুল্‌টনে (Fulton) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তীব্র সমালোচনা করেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক লৌহ যবনিকা (Iron curtain) গড়ে তুলেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে চার্চিল বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানান। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই বক্তৃতাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইং-মার্কিন জোট বা ব্লক (block) গড়ে তোলার প্রচেষ্টার জন্য ষ্ট্যালিন চার্চিলকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। অনেকে মনে করেন যে এই ফুল্‌টন বক্তৃতা থেকেই ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। প্যারিস সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ে—বিশেষ করে ইতালীর সাথে চুক্তি সম্বন্ধে—আপোষ সম্ভব হয়। স্থির হয় যে ত্রিয়েস্ট অঞ্চলকে দশ বৎসরের জন্য স্বাধীন অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হবে এবং উহার শাসনভার সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও যুগোস্লাভিয়ার উপর এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর অর্পণ করা হবে। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবীই মোটামুটি ভাবে মেনে নেওয়া হল এবং আফ্রিকায় ইতালীর উপনিবেশ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের উপর এবং তাদের পক্ষে সম্ভব না হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্যারিসে 29 জুলাই থেকে 15 অক্টোবর (1946) পর্যন্ত শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন চলে। এই সম্মেলনে 21টি দেশ যোগ দেয়—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, ইউক্রাইন, বাইয়েলোরাশিয়া (Byelorussia), অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, ব্রাজিল, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ইথিওপিয়া। এই সম্মেলনে সোভিয়েতের পক্ষ ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং তাই সোভিয়েতের সম্মতি ছাড়াই খসড়া চুক্তির কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব হল। কিন্তু তার ফলে সোভিয়েত পক্ষ ও সোভিয়েত বিরোধী পক্ষের মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। পরে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার জন্য পররাষ্ট্র

মন্ত্রীদের কাউন্সিল নভেম্বর মাসে (1946) নিউ ইয়র্কে তৃতীয় বারের জন্য মিলিত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে আবার তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হল এবং সোভিয়েতের সম্মতি ছাড়া শান্তি সম্মেলনে যে সব পরিবর্তন গ্রহণ করা হয়েছিল মলোটোভ তার কোনটাই মেনে নিতে রাজী হন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকলেই একটা আপোষ মীমাংসায় আসতে রাজী হন এবং ইতালী, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সাথে চুক্তিগুলির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। 1947 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়ার সাথে শান্তিচুক্তির খসড়া প্রস্তুত করার জন্য মার্চ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আবার এক বৈঠক হবে বলে স্থির হয়। কয়েকটি দেশের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হলেও সেই চুক্তিগুলি প্রস্তুত করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে যে তিক্ততার সঞ্চার হয় তা ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমি সৃষ্টি করে তোলে।

পারস্য ও তুরস্ক নিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পারস্যের তৈলসম্পদ যাতে অক্ষশক্তির হস্তগত না হয় এবং ভারতবর্ষের দিকে যাতে জার্মানী অগ্রসর হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে 1941 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এই সৈন্য অপসারণ করে নেওয়া হবে বলে স্থির হয়। 1944 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত সরকার পারস্যের তৈলসম্পদের উপর বিশেষ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে কিন্তু পারস্য সরকার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েতকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপর থেকে পারস্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে এবং রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তর অঞ্চলের আজেরবাইজান প্রদেশে 'তুদে' দল (Tudeh Party) স্বায়ত্তশাসন দাবী করে। পরে 1946 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পারস্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে এই সমস্যা উত্থাপন করে, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে পারস্যকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলাপ আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উপদেশ দেয়। ফলে পারস্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তর অঞ্চলের তৈল সম্পদের উপর বিশেষ অধিকার প্রদান করে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে মে মাসের (1946) প্রথম দিকে রুশ বাহিনী পারস্য পরিত্যাগ করে চলে যায়। 1947 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই চুক্তি

পারস্যের জাতীয় সংসদে ('মজলিস্') উপস্থাপিত হয়, কিন্তু সংসদ বিপুল ভোটাধিক্যে তা নাকচ করে দেয়। সোভিয়েত সরকার স্বভাবতঃই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োচনাতেই পারস্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্বাক্ষরিত তৈল সম্পর্কিত চুক্তি বাতিল করে দিতে সাহসী হয়। সেই অক্টোবর মাসেই পারস্যের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সামরিক কমিটির তত্ত্বাবধানে পারস্যের সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। সেই চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে পারস্য সরকার মার্কিন সরকারের অনুমতি ছাড়া সেনাবাহিনীর কোন ব্যাপারে অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে বলে যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্যকে আমেরিকার একটি ঘাঁটিতে পরিণত করাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য।

1945 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য তুরস্ক সরকারের উপরও চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। রাশিয়া তার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দার্দেলেনিজ ও বোস্ফোরাস অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্য পূর্বে বহুবার চেষ্টা করেছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক উত্তেজনা এবং কয়েকটি যুদ্ধও ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের নিরাপত্তা রক্ষা এবং প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বোস্ফোরাস ও দার্দেলেনিজ প্রণালীর সন্নিকটে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দাবী করে। তুরস্কের উপর আরও বিভিন্ন দাবীর কথা রাশিয়াতে আলোচনা হতে থাকে। পশ্চিমী শক্তিগুলির সমর্থন লাভ করায় তুরস্ক সোভিয়েতের কোন দাবীই স্বীকার করে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আলোচনায় এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রভাব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই (18 জানুয়ারী, 1946) পারস্যের সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধির সাথে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীসে বৃটিশ সেনাদলের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করে। ত্রিয়েস্টের স্বাধীন অঞ্চলের জন্য গবর্নর নিযুক্তির সমস্যায় দুই পক্ষের মধ্যে কোন আপোষ সম্ভব হয় না। এবং ফলে এই অঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নতুন সদস্য গ্রহণ করায় ব্যাপারে দুই পক্ষ আপোষহীন মনোভাব

গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব নতুন সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাব করে পশ্চিমী শক্তিগুলি তাতে বাধা দেয় এবং সেই বিষয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন বাতিল করে দেয়। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়মিত ভাবে 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। দুই পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। বৃহৎ পাঁচটি শক্তির সহযোগিতার উপরেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য নির্ভর করত কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই-এর জন্য সেই সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। 1945 খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে জাপান নিঃশর্তে মার্কিন সমর অধিনায়ক ম্যাক্ আর্থারের (General Mac Arthur) নিকট আত্মসমর্পন করে। জাপানের পরাজয়ের পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানই সবচেয়ে বেশী এবং পরাজয়ের পরে জাপানের উপর মার্কিন প্রভুত্বই স্থাপিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবস্থায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে এবং পূর্বে উল্লিখিত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1945) মলোটোভ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের কাছে জাপানের জন্য একটি মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল (Allied Control Council) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ডিসেম্বর মাসে মস্কোর একটি ঘরোয়া বৈঠকে বিভিন্ন মিত্রশক্তিকে জাপান সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণের কাজে যুক্ত করার জন্য টোকিওতে Allied Control Council এবং ওয়াশিংটনে একটি Far Eastern Commisson স্থাপন করা হয়। এই কাউন্সিল বা কমিশনের কার্যকরী কোন ক্ষমতাই ছিল না। আমেরিকা জাপানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং জেনারেল ম্যাক্ আর্থার কাউন্সিল বা কমিশনের সিদ্ধান্তকে কোন মূল্যই দিতেন না। কাউন্সিল বা কমিশনের উপদেশ ও প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা ম্যাক্ আর্থারকে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও তার কোন পরিবর্তন করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কোরিয়া ও চীনের সমস্যা নিয়েও মার্কিন ও সোভিয়েত সরকার পরস্পর বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল সোভিয়েত সেনাদলের এবং দক্ষিণাঞ্চল মার্কিন সেনাবাহিনীর অধিকারে ছিল। তার ফলে কোরিয়ার দুই অংশে এই দুই শক্তির কর্তৃত্ব স্থাপিত হল এবং

কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত (1950) কোরিয়ার সমস্যা নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। চীনকে কেন্দ্র করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের তীব্র মতবিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহৃতি পরে চীন সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন পক্ষের নীতিই খুব পরিষ্কার ছিল না। চীনে তখন চিয়াংকাইশেকের কুওমিনটাং (Kuomintang) দল ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। মোটামুটি ভাবে আমেরিকা চিয়াংকাইশেকের পক্ষে এবং রাশিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষে থাকলেও চীনের ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত থাকায় তাদের নীতির কোন স্পষ্টতা ছিল না। শেষ পর্যন্ত 1949 খৃষ্টাব্দে চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার স্থাপিত হয় এবং চিয়াংকাইশেকের সরকার ফরমোসা বা তাইওয়ান (Taiwan) দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে। চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার ও তাইওয়ানের চিয়াংকাইশেক সরকারের প্রশ্ন নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হয়।

মার্কিন প্রস্তুতি—ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা ও নাটো

1944 খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মতি নিয়ে গ্রীসে সৈন্য প্রেরণ করে। তখন গ্রীসের বামপন্থীদল ও রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশ সেনাদল এই গৃহযুদ্ধে রাজতন্ত্রের সমর্থক রক্ষণশীল দলের সাহায্যে কঠোর হস্তে বামপন্থীদের দমন করে। 1945 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে একটি চুক্তির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ শেষ হয় এবং তখন কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত বামপন্থী দলকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হল। 1946 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের নির্বাচনে রক্ষণশীল এবং রাজতন্ত্রের সমর্থক দল পপুলিষ্টরা (Populist) জয়লাভ করে এবং একটি গণভোটের মাধ্যমে গ্রীসে রাজতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হয়। তখন বামপন্থীদের উপর আবার অত্যাচার শুরু হল এবং গ্রীসের অর্থনৈতিক অবস্থাও দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেই অবস্থায় গ্রীসের বামপন্থীরা যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্টদের সহায়তায় বিদ্রোহ আরম্ভ করে। গ্রীস সরকার 1946 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে এই সমস্যা উত্থাপন করে এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর রীতি অনুযায়ী সোভিয়েত পক্ষ গ্রীস সরকারের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমী দেশগুলি গ্রীস সরকারের পক্ষে অভিমত

প্রকাশ করে। সেই সময় গ্রীসের অভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বিদ্রোহীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সেই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের পক্ষে গ্রীসের প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠে এবং বৃটিশ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তা জানিয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতঃই গ্রীসে কম্যুনিষ্ট বিরোধী সরকারকে সমর্থন করে, কিন্তু সেই সরকার যদি তখন ইংলণ্ডের সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় তবে গ্রীসে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভ প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। গ্রীসে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য স্থাপিত হলে তুরস্কেও কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কম্যুনিষ্ট প্রভাব রোধ করার জন্য বৃটেনের পরিত্যক্ত স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করে।

এই পরিস্থিতিতেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান 1947 খৃষ্টাব্দের 12 March তাঁর নীতি Truman Doctrine ঘোষণা করেন। গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চারশত মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করার জন্য তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্র বহির্দেশীয় চাপ ও আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘুর সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর তাদের সমর্থন করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। এই নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহকে নিজেদের ইচ্ছামত তাদের ভাগ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করা মার্কিন সরকারের প্রধান কর্তব্য। সেই সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক বিকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করাই মার্কিন সরকারের মূল লক্ষ্য বলে তিনি ঘোষণা করেন।[2]

এই ট্রুম্যান নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে ইউরোপে একটি সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠন করার মার্কিন নীতির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ট্রুম্যান নীতিকে ধরা যেতে পারে। এই নীতির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

2. "I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting the attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political processes."

সোভিয়েত প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করে রাখার ("Containment of Soviet power") চেষ্টা করে। তাই এই নীতি Containment policy নামে পরিচিত হয়। গ্রীসের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি ঘোষিত হলেও এই নীতি সাধারণ ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বত্রই প্রয়োগ করা হয়।

ট্রুম্যান নীতি ঘোষিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall plan) ঘোষণা করে। 1947 খৃষ্টাব্দের 5 জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল হারভার্ড (Harvard) বিশ্ববিত্থালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সাধারণ ভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সেই প্রসঙ্গে আমেরিকার সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীর অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কারণ তার অভাবে শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিরতা কোনটাই সম্ভব নয়।[3] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারপর থেকে ব্যাপক ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি গ্রহণের প্রধান কারণ হল এই যে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্টরা বিশেষ জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। ফ্রান্স ও ইতালীতে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাই এই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে কম্যুনিষ্টদের তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব হ্রাস করাই ছিল মার্শাল পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই দিক থেকে বিচার করলে মার্শাল পরিকল্পনাকে ট্রুম্যান নীতির ব্যাপকতর প্রয়োগ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে মার্শাল পরিকল্পনার একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে আমেরিকার শিল্প কারখানাগুলি সেখানে তাদের দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী করতে সক্ষম হয় না। তাই পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সরকারকে

---

3. "The United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world, without which there can be no political stability and no assured peace."

ঋণ দিয়েও আমেরিকার উৎপাদন ও বাজার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়, কারণ বিদেশী সরকার ঋণের অর্থ দিয়ে আমেরিকা থেকে জিনিষপত্র ক্রয় করতে বাধ্য থাকে।

মার্শাল পরিকল্পনায় ইউরোপীয় দেশগুলিকে একত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে বলা হয় এবং মার্কিন সরকার সেই প্রোগ্রামকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করতে রাজী থাকে। সেই অনুসারে ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ মার্শাল পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য প্যারিসে সমবেত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নও সেই সম্মেলনে যোগ দেয় কিন্তু সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটোভের সাথে শীঘ্রই পশ্চিমী দেশগুলির মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং পরে এই বিষয়ে আর কোন সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপের কোন দেশ যোগ দেয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে যে মার্শাল পরিকল্পনার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সোভিয়েত সরকার এই পরিকল্পনাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের মূলনীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। অন্য দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্শাল পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে এবং এই পরিকল্পনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন প্রকাশ বলে অভিহিত করে। যদিও মার্শাল ঘোষণা করেছিলেন যে এই পরিকল্পনা রাশিয়া সম্বন্ধেও প্রযোজ্য তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমুনিষ্ট প্রভাবিত অন্যান্য দেশকে অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। সেই ঘোষণার প্রচার মূল্য (propaganda value) যাই হোক না কেন মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের সাথে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারকে রোধ করার যে নীতি (containment policy) "ট্রুম্যান ডক্ট্রিন"-এ ঘোষিত হয়েছিল মার্শাল পরিকল্পনা সেই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক পশ্চিম ইউরোপের 16টি দেশ মার্শাল পরিকল্পনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য Committee for European Economic Co-operation নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে এবং পরে 1948 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এই সংস্থা Organization for European Economic Co-operation

(OEEC) নামে পরিচিত হয়। 1948 খৃষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস Foreign Assistance Act পাশ করে এবং ইউরোপীয় দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়া সংক্রান্ত কাজ করার জন্য Economic Co-operation Administration (ECA) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। এইভাবে মার্কিন সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হল তা European Recovery Programme (ERP) নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত না থাকায় ইউরোপ স্পষ্টভাবে দুইখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়।

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন এবং মার্শাল পরিকল্পনা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থা বা North Atlantic Treaty Organization (NATO) নামে একটি সোভিয়েত বিরোধী সামরিক সংস্থাও গড়ে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সম্পর্ক দ্রুত খারাপের দিকে যায় এবং জার্মানীর সমস্যা নিয়ে এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

1949 খৃষ্টাব্দের 4 April ওয়াশিংটনে 12টি দেশের প্রতিনিধি এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই দেশগুলি হল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, লাক্সেমবার্গ, ইতালী, নরওয়ে, দেনমার্ক, পর্তুগাল এবং আইসল্যাণ্ড। 1952 খৃষ্টাব্দে গ্রীস এবং তুরস্ক এবং 1955 খৃষ্টাব্দে পশ্চিম জার্মানী এই চুক্তির সদস্য হয়। একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাবনা এবং 14টি শর্ত নিয়ে এই চুক্তিটি রচিত হয়েছিল। প্রস্তাবনায় বলা হয় যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের সমস্ত আদর্শ ও নীতি মেনে নিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করার কথা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের কথাও চুক্তির প্রথম দুই শর্তে বলা হয়। তৃতীয় শর্তে বলা হয় যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সামরিক আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের চেষ্টায় এবং পরস্পরের সাহায্যে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার নীতি অনুসরণ করে চলবে। চতুর্থ শর্তে বলা হয়েছে যে স্বাক্ষরকারী কোন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা

যদি বিপন্ন হয় তবে তারা সকলে নিজেদের মধ্যে সে সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করবে। পঞ্চম শর্তটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে যে স্বাক্ষরকারী কোন একটি দেশ যদি আক্রান্ত হয় তবে তা স্বাক্ষরকারী সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলেই গণ্য করা হবে এবং তখন প্রত্যেকেই আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 51 ধারা অনুযায়ী (সেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একক বা যুগ্ম প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে) এই চুক্তিকে সমর্থন করা হয়। উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নাটো সংস্থার সদস্যদের সম্মতিক্রমে ইউরোপের অপর কোন রাষ্ট্রকেও নাটোর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে স্থির হয়। এই চুক্তি সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব করে এবং কাউন্সিলকে প্রয়োজন মত অন্যান্য সংস্থা স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়।

শীঘ্রই সদস্যরাষ্ট্র সমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে উত্তর আটলন্টিক কাউন্সিল (North Atlantic Council) গঠিত হয় এবং এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে সদস্যরাষ্ট্রদের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা দৃঢ়তর কর হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা কমিটি (Defence Committee) এবং এই কমিটিকে সাহায্য করার জন্য সমর অধিনায়কদের নিয়ে একটি সামরিক কমিটিও (Military Committee) গঠন করা হল। সামরিক কমিটির পক্ষ হয়ে ওয়াশিংটনে সর্বসময়ের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এই তিনটি দেশ থেকে তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি ছোট উপ-সমিতি (Sub-Committee) গঠিত হয়। সোভিয়েত আক্রমণ থেকে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করে। কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ (জুন, 1950) হওয়ার পরে সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে উত্তর আটলান্টিক কাউন্সিলের যে অধিবেশন বসে তাতে মার্কিন সরকার জার্মানীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। ফ্রান্স এই প্রস্তাবে বিচলিত বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে সমস্ত অঞ্চলের জন্য এক সংহত সামরিক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশন ব্রাসেলসে (Brussels) অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে জেনারেল

আইসেনহাওয়ারকে (General Eisenhower) নাটো সংস্থার প্রধান সেনানায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হল। তা ছাড়া ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর সরকারের সাথে আলোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সকে অনুরোধ করা হয়। 1951 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেনারেল আইসেনহাওয়ার প্যারিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্যারিসেই Supreme Headquarters Allied Powers Europe (S.H.A.P.E.) গঠিত হয়। 1954 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে পশ্চিম জার্মানীর উপর বৈদেশিক অধিকার শেষ হয় এবং 1955 খৃষ্টাব্দে জার্মানী উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সদস্য রূপে গৃহীত হল। পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে নাটো যে নীতি অবলম্বন করে তা সাধারণতঃ "forward strategy" নামে পরিচিতি। এই নীতির অর্থ হল যে পশ্চিম ইউরোপের যথাসম্ভব পূর্বপ্রান্তে সোভিয়েত আক্রমণকে প্রতিহত করা উচিত। পশ্চিম জার্মানী নাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই নীতি অনুসারে কাজ করার সুবিধা হয়।

শান্তির সময়ে নাটোর মত এত বৃহৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামরিক প্রস্তুতি পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নি। নাটো যেমন ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলশ্রুতি তেমনি নাটোর জন্যই আবার ঠাণ্ডা লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। এই সংস্থা স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়।

সোভিয়েত প্রস্তুতি : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ট্রুম্যান 'ডকট্রিন', মার্শাল পরিকল্পনা এবং নাটোর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Containment নীতি স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ও দলগুলির পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। 1947 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, ফ্রান্স ও ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হয়ে Communist Information Bureau বা Cominform (কমিনফর্ম) স্থাপন করে। এই সব দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়। যুগোস্লাভিয়ার

রাজধানী বেলগ্রেডে কমিনফর্মের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের যে কাজ শুরু হয় তা ব্যাহত করা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। কমিনফর্ম গঠিত হওয়ার পরে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টি ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হয়ে উঠে।

তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা আরম্ভ করে। অর্থনৈতিক ভাবে মার্শাল পরিকল্পনার জবাবে এই অঞ্চলের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি 1949 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Council of Mutual Economic Assistance (COMECON) স্থাপন করে। প্রথম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার অল্প পরেই আলবেনিয়াকে এবং প্রায় এক বৎসর পরে পূর্ব জার্মানীকে সদস্য করে নেওয়া হয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে পরস্পরকে সাহায্য করাই ছিল COMECON-এর উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে Comecon-এর কার্যকলাপ খুবই সীমিত ছিল কিন্তু পরে, বিশেষ করে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে, এর কার্যের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। সে সময়ে যুগোস্লাভিয়া[4] এবং চীনকে দর্শক হিসেবে COMECON-এর অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিম জার্মানীকে নাটোর অন্তর্ভুক্ত করা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে নিয়ে ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw pact) সম্পাদন করে। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া এবং পূর্ব জার্মানী 1955 খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পূর্ব জার্মানী এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এই চুক্তির দ্বারা গঠিত সম্মিলিত সেনাবাহিনীতে সামরিক সাহায্য দেওয়ার কোন দায়িত্ব পূর্ব জার্মানীর তখন ছিল না। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি এই চুক্তিকে সম্মিলিত

4. ষ্ট্যালিনের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুগোস্লাভিয়ার বিরোধ উপস্থিত হওয়ার যুগোস্লাভিয়াকে COMECON এর সদস্য করা হয় না।

জাতিপুঞ্জ সনদের 52 ধারা অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক আঞ্চলিক ব্যবস্থা বলেই অভিহিত করে এবং ঘোষণা করে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ না করে শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে কোন সদস্য রাষ্ট্র শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র সম্মিলিত ভাবে তা প্রতিরোধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করবে। চুক্তির সপ্তম ধারায় বলা হয় যে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র এই ধরণের অন্য কোন চুক্তিতে যোগদান করতে পারবে না। এই চুক্তির প্রথম মেয়াদ ছিল 20 বৎসর এবং অপর রাষ্ট্রের পক্ষেও এই চুক্তিতে যোগদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কনিয়েভ (Marshal Koniev)-কে ওয়ারসো চুক্তি সংস্থার প্রধান সেনানায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং মস্কোতে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল। এই চুক্তির ফলে বল্কানের কোন কোন অঞ্চলে সোভিয়েত সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরবর্তী কালে 1956 খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হলে এই ওয়ারসো চুক্তির শর্ত অনুযায়ীই রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী তা দমন করতে সাহায্য করে। নাটো ও ওয়ারসো এই দুই চুক্তি সংস্থা দ্বারা ইউরোপ সামরিক ভাবে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা লড়াই এবং দ্বি-পক্ষীয় রাজনীতির ফলে ইউরোপ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় প্রান্ত সীমায় এসে উপস্থিত হয়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটপরিবর্তন

ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল পরিকল্পনা, নাটো ইত্যাদি মার্কিন সরকারের policy of containment অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও আধিপত্যকে সীমাবদ্ধ রাখার নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 1950 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকের মধ্যে এই নীতি যথেষ্ট কার্যকরী কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অনেকের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে শীঘ্রই সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। কম্যুনিষ্টদের তথাকথিত বিশ্বষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় অনেকের কাছে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বৈদেশিক নীতি দুর্বল বলে মনে হয়। তাঁদের মতে কোরিয়ার যুদ্ধে এই দুর্বলতা বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা যায়। কোরিয়ার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে কিন্তু

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে যোগদান করে না। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন ক্ষতি হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের containment নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি ব্যাহত হলেও পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। আমেরিকার জনসাধারণ যখন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বৈদেশিক নীতির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে তখন 1952 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল আইসেনহাওয়ার রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। সেই নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম নেতা ডালেস্ (Dulles) ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা করে বিকল্প নীতি হিসেবে policy of massive retaliation অথবা policy of liberation-এর কথা উল্লেখ করেন। Containment নীতি অপেক্ষা massive retaliation বা liberation নীতি অনেক বেশী কার্যকরী বলে তিনি প্রচার করেন। এই নীতির মূল কথা হল যে সোভিয়েত অগ্রগতি রোধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করাই হবে মার্কিন নীতির লক্ষ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে (যেমন কোরিয়া) আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করবে। এই হল massive retaliation-এর অর্থ। ডালেস্ বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের নীতি গ্রহণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভবিষ্যতে কোন আঞ্চলিক যুদ্ধ (limited war) আরম্ভ করতে সাহসী হবে না। এই নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি জয়ী হয় এবং তারপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে মার্কিন সরকার এই নতুন নীতি গ্রহণ করে।

এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে বাস্তব ক্ষেত্রে আইসেনহাওয়ার বা ডালেস্-এর পক্ষে massive retaliation বা liberation-এর কোন নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। এই নীতি প্রকৃত পক্ষে নির্বাচনী প্রচার ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে ডালেস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির containment নীতিই অনুসরণ করে চলেন। পূর্বে পশ্চিম ইউরোপে ন্যাটো সৃষ্টি হয়েছিল এবং ডালেসের সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে 'মেডো' (MEDO—Middle East Defence Organization) এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়

'সিয়াটো' (SEATO—South East Asian Treaty Organization) সৃষ্টি হয়।[5] 'মেডো' এবং 'সিয়াটো' উভয়ই containment নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 1954 খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে আবার কোরিয়ার মত আঞ্চলিক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। ডালেস সেখানে massive retaliation-এর নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। অতএব প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াই-এর ইতিহাসে massive retaliation বা liberation-এর কোন নীতি অনুসৃত হয় নি।[6] সেই নীতি অনুসৃত হলে ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধেই পরিণত হত।

আসলে massive retaliation নীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। এই নীতি অনুসরণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। কিন্তু এ্যাটম বোমা এবং অন্যান্য পারমাণবিক অস্ত্র থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হলে মার্কিন জনসাধারণ সেই ধরণের মারণাস্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করতে পারে, কিন্তু পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সোভিয়েত প্রভাব দূর করার জন্য তারা সেই সব অস্ত্র ব্যবহার করতে রাজী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ডালেসের রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় আসার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এ্যাটম বোমা আবিষ্কার করে। সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এ্যাটম বোমার ব্যবহার ছিল আত্মহত্যারই সামিল। তৃতীয়তঃ, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি যে ভাবে পরিবর্তিত হয় তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে massive retaliation নীতি মোটেই কার্যকরী ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার লাল-ফৌজ পূর্ব ইউরোপের যে সব দেশে প্রবেশ করে সে সব দেশে স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের প্রভাব বিস্তার করতে

5. 'ন্যাটো'র মত 'সিয়াটো' এবং 'মেডো' মার্কিন প্রভাবাধীন কম্যুনিষ্ট বিরোধী দুইটি সামরিক সংস্থা। 1954 খৃষ্টাব্দে সিয়াটো এবং 1955 খৃষ্টাব্দে মেডো গঠিত হয়। সিয়াটোতে ফিলিপিনস, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, বৃটেন ও ফ্রান্স যোগ দেয়। তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্তান, ইরাণ ও বৃটেন নিয়ে মেডো গঠিত হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। পরে ইরাক মেডোর সদস্য পদ পরিত্যাগ করে।

6. "...massive retaliation contained a large element of bluff," Peter Calvocoressi, *World Politics Since 1945.*

সমর্থ হয়। অ-কম্যুনিষ্ট দেশে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের কোন চেষ্টা ষ্ট্যালিনের সময় বিশেষ দেখা যায় নি। কিন্তু ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে বুলগানিন এবং পরে খ্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়া ও আফ্রিকায় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক সাহায্য সাংস্কৃতিক আদান প্রদান, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সব নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে মার্কিন প্রভাব হ্রাস করে নিজের প্রভাব বৃধি করার নীতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে massive retaliation নীতি একেবারেই প্রযোজ্য ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নতুন নীতির মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন সরকারকেও নতুন নীতি অনুসরণ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তখন আর যুদ্ধের ভাষায় কথা বলা সম্ভব ছিল না। আসলে তখন দুই পক্ষের কাছেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক এবং তার ফলে দুই রাষ্ট্রই এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। খ্রুশ্চেভ সেই জন্য সহ-অবস্থান নীতি সমর্থন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়াই সমাজতন্ত্রের প্রসার সম্ভব বলে ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র নীতির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে এই নতুন নীতির প্রবর্তক বলা চলে। 1960 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডী মার্কিন কংগ্রেসের কাছে যে বাণী প্রেরণ করেন সেখানে তিনি প্রধানতঃ রাশিয়ার প্রতি নীতি ব্যাখ্যা করেই বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও প্রথম আক্রমণ করতে যাবে না, তবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত এবং পরে দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করার মত শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অর্জন করতেই হবে। সেখানে প্রেসিডেন্ট কেনেডী আরও বলেন যে অকস্মাৎ এবং অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলের ফলে যাতে যুদ্ধ আরম্ভ না হয় এবং কোন আঞ্চলিক যুদ্ধ যাতে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখাও মার্কিন সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। ডালেসের massive retaliation এবং liberation নীতির সাথে এই নীতির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সন্নিকটে যুদ্ধঘাঁটি

স্থাপন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। নাটো, মেডো প্রভৃতি সংগঠন সে জন্যই স্থাপন করা হয়। কিন্তু পরে পারমাণবিক অস্ত্র বহনক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের এত উন্নতি হয় যে, সে সব ঘাঁটির সামরিক গুরুত্ব অনেক কমে যায়। Interconti-nental ballistic missile প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই রাশিয়ার ভূখণ্ড এবং রাশিয়া থেকে মার্কিন ভূখণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব। সেই কারণে নাটো, মেডো প্রভৃতি সংস্থা এখন পর্যন্ত বজায় থাকলেও ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গুরুত্ব পূর্বের মত এখন আর নেই।

চীনের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতবিরোধ এবং শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রকৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। দ্বিপক্ষীয় রাজনীতি (bi-polar politics) এই বিরোধের ফলে ত্রিপক্ষীয় রাজনীতির (tri-polar politics) রূপ গ্রহণ করে। কম্যুনিষ্ট চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে থাকার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। কিন্তু চীন-সোভিয়েত বিরোধ যখন ব্যাপক ভাবে দেখা দিল তখন ধীরে ধীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে। সোভিয়েতের সাথে শত্রুতা আরম্ভ হওয়ায় চীনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্যই বহু বৎসর ধরে কম্যুনিষ্ট চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রবেশাধিকার পায় নি, কিন্তু পরে মার্কিন বিরোধিতা না থাকায় 1951 খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়া সম্ভব হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন্ (Nixon) স্বয়ং 1952 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পিকিং গিয়ে মাও-সে-তুং এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার ফলে চীন-মার্কিন সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেও মার্কিন সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়। নিক্সন্ 1952 খৃষ্টাব্দের মে মাসে মস্কো সফরে যান এবং 1953 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ (Leonid Brezhnev) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচনা করেন। নিরস্ত্রীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা এখনও চলছে। মার্কিন সোভিয়েত সম্পর্কে তখন আর ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিষয়ে

মতবিরোধ থাকলেও এই দুই মহাশক্তির সম্পর্ককে এখন আর শত্রুতার সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করা যায় না। এই নতুন সম্পর্ককে detente বলে অভিহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগ শেষ হলে বর্তমানে detente-এর যুগ শুরু হয়েছে। মার্কিন সরকারের বর্তমান নীতি হল সোভিয়েত ও চীন এই উভয় দেশের সাথেই মোটামুটি ভাবে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রধানতঃ চীন-সোভিয়েত বিরোধের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা চরমরূপ ধারণ করায় চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় রাষ্ট্রই মার্কিন সরকারের সাথে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক দল চিন্তানায়কের মনে সন্দেহ জেগেছে যে ঠাণ্ডা লড়াই নীতির আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা মনে করেন যে সোভিয়েত নীতির ভুল ব্যাখ্যা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে অপরিচ্ছন্ন ধারণার ফলেই মার্কিন সরকার ঠাণ্ডা লড়াই-এর নীতি গ্রহণ করে। ঠাণ্ডা লড়াই সম্বন্ধে এই ভাবে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁরা revisionist school নামে পরিচিত।

2. চীন-সোভিয়েত বিরোধ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একমাত্র রাশিয়াতেই কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়। সোভিয়েত সরকারের এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্বাস ছিল যে অচিরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সফল হবে, কিন্তু সেই আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে (যেমন ষ্ট্যালিনের সাথে ট্রট্স্কির এবং পরে ষ্ট্যালিনের সাথে বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ইত্যাদির) নানাবিধ মৌলিক প্রশ্নে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ঐক্য মোটমুটি ভাবে বজায় থাকে। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে মস্কোতে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিণ্টার্ন (Comintern) স্থাপিত হয় তার নির্দেশেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। অবশ্য ট্রট্স্কি চতুর্থ আন্তর্জাতিক স্থাপন করায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ঐক্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ যুগোস্লাভিয়ার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তার ফলে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সংহতি অনেকটা বিনষ্ট হয়। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কম্যুনিষ্ট চীনের মতপার্থক্য উপস্থিত হলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। চীন-সোভিয়েত বিরোধ কেবল মাত্র কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে নয়, বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

চীন-সোভিয়েত বিরোধের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

চীন-সোভিয়েত বিরোধের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এক দলের মতে এই বিরোধ মূলতঃ তত্ত্বগত বা ideological—বর্তমান অবস্থায় মার্কস্‌বাদ-লেলিনবাদকে প্রয়োগ করার কৌশল নিয়ে বিরোধ। অপর একদল মনে করেন যে এই বিরোধ প্রকৃত পক্ষে জাতীয় স্বার্থের বিরোধ— রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ এবং চীনের জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন না হওয়ায় বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। অনেকে আবার মনে করেন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জার-শাসিত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সাথে চীনের যে সংঘাত উপস্থিত হয় বর্তমান বিরোধ তারই ফলশ্রুতি। সেই সময়

ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং জাপানের মত রাশিয়াও চীনে নিজের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। তার ফলে তখন চীনাবাসীদের মধ্যে যে রুশবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয় তার সাহায্যে অনেকে বর্তমান বিরোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ আবার এই মতও প্রকাশ করেছেন যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উপর নেতৃত্ব নিয়েই দুই কম্যুনিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের অভিমত হল যে চীন এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উপর নেতৃত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে রাজী হয় না। এই সমস্ত ধারণাই আংশিক ভাবে সত্য এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চীন-সোভিয়েত বিরোধের সাথে যুক্ত। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে দুই দেশের মধ্যে তীব্র মতভেদ উপস্থিত হয় কিন্তু এই মতভেদের কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে বিশ্ব রাজনীতিতে দুই দেশের স্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা কোন দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয় না। বিশ্বপরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি দেশের পক্ষে যে নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যা এবং তার প্রয়োগ কৌশল স্থির করা হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের অবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা পৃথক হওয়ায় তাদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রয়োগ কৌশলও পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। অন্য কথায় বলা যায় যে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ভিন্ন হওয়ায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। চীন-সোভিয়েত বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পরে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন, অতীতের রুশ-চীন সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্যা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের প্রথম অধ্যায়

1949 খৃষ্টাব্দের পয়লা অক্টোবর কম্যুনিষ্টরা চীনদেশের জন্য প্রজাতন্ত্র (People's Republic of China) আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে বিশেষ কোন সাহায্য না পেয়েই মাও সে-তুং-এর নেতৃত্ব চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পরে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে মাও

সে-তুং নিজেই পরিচালনা করেন এবং অনেক সময় তিনি ষ্ট্যালিনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী পার্টির সংগ্রাম কৌশল স্থির করেন। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি মূলতঃ নিজের চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করে। সাফল্য লাভ করার পরে প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ডিসেম্বর মাসে (1949) মাও সে-তুং মস্কো আসেন এবং দুই মাস কাল সেখানে অবস্থান করে ষ্ট্যালিন ও অন্যান্য নেতাদের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সময়ে 1950 খৃষ্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারী রাশিয়ার সাথে চীনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে নাম মাত্র সুদে অর্থ নৈতিক সাহায্য দিতে এবং চীন ভূখণ্ডে রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত রেলপথের উপর সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হয়। একমাস পরে সিনকিয়াং অঞ্চলে তৈল সংগ্রহ এবং মধ্য এশিয়ায় বিমান চলাচল সম্বন্ধে চীন ও রাশিয়া উভয়ে মিলে 'মিশ্র কোম্পানী' (mixed companies) স্থাপন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং সে সম্বন্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। 1952 খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট-সেপ্টেম্বরে চীনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করার অব্যবহিত পূর্বে চৌ এন লাই মস্কো পরিদর্শনে আসেন এবং তার ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইতে চীন সম্পূর্ণ ভাবে সোভিয়েতের পক্ষ গ্রহণ করে এবং কোরিয়ার যুদ্ধে চীন-সোভিয়েত বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হয়।

1953 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই থাকে। 1954 খৃষ্টাব্দে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ পিকিং পরিদর্শনে আসেন এবং সেই বৎসরেই কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে রাশিয়া পোর্ট আর্থার পরিত্যাগ করে চলে যায় এবং চীন ও সোভিয়েত একত্রে যে সব 'মিশ্র কোম্পানী' স্থাপন করেছিল সেগুলির কাজ শেষ করে দেওয়া হয়। অর্থ নৈতিক ও কারিগরি সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সাথে আর একটি নতুন চুক্তিও সম্পাদন করে।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়

1956 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন এবং তাঁর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তখন থেকে রাশিয়াতে

de-Stalinization আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই সময় পিকিং প্রকাশ্যে খ্রুশ্চেভের নীতির কোন সমালোচনা করে নি কিন্তু পরবর্তীকালে চীন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির এই অধিবেশনকেই চীন-সোভিয়েত বিরোধের সূত্রপাত বলে বর্ণনা করে থাকে।[1] খ্রুশ্চেভ তাঁর এই ষ্ট্যালিনবিরোধী নীতি শুরু করার পূর্বে মাও সে-তুং-এর সাথে কোন আলোচনা করেন নি। এই নতুন নীতি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে এবং তাই এই ষ্ট্যালিন-বিরোধী নীতি ঘোষণা করার পূর্বে অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সাথে আলোচনা করা উচিত ছিল বলে মাও সে-তুং স্বভাবতঃই মনে করতে পারেন। মাও সে-তুং-এর পক্ষে ষ্ট্যালিনের নেতৃত্ব হয়ত বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু খ্রুশ্চেভ সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য ছিল না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উপর ষ্ট্যালিনোত্তর যুগেও রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মাও সে-তুং মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে এই কথা মনে রাখা উচিত যে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন অন্তরঙ্গতা কোন সময় স্থাপিত হয় নি।

ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশ সম্বন্ধে খ্রুশ্চেভের নীতিও চীন সমর্থন করতে পারে নি। 1956 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট চীন এই দুই দেশের ক্ষেত্রেই খ্রুশ্চেভের নীতির বিশেষ সমালোচনা করে। চীনের মতে পোল্যাণ্ডের উপর রাশিয়া জোর করে নিজের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে (great power chauvinism) এবং হাঙ্গেরীর প্রতি-বিপ্লবী শক্তিই প্রথম দিকে সোভিয়েতের সমর্থন লাভ করে। দুই ক্ষেত্রেই চীনের পরামর্শে সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ অবলম্বন করে বলে চীন সরকার দাবী করেন। তবে এই সব বিষয়ে মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, তা খুব গুরুতর আকার ধারণ করে নি।

1957 খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রুশ বিপ্লবের 40তম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর অধিবেশনে মাও সে-তুং উপস্থিত ছিলেন এবং সেই অধিবেশনে চীন-সোভিয়েত বিরোধ দেখা না গেলেও চীনের নীতি ও রাশিয়ার নীতি যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেই বৎসরই সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নত ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র বহনক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করে এব

মহাকাশে স্পুট্নিক (sputnik) প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। মাও সে-তুং সোভিয়েত ইউনিয়নের এই উন্নত ধরনের অস্ত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রয়োগ করতে উৎসাহী ছিলেন। সেই অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন যে বর্তমানে পশ্চিমের হাওয়া থেকে পূবের হাওয়ার জোর অনেক বেশী অর্থাৎ সোস্যালিষ্টরা সাম্রাজ্যবাদীর চেয়ে অনেক শক্তিশালী।[2] তিনি বলেন যে শত্রুকে সাধারণ ভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করা কিন্তু কোন বিশেষ শত্রু সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় তার শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ ভাবে অবহিত থাকাই চীনের রীতি।[3] এই ভাবে চিন্তা করেই মাও সেই সময়কে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ বলে মনে করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে সামরিক শক্তিতে তখন সমাজতান্ত্রিক জোট অনেক শক্তিশালী। পরবর্তীকালে রাশিয়া থেকে বলা হয় যে এই প্রসঙ্গে মাও সে-তুং বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য ভবিষ্যতের যুদ্ধে সাড়া পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের প্রাণ যদি নষ্ট হয় তবুও সে মূল্য দেওয়া উচিত। চীন থেকে এই কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছিল যে মাও সে-তুং চীনবাসীর অর্ধেক লোকের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। যাই হোক চীন সেই সময় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ কিন্তু তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারী, 1956) ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয় এবং যুদ্ধ ছাড়াই হয়ত পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হবে। 1957 খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের মস্কো অধিবেশনের পরে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় তাতেও এই কথা বলা হয়েছিল।

রাশিয়া ও চীন উভয় রাষ্ট্রই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তবুও বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠে। রাশিয়া যুদ্ধ ছাড়া শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই সমাজতন্ত্র স্থাপন সম্ভব বলে

2. "I think the characteristic of the situation to-day is the East wind prevailing over the West wind. That is to say, the socialist forces are overwhelmingly superior to the imperialist forces."

3. "Strategically we should slight all enemies, and tactically we should take into full account of them...If we do not slight the enemy as a whole, we shall be committing the mistake of opportunism.... But on concrete questions and on questions concerning each and every particular enemy, if we do not take full account of the enemy, we shall be committing the mistake of adventurism."

মনে করে, আর চীন সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বলে ঘোষণা করতে থাকে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে রাশিয়া আমেরিকার সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা আরম্ভ করে চীন তাকে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা চিন্তা করেই যুদ্ধ বর্জনের নীতি অনুসরণ করে। সাধারণ যুদ্ধও শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হতে পারে, এই ভয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাসম্ভব সমস্ত রকম যুদ্ধকেই পরিহার করার চেষ্টা করে। এই নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেছিল। কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্যই চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রবেশাধিকার পায় নি। মার্কিন সপ্তম বহরের তৎপরতার জন্য চীনের পক্ষে তাইওয়ান (Taiwan) অধিকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন কি চীনের উপকূলবর্তী কুময় (Quemoy), মৎস্থ (Matsu) দ্বীপপুঞ্জগুলির উপরও চীন নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। অতএব চীনের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। চীনের জাতীয় স্বার্থেই তা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাশিয়ার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম। মার্কিন সরকার দ্বারা চীন তার ন্যায্য অধিকার থেকে যে ভাবে বঞ্চিত ছিল, রাশিয়া সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন পৃথিবীর বৃহত্তম দুই মহাশক্তি বা superpower. প্রভাবপ্রতিপত্তিতে দুই রাষ্ট্রই সম মর্যাদার অধিকারী এবং উভয়ই পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার অর্থ হল উভয়েরই বিলুপ্তি। এমন অবস্থায় যুদ্ধের পথ গ্রহণ করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে হলে অন্য পথেই তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই কারণে চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে একই ধরনের বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য উভয়ই নিজের নীতিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা করে।

1957 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সম্মেলনের পর রাশিয়া ও চীনের মধ্যে মতবিরোধ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেত থাকে। 1958 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন

যুগোস্লাভিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নতির জন্য যখন চেষ্টা শুরু করে ঠিক তখনই চীনে যুগোস্লাভিয়ার তথাকথিত শোধনবাদী (revisionism) নীতির তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত চীন যুগোস্লাভিয়ার নামে প্রকৃত পক্ষে রাশিয়ার সমালোচনাই করতে থাকে। 1959 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ক্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আইসেনহাওয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দুই দেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুই নেতার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে অনেক আলাপ আলোচনা হয়। স্বভাবতঃই চীন রাশিয়ার এই প্রচেষ্টায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যেই আমেরিকা থেকে ফিরে কয়েকদিন পরেই ক্রুশ্চেভ পিকিং যান। পিকিং-এ ক্রুশ্চেভের সাথে আলোচনার পরেও চীনের মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হয় না এবং আলোচনার শেষে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয় না। তারপর থেকে চীন ও রাশিয়া উভয়ই পরস্পরকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে থাকে এবং 1960 খৃষ্টাব্দে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অনেক অবনতি ঘটে। 1960 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে রোমে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্টদের বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে রাশিয়ার প্রতিনিধি চীনের মনোভাব ও নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এপ্রিলে লেনিনের 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি মিলিত হয় এবং সেখানেও রাশিয়া ও চীন পরস্পরকে আক্রমণ করে। জুন মাসে বুখারেষ্টে রুমানিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির এক অধিবেশনে চীন প্রতিনিধি পিকিং-এর মেয়র চেন্ পেং (Chen Peng)-এর সাথে ক্রুশ্চেভের সরাসরি বাগবিতণ্ডা হয় এবং ক্রুশ্চেভ সেখানে স্পষ্ট ভাষায় মাও-এর নিন্দা করেন। তারপর অগাষ্ট মাসেই চীনে নিযুক্ত রাশিয়ার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কারিগরকে (সংখ্যায় প্রায় 12 হাজার) ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। তাঁরা যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছিলেন সে সব পরিকল্পনাসহ তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়। ফলে চীনের পুনর্গঠন কার্যে এক দারুণ সমস্যা দেখা দেয়। নভেম্বর মাসে (1960) মস্কোতে 81টি বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী তেং সাইয়ো-পিং (Teng Hsaio-Ping) পার্টির নীতিকে জোর দিয়ে সমর্থন করেন এবং সোভিয়েত পার্টির নির্দেশে তাঁরা তাঁদের নীতি পরিত্যাগ করতে পারবেন না বলে ঘোষণা করেন। আলবেনিয়ার নেতা এনভার হোক্স্‌হা (Envar Hoxha) চীনের নীতিকে সমর্থন করেন এবং চীন-সোভিয়েত বিরোধে

আলবেনিয়ার সমর্থন লাভের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আলবেনিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ করেন। অধিবেশনের শেষে 6 ডিসেম্বর দুই পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য স্থাপন করে একটি আপোষমূলক বিবৃতি প্রকাশ করা হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে আবার কারিগরী সাহায্য দিতে রাজী হয়। কিন্তু ঐক্য স্থাপনের এই চেষ্টা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। চীনের বন্ধু আলবেনিয়ার সাথে সোভিয়েতের সম্পর্ক দ্রুত খারাপের দিকে যায় এবং আলবেনিয়া থেকে সোভিয়েত কারিগর সরিয়ে আনা হলে সেখানে চীনা কারিগর এসে আলবেনিয়াকে সাহায্য করতে থাকে। 1951 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির 22-তম অধিবেশনে খ্রুশ্চেভ প্রকাশ্য ভাবে আলবেনিয়ার কঠোর সমালোচনা করেন এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই এই ধরনের সমালোচনার তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দেন। পরে ষ্ট্যালিনের সমাধিতে মাল্য প্রদান করে চৌ এন-লাই মস্কো পরিত্যাগ করেন।

1952 খৃষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার সাথে সম্পর্কের উন্নতির জন্য ব্রেজনেভ বেলগ্রেডে যান কিন্তু চীন এই প্রচেষ্টার কঠোর সমালোচনা করে। সেই বৎসরেই চীন-ভারত সীমান্তে সংঘর্ষ আরম্ভ হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সমর্থন করতে রাজী হয় না। সেই সময় কিউবা (Cuba)-র সমস্যা নিয়ে রাশিয়ার সাথে আমেরিকার যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হয়ে উঠে। যুদ্ধ এড়াবার জন্য খ্রুশ্চেভ কিউবাকে দেওয়া পারমাণবিক অস্ত্র অপসারণ করে আনতে রাজী হন এবং বিনিময়ে আমেরিকা কিউবাকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। চীন সোভিয়েত সরকারের এই নীতিকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ বলে বর্ণনা করে। চীনা কম্যুনিষ্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে 'কাগুজে বাঘ' (paper tiger) বলে বিদ্রূপ করত এবং খ্রুশ্চেভ ডিসেম্বর মাসে (1952) সুপ্রীম সোভিয়েতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেন যে যাঁরা 'কাগুজে বাঘ' কথাটি ব্যবহার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে সেই কাগুজে বাঘের পারমাণবিক দাঁত (nuclear teeth) আছে। 1952 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশনে সোভিয়েত নীতির সমর্থকরা প্রকাশ্যে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি সমালোচনা করতে থাকে। 1953 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পূর্ব জার্মানীর পার্টি অধিবেশনে চীনা প্রতিনিধিকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগই দেওয়া হয় না— জোরে চীৎকার করে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত করা হয়।

1953 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সাথে আর এক দফা আলোচনার প্রস্তাব করে। জুলাই মাসে মস্কোতে সেই আলোচনা আরম্ভ হয় কিন্তু আলোচনা চলার সময়েও দুই পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করতে থাকে। সেই ফেব্রুয়ারীতেই (1953) টাংগানিকার মোসিতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান সংহতি সম্মেলনের (Afro-Asian Solidarity Conference) আলোচনা থেকে চীন রাশিয়া সহ সমস্ত ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে। আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলনে ইউরোপীয়দের কোন স্থান নেই—এই ছিল চীনের যুক্তি। রাশিয়ার প্রতিনিধিদের বাধা দেওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। 14 জুলাই চীন-সোভিয়েত আলোচনা চলার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ঘটনার উল্লেখ করে চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ বা racialism-এর অভিযোগ আনে। সেখানে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে চীনের উদাসীন মনোভাবকেও তীব্র ভাবে সমালোচনা করা হয়। আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে 16 জুন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ব্যাখ্যা করে চীনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার উত্তরেই রাশিয়া এই সব অভিযোগ ও সমালোচনা প্রকাশ করে। চীন-সোভিয়েত আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে 20 জুলাই শেষ হয়। সেই সময়ে পারমাণবিক পরীক্ষা আংশিক ভাবে বন্ধ করে মস্কোতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সেই চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। রাশিয়া থেকে বলা হয় যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করার জন্য অর্থ ব্যয় না করে চীন সরকারের উচিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য চেষ্টা করা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে কোন তথ্য চীনকে জানাতে রাশিয়া অস্বীকার করে। তা সত্ত্বেও চীন পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে থাকে এবং 1960 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রথম সাফল্য অর্জন করে। চীন আজ পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে চীন সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নত করার উদ্দেশ্যে আরও চেষ্টা চলতে থাকে। 29 নভেম্বর (1953) ক্রুশ্চেভ চীনের সাথে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা স্থাপনের জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু চীন তা প্রত্যাখান করে। সিনকিয়াং অঞ্চলে চীন-সোভিয়েত সীমান্তে তখন নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। সেই অঞ্চলের

সীমান্তের দুই দিকেই কাজাক (Kazakh), কিরঘিজ (Kirghiz) প্রভৃতি জাতি বাস করে এবং 1960 খৃষ্টাব্দ থেকে হাজার হাজার মানুষ চীন ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয় নেয়। চীন সরকারের মতে সোভিয়েত 'এজেন্ট'রা জোর করে এবং নানা প্রলোভন দেখিয়ে এই সব লোকদের নিজেদের ভূখণ্ডে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বলা হয় যে চীন সরকারের অত্যাচারেই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয় নেয়। 1954 খৃষ্টাব্দে মাও সে-তুং একদল জাপানী রাজনীতিবিদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ রূপেই আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মঙ্গোলিয়াকে স্বাধীন করার নামে প্রকৃত পক্ষে সেখানে নিজের আধিপত্যই বিস্তার করে এবং রুমেনিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অংশবিশেষ সোভিয়েত ইউনিয়ন জোর করে অধিকার করে নিয়েছে। বৈকাল হ্রদের পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জার-শাসিত রাশিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত সে সাম্রাজ্য ভোগ করে চলেছে বলে মাও সে-তুং অভিযোগ করেন। অতীতে চীনের যে ভূখণ্ড রাশিয়ার করতলগত হয় তা চীন দাবী করতে পারে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ (Kurile Islands) জাপানকে ফিরিয়ে দেওয়াই সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তব্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই সাক্ষাতকারের বিবরণ জাপানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। 15 সেপ্টেম্বর (1954) ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমারেখা যদি কোন দেশ ভঙ্গ করে তবে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

1954 খৃষ্টাব্দের 15 অক্টোবর ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত হন। এবং চীন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি তখন অনেকে আশা করেছিলেন কিন্তু কসিগিন (Kosygin) ও ব্রেজনেভ (Brezhnev) এই ব্যাপারে মোটামুটিভাবে ক্রুশ্চেভের নীতিই অনুসরণ করে চলেন। তাঁরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনেরই চেষ্টা করেন এবং অচিরেই চীন আবার সোভিয়েত বিরোধী প্রচারকার্য আরম্ভ করে। 1955 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে কসিগিন পিকিং সফরে যান কিন্তু চীন সরকারের মনোভাব মোটেই সহযোগিতামূলক ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর ভিয়েৎনামকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে রাজী নয় বলে চীন প্রচার করতে আরম্ভ করে।

মার্চ মাসে (1955) বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলন সংগঠন করার উদ্দেশ্যে যে আলোচনা সভা আহ্বান করা হয় তাতে চীন, আলবেনিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং রুমেনিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি যোগ দিতে অস্বীকার করে। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর তখন চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে আলবেনিয়া চীনের পক্ষে ছিল এবং রুমেনিয়া নিরপেক্ষ স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সেই আলোচনাসভা চলাকালীন 4 মার্চ চীনা ছাত্ররা মস্কোতে মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সোভিয়েত পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে। 1956 এবং 1957 খৃষ্টাব্দে চীনে সাংস্কৃতি বিপ্লব বা cultural revolution চলতে থাকে। 1956 খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে পিকিং-এ অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসের সম্মুখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং চীন থেকে রাশিয়ান ছাত্রদের বিতাড়ন করে রাশিয়া থেকে চীনা ছাত্রদের ফিরিয়ে আনা হল। ডিসেম্বর মাসে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন-ই (Chen yi) ব্রাজিলের একজন সাংবাদিককে বলেন যে রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তভাবে পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। 1957 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পিকিং-এর সোভিয়েত দূতাবাসের সম্মুখে আবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ এত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এত বেশী লোক যোগদান করে যে ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। দুই সরকার তখন অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় পরস্পরকে সমালোচনা করতে আরম্ভ করে। চীন সোভিয়েত নেতাদের হিটলার এবং চিয়াংকাইশেকের সাথে তুলনা করে। ইউনিয়ন পূর্ব সীমান্ত নিয়েও দুই দেশের মধ্যে গোলমাল ও সংঘর্ষ শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেক সৈন্য সরিয়ে এনে চীনের সীমান্তে মোতায়েন করে। এই দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মাও সে-তুং এর মৃত্যুর পরে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে বলে যে আশা পোষণ করা হত তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে চীন-সোভিয়েত বিরোধের প্রভাব

Edward Crankshaw চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক নিয়ে যে পুস্তক রচনা করেছেন তার নাম দিয়েছেন *The New Cold War*. নামটি যথার্থই হয়েছে।

এই নতুন ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রভাবে রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রকৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে থাকার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিকিং-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। চীন-সোভিয়েত বিবাদ জোরদার হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার চীন-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে এবং কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন অনেকটা স্বাভাবিক। কম্যুনিষ্ট চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে পেরেছে এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিক্সন (Nixon) নিজে 1952 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পিকিং গিয়ে চীন-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ফলে সুদূর প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত চীন-বিরোধী দেশগুলিও চীনের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে জাপান চীনের বিরুদ্ধে একটি অন্যতম মার্কিন ঘাঁটিতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমানে চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জাপানের মত তাইওয়ানেও মার্কিন ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু অধুনা মার্কিন সরকার নীতিগতভাবে তাইওয়ানকে চীন ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই স্বীকার করে নিয়েছে। 1959 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উভয় দেশের সাথেই বন্ধুত্ব বজায় রাখার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করে চলেছে। তার ফলে হয়ত চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাবে। চীনের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতবর্ষ উভয়ের সম্পর্কই খারাপ থাকায় ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের পথ প্রশস্ত হয় এবং বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (অগাষ্ট, 1951)। রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব স্থাপনের যুগ এখনও আর নেই। পৃথিবীর প্রধান দুইটি কম্যুনিষ্ট দেশ পরস্পরের শত্রু এবং এই উভয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রই কম্যুনিষ্ট বিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নতি করার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট।

3. জোট নিরপেক্ষতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রধানত: ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি দ্বারাই নির্ধারিত হত। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপের বাইরের কোন দেশের সক্রিয় কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বৃটেনের পক্ষে আর জগৎজোড়া সাম্রাজ্য শাসন করার কোন ক্ষমতা ছিল না। ধীরে ধীরে বিনা প্রতিরোধে বৃটেন এশিয়া ও আফ্রিকায় তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশকে স্বাধীনতা প্রদান করে বিদায় নেয় এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। তার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই সব নতুন দেশ এবং ল্যাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ রাজনীতিতে 'তৃতীয় দুনিয়া' বা Third world নামে পরিচিত হয়। এই তৃতীয় দুনিয়ার সব রাষ্ট্রই দুর্বল ও দরিদ্র, কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা লাভ করে এই সব দেশ প্রায় একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়—ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। এই পরিস্থিতিতে তারা যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে তার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় এবং সেই সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে তারা পরস্পরের মধ্যে অনেকটা সহযোগিতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক নীতির মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য হল জোট নিরপেক্ষতা বা non-alignment. মার্কিন জোট এবং সোভিয়েত জোট কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে উভয় পক্ষের সাথেই বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন ভাবে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হল জোট নিরপেক্ষ নীতির মূলকথা। তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ এই জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র জোট নিরপেক্ষতা দ্বারা কোন দেশের

বৈদেশিক নীতির সকল দিক ব্যাখ্যা করা যায় না।—ঠাণ্ডা লড়াই বা Super Power রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই বৈদেশিক নীতি গড়ে উঠেছে। কেবল মাত্র এই নীতি দ্বারা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির নিজেদের ভেতর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সমস্ত জোট নিরপেক্ষ দেশ একই ভাবে জোট নিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করে না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমস্যা দ্বারা বিভিন্ন ভাবে জোট নিরপেক্ষ নীতির অর্থ প্রভাবিত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভ করার সাথে সাথেই ভারতবর্ষ, নামে না হলেও কার্যতঃ, জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। স্বাধীনতা লাভের পাঁচ মাস পূর্বেই 1947 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লীতে Asian Relations Conference নামে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সম্মেলন হয় তাতেই জোট নিরপেক্ষ নীতির সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী সরকার (Interim Government) পূর্বেই ঘোষণা করে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করাই ভারতের উদ্দেশ্য। Asian Relations Conference এ এশিয়ার যে সব নেতৃবৃন্দ মিলিত হন তাঁরা সকলেই এই নীতি সমর্থন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেন। 1949 খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে সমর্থন করে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। জোট নিরপেক্ষ নীতির বিবর্তনের ইতিহাসে এই সম্মেলনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 1954 খৃষ্টাব্দে তিব্বত সম্বন্ধে ভারত ও চীনের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সেই চুক্তিতে পাঁচটি নীতির উল্লেখ করে বলা হয় যে ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক এই পঞ্চশীল দ্বারা পরিচালিত হবে। পঞ্চশীলের আদর্শগুলি হল: (1) প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন (Mutual Respect for Territorial Integrity and Sovereignty) (2) অনাক্রমণ (non-aggression), (3) অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (non-intervention), (4) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য (equality and mutual assistance) এবং (5) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (peaceful co-existence)। এই পাঁচটি আদর্শ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য নয়, আন্তর্জাতিক জোট নিরপেক্ষতাও প্রধানতঃ এই নীতিগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 1955

খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ (Bandung Conference) আফ্রো-এশীয় দেশগুলির এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই সম্মেলনে চীন, পাকিস্তান বা থাইল্যাণ্ডের মত পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও যোগদান করে তবুও বান্দুং-এ আফ্রো-এশীয় দেশগুলি রাশিয়া বা আমেরিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে থেকে নিজেদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে এবং সেখানে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির ঐক্যের উপরই জোর দেওয়া হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপনের যে চেষ্টা আরম্ভ হয় তা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক বিরোধের জন্য (যেমন চীন-ভারত বিরোধ, পাক-ভারত বিরোধ) সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কিন্তু তবুও সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। সেই প্রচেষ্টার ফলেই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং এই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ায় অবস্থিত। সোভিয়েত জোট হতে বিতাড়িত পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশ যুগোস্লাভিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতিকে সমর্থন করে এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়। যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ইজিপ্টের নাসের, ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ প্রমুখ নেতার চেষ্টায় 1951 খৃষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে প্রথম জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন (Summit Conference) অনুষ্ঠিত হয়।

আজ পর্যন্ত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি পাঁচটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছে। প্রথমটি 1951 খৃষ্টাব্দে বেলগ্রেডে, দ্বিতীয়টি 1954 খৃষ্টাব্দে কায়রোতে, তৃতীয়টি 1950 খৃষ্টাব্দে লুসাকাতে, চতুর্থটি 1953 খৃষ্টাব্দে আলজিয়ার্সে এবং পঞ্চমটি 1956 খৃষ্টাব্দে কলম্বোতে।[1] প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে 25টি জোটনিরপেক্ষ দেশ যোগ দেয়, দ্বিতীয়টিতে 47টি দেশ, তৃতীয়টিতে 53টি, চতুর্থটিতে 75 এবং পঞ্চম সম্মেলনে 85টি দেশ যোগদান করে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে জোট-নিরপেক্ষ দেশের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য কি ? কোন্ দেশকে আমরা জোটনিরপেক্ষ দেশ বলতে পারি। প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন

আহ্বান করার পূর্বে জোট নিরপেক্ষ দেশ বলতে কি বুঝায় তা স্থির করার চেষ্টা হয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে জোটনিরপেক্ষ দেশের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়। সেগুলি হল :

1. জোট নিরপেক্ষ দেশ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করে চলবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত দেশগুলি সহ-অবস্থান মেনে নেবে ;

2. জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকা চাই ;

3. বৃহৎ শক্তিগুলির রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত সামরিক জোটের সদস্য হওয়া চলবে না ;

4. একটি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও একটি বৃহৎ শক্তির সাথে সরাসরি ভাবে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে বা একটি আঞ্চলিক সামরিক চুক্তির সদস্য হতে পারে যদি সেই চুক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত না হয় ;

5. একটি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন বৃহৎ শক্তিকে তার নিজের দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকারও দিতে পারে, কিন্তু তা বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হলে চলবে না।

তাই জোটনিরপেক্ষতার সাথে রাজনৈতিক মতবাদের কোন সম্পর্ক নেই। কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব যদি সেই রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বাইরে থেকে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার সমস্ত আন্দোলন সমর্থন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের সহ-অবস্থান স্বীকার করে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমস্ত শীর্ষ সম্মেলনেই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের—বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বা apartheid নীতির—তীব্র নিন্দা করে। আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়াতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের, এঙ্গোলা, মোজাম্বেক প্রভৃতি অঞ্চলে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের, কঙ্গোতে বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদের এবং ভিয়েৎনামে ও ল্যাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি অনেক প্রস্তাব পাশ করেছে। রোডেশিয়াতে

সংখ্যালঘু ইউরোপীয়দের শাসন, নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি, আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের কঠোর আক্রমণাত্মক মনোভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সব সময়ই সোচ্চার। বিশ্বশান্তির জন্য এই সব দেশ একদিকে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ও সমস্ত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা দাবী করে এবং অন্যদিকে কার্যকরী নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক সমস্ত রকম অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করার জন্য আবেদন জানায়। ভারত মহাসাগরকে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে রেখে শান্তির এলাকায় পরিণত করার জন্যও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি প্রস্তাব পাশ করে। জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক বিশ্বপরিস্থিতি সৃষ্টি করতেও বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। আমেরিকা ও রাশিয়া এই জোটের কোনটাতেই যোগ না দিয়ে উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে উভয় দিক থেকেই অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশ্বশান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন এবং সেই কারণে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সমস্ত রকম রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস করে সহ-অবস্থানের আদর্শ প্রচার করে। নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশগুলিকে এমন অর্থনীতি গ্রহণ করতে আবেদন জানায় যার ফলে উন্নয়নশীল নিরপেক্ষ দেশগুলির সুবিধা হয়। লুসাকা, আলজিয়ার্স এবং কলম্বো শীর্ষ সম্মেলনে তারা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন করে ঢেলে সাজাবার নানা রকম প্রস্তাব দেয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে জোটনিরপেক্ষতার গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে (United Nations) সক্রিয় করে তুলতে এবং জাতিপুঞ্জে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। নিরস্ত্রীকরণ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের ব্যাপারে (de-colonization) তারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় ভূমিকা দাবী করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) পাঁচটি বৃহৎ শক্তি 'ভিটো'র (Veto) মাধ্যমে যে আধিপত্য ভোগ করে, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি তা সমর্থন করে না। তারা মনে করে যে এই 'ভিটো' প্রথা প্রচলিত থাকায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিষদ অনেকটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই কলম্বো শীর্ষ

সম্মেলনে তারা নিরাপত্তা পরিষদ থেকে 'ভিটো' প্রথা বাদ দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যদের সমান অধিকার স্থাপন করার জন্য জাতিপুঞ্জ সনদের পরিবর্তন দাবী করে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে এই আন্দোলন একটি আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করার পূর্বে তার প্রস্তুতির জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধিরা আর একটি সম্মেলনে (Prep3ratory) মিলিত হন। শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখার জন্য স্থায়ী ভাবে একটি সংস্থাও স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থার নাম Co-ordinating Bureau. শীর্ষ সম্মেলন, প্রস্তুতি সম্মেলন এবং 'ব্যুরো'র মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুগঠিত আন্দোলনে রূপায়িত হয়েছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার এক সুযোগ লাভ করে। জোটনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত না হলে আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতা লাভ করেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়েই পড়ে থাকত। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি নিজেদের ভেতর ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছে বলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন আলোচনায়—বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায়—তারা অনেকটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ব্যাপারেও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলন গড়ে না উঠলে পৃথিবী হয়ত সম্পূর্ণরূপে দুইটি বা তিনটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক জোটে বিভক্ত হয়ে পড়ত। অস্ত্রসজ্জা, সামরিক জোট, ভয় প্রদর্শন ও উত্তেজনা সৃষ্টি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে অন্য ভাবে গড়ে উঠতে পারে তার একটি নমুনা আমরা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ক্রিয়া কলাপের মধ্যে দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দেশগুলি সামরিক শক্তি ও জঙ্গী মনোভাবের পরিবর্তে সহনশীলতা, পারস্পরিক বুঝাপড়া ও আলাপ আলোচনার উপরই জোর দেয়। সামরিক শক্তি ও ক্ষমতার (Power) উপর জোর না দিয়ে আলাপ আলোচনা ও পারস্পরিক আদান প্রদানের (Communication) উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গড়ে

তোলা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।[2] অনেকে মনে করেন যে ভবিষ্যৎ কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির আদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের ভিতর না গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি নিজেদের ভিতর মত বিনিময় করে সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে তবেই মানবজাতির মঙ্গল। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনা করতে কতখানি সাফল্য লাভ করবে তা এখন বলা যায় না। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতায় দুর্বল বলেই তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতির পরিবর্তে আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার রাজনীতির পথ গ্রহণ করেছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রচলিত বল প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করে চলেছে।

জোটনিরপেক্ষ নীতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলশ্রুতি হলেও ঠাণ্ডা লড়াই মোটামুটি ভাবে শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বরাজনীতিতে এই আন্দোলনের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় নি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে এই নীতি এখনও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এই নীতি ছাড়া এই সব দেশগুলির পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথেও জোটনিরপেক্ষতা বিশেষ ভাবে যুক্ত।

এই সম্বন্ধে J. W. Burton তাঁর *Internationat Relations* বইতে লিখেছেন: "Non-alignment is a specific feature of the current world system to which the communications, rather than the power model, is suited."

BIBLIOGRAPHY

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

Angell, Norman, The Great Illusion. New York : Putnam, 1933.

Barker, Ernest. National Character and the Factors of its Formation. London : Methuen, 1927.

Bernard, L. L., War and its Causes. New York : Holt, 1946.

Brierly. J. L., The Law of Nations, 4th ed. Oxford Clarendon, 1949.

—The Covenant and the Charter. New York : Macmillan, 1947.

Calvocoressi, Peter, World Politics Since 1945. London : Longmans, 1968.

Cantril, Hadley, ed., Tensions that Cause Wars, Urbana : University of Illinois Press, 1950.

Carr, E. H., Nationalism and After. New York : Macmillan 1945.

—International Relations Between the two World Wars, 1919-1939. London : Macmillan, 1948.

—Propaganda in international Politics, New York : Farrar and Rinehart, 1939.

—The Twenty Years' Crisis, 1919-1939 : An Introduction to the Study of International Relations. London : Macmillan, 1946.

Cheever, D. S., and H. F. Haviland, Organizing for Peace. London : Stevens and Sons, 1957.

Clark Glover, The Balance Sheets of Imperialism. New York : Columbia University Press 1936.

Dyke, V. V. International Politics. New York : Appleton-Century Crofts, 1957.

Eagleton, Clyde, Analysis of the Problem of War. New York : Ronald, 1937.

Earle, E. M, ed., Nationalism and Internationalism. New York : Columbia University Press, 1950.

Fifield. R. H. and G. E. Pearcy, Geopolitics in Principle and Practice. Boston : Ginn, 1944.

Friedmann, Wolfgang, An Introduction to World Politics. London : Macmillan, 1952.

Fuller, J. F. C. Armaments and History. New York : Scribner, 1945.

Gathorne-Hardy, G. M., A Short History of International Affairs, 1920-1939. London : Oxford University Press, 1950.

Gooch, G. P., Nationalism. New York : Harcourt, Brace and Howe. 1920.

Goodrich, L. M. and E. J. Hambro, Charter of the United Nations; Commentary and Documents. Boston : World Peace Foundation, 1949.

Gulick, E. V., The Balance of Power. Philadelphia : The Pacific Research Bureau, 1943.

Hankey, Lord Maurice, Diplomacy by Conference. New York : Putnam, 1946.

Hartmann, F. H., ed., Basic Documents on International Relations. New York : McGraw-Hill, 1951.

—Readings in International Relations. New York : McGraw Hill 1952.

Hill, Norman, ed., International Relations: Documents and Readings. New York: Oxford University Press, 1950.

—Contemporary World Politics, New York: Harper, 1954.

Hobson, J. A., Imperialism, A Study. New York: Macmillan, 1948.

Holcombe, A. N., Human Rights in the Modern World. New York: New York University Press, 1948.

Hudson, M. O., The Permanent Court of International Justice 1920-1942. New York: Macmillan, 1943.

Jessup, P. C., A Modern Law of Nations: An Introduction. New York: Macmillan, 1948.

Kelsen, Hans, Law of the United Nations. New York: Praeger, 1950.

Kirk, Grayson, The Study of International Relations in American Colleges and Universities. New York: Council on Foreign Relations, 1947.

Kohn, Hans, Idea of Nationalism. New York: Macmillan 1945.

Leonard, L. L., International Organization: The Security System of the United Nations. New York: McGraw Hill, 1951.

Mangone, G. J., The Idea and Practice of World Government. New York: Columbia University Press, 1951.

—A Short History of International Organization. New York: McGraw-Hill, 1954.

Martin, A., Collective Security: A Progress Report. Paris: UNESCO, 1952.

Masters, Dexter, and Katherine Way, eds., One World Or None. New york : Whittlesey, 1946.

Moon, P. T., Imperialism and World Politics. New York : Macmillan, 1926.

Morgan, L. P., The Problems of Disarmament. New York : Commission to Study the Organization of Peace, 1947.

Morgenthau, H. J., Politics Among Nations, Calcutta : Scientific Book Agency 1969.

—In Defence of the National Interest, New York : Alfred A, Knopf, Inc. 1951

Mowat, R. B., A History of European Diplomacy 1914-1925. Calcutta : The World Press, 1961.

Nicolson, H. G., Diplomacy, 2nd ed., New York : Oxford University Press, 1950.

Ogburn, W. F., ed., Technology and International Relations. Chicago : University of Chicago Press, 1948.

Oppenheim, L., International Law, H. Lauterpacht. ed., vol. I and vol. II. London : Longmans, Green, 1948.

Padelford, N. J., ed., Current Readings in International Relations. Cambridge. Addison-Wesley, 1948.

Padelford and Lincoln., International Politics. New York : Macmillan, 1957.

Palmer, N. D. and H. C. Perkins, International Relations : The World Community in Transition. Boston : Houghton Mifflin, 1953.

Rappard, W. E., The Quest for Peace. Cambridge : Harvard University Press, 1940.

Russell Bertran Power : A New Analysis. New York : Norton, 1938.

Schleicher, C. P., Introduction to International Relations. New York : Prentice-Hall, 1955.

Schuman, F. L., International Politics: the Western State System in Mid Century. New York : McGraw-Hill 1953.

Schwarzenberger, George, Power Politics: A Study of International Society, 2nd rev., ed. New York : Praeger, 1951.

Sharp, W.R. and Grayson Kirk, Contemporary International Politics. New York : Farrar and Rinehart, 1944.

Shotwell, J. T., The Origins of the International Labour Organization. New York : Columbia University Press, 1934.

Sprout, H. N., and M. T. Sprout, eds., Foundations of National Power. New York : Van Nostrand, 1951.

Spykman, N. J., America's Strategy in World Politics. New York : Harcourt, Brace, 1942.

Toynbee, A. I, War and Civilization. New York : Oxford University Press, 1950.

Winslow, E. M., The Pattern of Imperialism : A Study in the Theories of Power. New York: Columbia University Press, 1948.

Wright, Quincy, A Study of War, 2 vols., Chicago: University of Chicago Press, 1942.

—The Study of International Relations. New York : Appleton Century Crofts, 1955.

Zimmern, Alfred., The League of Nations and the Rule of Law. London : Mac Millan, 1936.

পরিভাষা

প্রচলিত ইংরাজী শব্দের	বাংলা প্রতিশব্দ।
Diplomacy :	কূটনীতি
Balance of Power :	শক্তিসাম্য
Balance to Terror :	ত্রাসের সাম্য
Political warfare :	বৈরীমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা
Propaganda :	প্রচার কার্য
Collective Security :	সমষ্টিগত নিরাপত্তা
National Power :	জাতীয় শক্তি
Disarmament :	নিরস্ত্রীকরণ
Pacific Settlement of International Disputes :	শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ দূরীকরণ
Good offices and Mediation :	বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা
Enquiry and Conciliation :	অনুসন্ধান ও আপোষ প্রচেষ্টা
Arbitration :	সালিশী
League of Nations :	জাতিসংঘ
United Nations :	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
General Assembly, Assembly :	সাধারণ সভা
Security Council :	নিরাপত্তা পরিষদ
Economic and Social Council :	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
Trusteeship Council :	অছি পরিষদ
Permanent Court of International Justice :	স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়
International Court of Justice :	আন্তর্জাতিক বিচারালয়
Secretary General :	মহাসচিব
Secretariat :	দপ্তর